কিশোর গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

কিশোর ভারতী

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৬০

ছেপেছেন :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ, মনমোহন বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রকাশ করেছেন :
লেখক
কিশোর ভারতী
৯, ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান :
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

সূচী

বই পড়া মানসিক বিলাস। মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য এটা একান্ত প্রয়োজন। ছোটদের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশী প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমানে কাগজের দাম ও ছাপানোর খরচ যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কম দামে ছোটদের বই প্রকাশ করা আর সম্ভব নয়। অথচ পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধির জন্য ছোটদের এই সুকুমার বৃত্তিটা আজ এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। গ্রন্থাবলী সিরিজ এই অভাব কিছুটা পূরণ করতে পারে। বড়দের জন্য অনেক গ্রন্থাবলী আছে কিন্তু ছোটদের জন্য আজ অবধি গ্রন্থাবলী প্রকাশের কোন চেষ্টা হয়নি। আমরা এই অভাব পূরণের আশাতেই এই গ্রন্থাবলী সিরিজ প্রকাশে ব্রতী হলাম। ছোটদের যদি মনোরঞ্জন করতে পারি, তবেই আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে করবো। ইতি—

প্রকাশক



(বাংলার ভুলে-যাওয়া যুগের এক বিপ্লব-কাহিনী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

"একটা বেড়াল পাতের কাছে বসে খেলে কোনো দোষ হয় না অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায়, সেটাকে অধর্ম না বলে কি বলব ? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনই পৃথিবীতে বড়ো হতে পারে না। অন্যের অবজ্ঞা তাদের সইতেই হবে—"

— **রবীন্দ্রনাথ**

বঙ্কিমবাবু বলেছেন 'উপন্যাস ইতিহাস নয়'। আমার গল্পটিকে নিছক ইতিহাস বলে ধরলে ভুল হবে। বাংলার কৈবর্ত-বিদ্রোহের শেষাংশটুকু এই কাহিনীর পশ্চাদ্‌পট, কিন্তু সে সম্পর্কে বিশদ ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না। সেদিনের কথা কিছু বলতে হলে কল্পনাকে প্রাধান্য না দিয়ে উপায় নেই। তবে ইতিহাসের মর্যাদা আমি কোথাও ক্ষুণ্ণ করিনি।

তিনজন ঐতিহাসিকের লেখা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছি: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীনেশচন্দ্র সেন।

বইখানি লেখার কাল ১৯৪১ সাল, ওই বছরেই—বাংলার ১৩৪৮ সালে—বইখানি ধারাবাহিক ভাবে ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'মাসপয়লায়' প্রকাশিত হয়েছিল।

—**লেখক**

উৎসর্গ ঃ

বাংলার হরিজন ছেলেমেয়েদের হাতে—

শব্দার্থ ঃ

মহাকুমার—রাজপুত্র

মহাবলাধ্যক্ষ—প্রধান সেনাপতি

মহামাতা—প্রধান মন্ত্রী

মহাদণ্ডনায়ক—চীফ ম্যাজিষ্ট্রেট

নৌবলাধ্যক্ষ—জল-সেনার সেনাপতি

নৌগোল্মিক—জল-পুলিশের দল

মহাধর্মাধ্যক্ষ—প্রধান বিচারক, চীফ্ জাষ্টিস্

নৌ-বাট—নৌ-সেনাদল

ধর্মচক্র—হিন্দুযুগে উত্তর ভারতের সকল বৌদ্ধ বিহার ও বিদ্যালয় একটি কেন্দ্রীয় পরিচালক সঙ্ঘ কর্তৃক চালিত হোত, সেই সঙ্ঘকে বলতো ধর্মচক্র। এঁরা অনেক সময় বৌদ্ধ প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতেন। এইজন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বহুবার বহু বিরোধ হয়।

সঙ্ঘারাম—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রম।

মহাস্থবির—বৌদ্ধ বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ।

সিদ্ধাচার্য—যে সব বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তন্ত্র-বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করে অসাধ্য সাধন করতে পারতেন তাঁদেরকেই সিদ্ধাচার্য বলা হোত।

রাজষষ্ঠ—তখনকার দিনে উৎপন্ন ফসলের ছয়ভাগের একভাগ রাজা রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করতেন।

সমুদ্রবংশ—প্রবাদ আছে যে পাল রাজাদের পূর্বপুরুষ সমুদ্রপথে বাংলা দেশে আসেন, সেইজন্য পালবংশ সমুদ্র-বংশ বলে প্রসিদ্ধ।

রমাবতী—পালবংশের রামপালদেবের রাজধানী, গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে অবস্থিত। এই নগরেই রামপাল 'জগদ্দল মহাবিহারের' প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠান—প্রয়াগের প্রাচীন নাম।

চলনবিল—উত্তর বঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ বিল।

নীল না'য়ের মাঝি

—কে যায় ?

রাত্রির অন্ধকার চমকে উঠলো।

অমাবস্যার রাত। ভাদ্র মাসের ভরা নদী। কোথাও এতটুকু আলোর পরশ নেই। আশেপাশে নজর চলে না।

তথাপি মাঝিদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেল না।

নদীর মুখে খানক'য় রণতরী অপেক্ষা করছিল। একখানি দশী ছিপ তাদের পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অমন অন্ধকারেও সে গা-ঢাকা দিতে পারলো না। একজন মাঝি দেখতে পেয়েই সাড়া তুললো—কে যায় ?

ছিপখানি সে-কথা শুনেও শুনলো না, যেমন যাচ্ছিল তেমনি চললো।

সামনের কোষা থেকে মাঝি আবার হাঁকলো—কে যায় ? কার ছিপ ?

তথাপি সাড়া নেই।

কোষার মাঝি হাঁকলো—সামালো!

দু'খানি ছিপ দু'পাশ থেকে এগিয়ে এসে রুখে দাঁড়ালো, জিজ্ঞাসা করলো—কে যায় ?

—চলনবিলের বিজয়হরি—দশী ছিপ থেকে এবার জবাব হোল।

—কে ? কে ?

—চলনবিলের হরি সর্দার।

এবার সবাই চমকে উঠলো। চারি পাশের ছিপ কোষা পালোয়ারে যে যেখানে ছিল, সবার চোখ এসে পড়লো এই দশী ছিপখানির উপর।

কোষা থেকে আদেশ হোল—রাখো! না'ও থামাও!

বিজয়হরি বললো—চালাও—!

—রাখ্‌খো বলছি!

—সাহস থাকে তো রোখো—

—খবরদার!

—সামালো!

ছিপ দু'খানি একেবারে সামনে এসে পড়লো। আরেকটু হলেই ধাক্কা লাগে।

এই মুহূর্তটির জন্যই বিজয়হরি অপেক্ষা করছিল, চাপা গলায় হাঁকলো—দয়াল! মোথ্‌রো!

দয়াল ও মথুরা ইঙ্গিতে বুঝলো, দু'পাশ থেকে দুই দাঁড়ের আঘাতে সামনের ছিপ দু'খানি চকিতে উল্টে দিলে। পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। তরতর করে ছিপখানি এগিয়ে চললো একখানি পালোয়ারকে পাশ কাটিয়ে।

পালোয়ারের মাঝি হাঁক দিল—হুঁসিয়ার!

বিজয়হরি হা হা করে হেসে উঠলো। অট্টহাসি না হলেও সে হাসির উল্লাস প্রতিধ্বনি তুললো নদীর আকাশে। তার ঢেউ হারিয়ে গেল স্তিমিত দুই তটে।

শট্‌শট্‌ করে কয়েকটি বল্লম এবার ছুটে এল পালোয়ারখানি থেকে, বিজয়-হরি চাপা গলায় বলে উঠলো—হুঁসিয়ার!

দশী ছিপের দশজন দাঁড়ি এক এক হাতে মাথার উপর এক একখানি লোহার ঢাল তুলে ধরলো, আরেক হাতে দাঁড় বেয়ে চললো সমভাবে।

ততক্ষণে চারিপাশের নৌকাগুলিতে সাড়া পড়ে গেছে। ওদিককার একখানি কোষার কিনারায় ক'জন তীরন্দাজ সোজা হ'য়ে উঠলো। ধনুকে তীর জুড়লো। একজন একটি মশাল দিয়ে তীরের মুখে মুখে আগুন জ্বালিয়ে দিলে। পরক্ষণে এক ঝাঁক অগ্নিমুখী বাণ উল্কার মত ছুটে গেল ছিপখানির দিকে।

বিজয়হরি ডাকলো—রঘুয়া!

—ঠিক আছি সর্দার।

রঘুয়া বসেছিল হালে। সহসা সে না'ওখানি এমনভাবে ঘুরিয়ে দিলে যে উল্কাপিণ্ডগুলি পাশ দিয়ে চলে গেল, ছিপখানিকে স্পর্শ করতেও পারলো না। বিজয়হরি ব'লে উঠলো—সাবাস!

আরো দু'খানি কোষা ছুটে এল।

এসে পড়লো আরেক ঝাঁক জলন্ত তীর।

কয়েকটি তীর এসে পড়লো ছিপের মধ্যে, দু'একজনের গায়ে এক-আধটুকু যে ছেঁকা লাগলো না, তা নয়। তবে বিশেষ কোন ক্ষতি করার আগেই যাদের পাশে পড়েছিল তারা সেগুলিকে তুলে জলে ফেলে দিলে।

দেখতে দেখতে অনেকগুলি ছিপ এবার তাদের ঘিরে ধরলো। রঘুয়া

নানান্ কৌশলে একটির পর একটি ছিপকে পাশ কাটাচ্ছিল, কিন্তু সবগুলিকে পাশ কাটাতে পারলো না। তিন-চারখানি ছিপ তাদের দশ-পনেরো হাতের মধ্যে এসে পড়লো। তাদের বল্লমের আঘাত এদের ঢালের উপর ঠুনঠান্ শব্দ তুললো জল-তরঙ্গের মত।

এবার এড়িয়ে যাওয়া সত্যিই কঠিন।

রঘুয়া একটু বিপন্ন বোধ করলো, ডাকলো—সর্দার!

ঢালের আড়াল থেকে বিজয়হরি সামনের অবস্থাটা একবার ভালো করে দেখে নিলে : ছিপগুলোকে যদি বা পাশ কাটান যায়, তারপরেই দু'খানি কোসা, তার পিছনে আবার প্রকাণ্ড এক পালোয়ার। এবার সত্যিই পথ নেই। বললো--ডুবিয়ে দাও--!

—ডুবিয়ে দোব?

ঠন্ ঠন্ করে ঝাঁকে ঝাঁকে বল্লম পড়তে লাগলো তাদের মাথার উপর, অগ্নিমুখী তীরও ছিল তার মধ্যে।

—ডুবিয়ে না দিতে পার উল্টে দাও—!

ঠন্ ঠন্ ঠন্!

—আর দেরী করো না রঘুয়া, উল্টে দাও.. দয়াল, মোথ্রো, সামনের পয়লা ছিপ···

মুহূর্তে ছিপখানি কাৎ হয়ে পড়লো। তারপরেই একপাক ঘুরে উল্টে গেল একেবারে। বিজয়হরি ও তার দশজন সঙ্গী তলিয়ে গেল নদীর জলে।

আক্রমণকারীরা যখন ছিপখানিকে সোজা করলো তখন সেখানে মানুষের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু দাঁড়গুলি আর অসংখ্য বল্লম এদিক ওদিকে ভাসছে।

শত্রুকে পর্যুদস্ত করেছে ভেবে তারা খুসিই হোল।

বিজয়হরির দল জলের মধ্যে দ্রুত ডুব-সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল। এখনকার মত আমেরিকান্ টার্জেন-ক্রল্ তখন বাংলার নদী ও পুষ্করিণীতে প্রসিদ্ধিলাভ করেনি; কিন্তু সেই রাতে বিজয়হরির সঙ্গীরা যে টান টানছিল তা টার্জেন-ক্রলের চেয়ে দ্রুত ও ক্ষিপ্র। এখনকার পাশ্চাত্যমুখী প্রাণহীন বাঙালী সাঁতারের সেই কৌশল ভুলে গেছে।

একখানি নৌকা দল ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তারই পাশে বিজয়হরির দলের একজনের মাথা ভেসে উঠলো।

নৌকার উপর তখন কথা হচ্ছে :

—ওদিকে কিসের যেন একটা হৈচৈ শোনা গেল, না মাঝি ?

—হৈচৈ হোল আর তোর কানে এসেই লাগ্‌লো, আমি শুনতে পেলাম না ?

—তুই যে তখন ঝিমুচ্ছিলি !

—আমি ঝিমুচ্ছি আর তুই জেগে স্বপন দেখছিস। নে নে আর বকিস্ নে, তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি ঘুলিয়ে গেছে। এক ছিলিম তামুক খা, খেলেই তোর মাথা সাফ্ হয়ে যাবে। নে, সাজ এক কল্কে—

ঠিক সেই সময় বিজয়হরির ইঙ্গিতে তার সঙ্গীরা না'ওখানিকে আক্রমণ করলো। দু'দিক থেকে কিনারা ধরে তিন-চারজন উঠে পড়লো নৌকাখানির উপর। মাঝিরা চম্‌কে উঠলো, বললো—কে ? কে ?

—ভূত !

—ভূত ! অাঁ—?

—হ্যাঁ ভূত। আজ রাতে তোদের ভূতে ধরেছে—

আর কথা বলার অবসর না দিয়ে দাঁড়ি-মাঝি যে-ক'জন নৌকায় ছিল, রঘুয়ারা তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিলে জলে।

ঝিমুতে ঝিমুতে আক্রান্ত হয়ে সহসা জলে পড়ে অবস্থাটা বুঝে নিতে তাদের খানিক সময় লাগলো। এদিকে বিজয়হরি হাঁকলো—সবাই উঠেছে ?

—হ্যাঁ।

—চালাও—

বিজয় এবার নিজেই হালে বসলো।

রঘুয়া বললো—তুই কেন সর্দার, আমায় দে।

—তুই একটু জিরিয়ে নে রঘুয়া, বুড়ো হয়েছিস্ !

—মাথার চুল পাকলে কি হবে সর্দার, এখনও এ-দেহে যে শক্তি আছে, হুঁ !

গর্বিতভাবে রঘুয়া বুকে একবার হাত বুলালো, তারপর মাথা-মুখের জল ঝাড়তে ঝাড়তে সর্দারের পাশে বসে পড়লো।

পিছনে তখন আর বিজয়হরিকে ঠেকায় কে। অন্ধকার দিগ্বলয়ের বুকে দেখতে দেখতে নৌকাখানি হারিয়ে গেল।

তীব্রস্রোত ব্রহ্মপুত্র পাহাড়ের গায় ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে বহে যাচ্ছে। পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢেউ উঠে গেছে দু'পাশের তটে। পাথরের পাষাণতা ভেদ করে উঠেছে ছোট বড় নানান গাছ। সূর্যের আলো এসে পৌঁছায় না, এমনই ঘন হ'য়ে উঠেছে নিবিড় বন। দু-একটা ঝরণা পাহাড়ের গায় ছল্ ছল্ করে হাসির লহর তুলে খুসিতে আছড়ে পড়ছে নদের বুকে। দু-একটা অজানা পাখীর শিষ দেবার শব্দও আকাশে ঢেউ তোলে অনেক দূর পর্যন্ত।

শ্যামলিমার এই কবিতা এক স্থানে সহসা ছন্দ কেটেছে। সবুজ গাছ-পালাকে সরিয়ে মানুষ গড়ে তুলেছে এক সহর। পাখীর গান আর ফুলের সুবাস প্রতিহত হয়েছে ইট-কাঠের পাঁচিলে, ঝরণার লীলা ছাপিয়ে উঠেছে জনতার কলরব।

সহরের নীচে বাঁধানো ঘাট। ঘাটে নৌকা গিস্‌গিস্ করছে। ছিপ, কোষা, ভড়, ঢুঢা, ভেদী, ঘাসী, জঙ্গ, ডিঙ্গী, কোন্দা, পালেন, পানসি, বজরা, জলবা, বালাম, ভাউলে, সলব, পাতেলা, পারেন্দা, পালোয়ার, খাটকুড়ি—প্রভৃতি নানারকমের নানান নৌকা। তারই ফাঁকে ফাঁকে একখানি বিশদাঁড়ি কোতোয়ালী ছিপ ঘুরে বেড়াচ্ছে, নতুন নৌকা চোখে পড়লেই জিজ্ঞাসা করছে—কার নাও? কে যায়? কোত্থেকে আসছে?

একখানি নীল রঙের দশী ছিপ এসে ঘাটে ভিড়লো।

—কোথাকার নাও?—কোতোয়ালী ছিপ থেকে প্রশ্ন উঠলো।

—ডম্বরু নগর।

—উপপুর?

—হ্যাঁ।

—সেখানে না লড়াই চলছে?

—লড়াই শেষ হয়ে গেছে, এখন চলছে লুট। মহারাজ রামপালের সৈন্যেরা বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কত নিরীহ লোক যে খুন হোল…

—মহারাজ রামপালদেবের গৌড়ীয় সেনারা শেষে এমন কাজ করছে?

—তাদের দোষ কি ভাই ? তারা আদেশ পেয়েছে নীচ কৈবর্ত রাজার রাজধানী মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্য…

—তা তুমি ?

—একজন জহুরী।

—পালিয়ে এসেছ ?

—হ্যাঁ ?

—একা ?

—হ্যাঁ। বাবা-মা খুন হয়েছেন লুণ্ঠনকারীদের হাতে। সর্বস্ব খুইয়ে আমি কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

কোতোয়ালী ছিপ এবার উপপুরের নৌকার পাশে এসে ভিড়লো। প্রশ্নকর্তা উপপুরের ছিপখানির প্রত্যেক দাঁড়ি-মাঝির মুখের উপর দিয়ে বারেক তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে তারপর জিজ্ঞাসা করলো—এখানে জানাশুনা কেউ আছে ?

—আছে, নৌবাট-নায়ক গোবর্ধন সর্দার।

—ওঃ বেশ !

কোতোয়ালী না'ও সরে গেল।

বিজয়হরি সঙ্গীদের দু-একটি কথা বলে ছিপ থেকে নেমে পড়লো।

এক হাতে ছোট একটি পুঁটলি, আরেক হাতে কাঁধ পর্যন্ত একগাছি পাকা লাঠি সম্বল করে পথের ভীড়ে বিজয় মিশিয়ে গেল।

সূর্য একটু আগে অস্ত গেছে। তখনও লাল আলোর ঢেউ ঝলমল্ করছে আকাশের শেষ প্রান্তে। দূরের পাহাড়ের আড়াল থেকে এগিয়ে আসছে অস্পষ্ট অন্ধকার। মৃত্যুর স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ছে। একটু আগে পাখীগুলো গাছের উপর নিজেদের মনোমত আশ্রয় পাবার জন্য কলরব করছিল, এখন তা'ও থেমে গেছে। কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া নেই। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি ঝির ঝির করে উঠছে, কখন-বা দূর থেকে ভেসে আসছে দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শব্দ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠছে রাত্রির অন্ধকারে।

নগরীর এক প্রান্তে জনবিরল তটে একখানি বড় পাথরের উপর বসেছিল দুটি লোক। বিজয়হরি আর গোবর্ধন সর্দার। দু'জনে কথা হচ্ছিল।

গোবর্ধন জিজ্ঞাসা করলো—তারপর ?

বিজয়হরি বলতে লাগলো—পঞ্চগৌড়ের চৌদ্দজন সামন্তরাজা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। যারা এতদিন পরম ভট্টারক মহারাজ ভীমদেবের চরণে মাথা নুইয়ে নিজেদের কৃতার্থ মনে করতো, আজ তারাই সুবিধা পেয়ে ষড়যন্ত্র করলো। মহারাজ মহীপালের দুর্নীতি ও দুঃশাসন, অন্যায় ও অত্যাচারের কথা তারা ভুলে গেল, রামপালের পতাকাতলে তারা সমবেত হোল। ভীমদেব তাদের কত উপকার করেছেন, কত ছোটখাটো যুদ্ধে তাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করেছেন, সেই উপকারীর বিরুদ্ধেই তারা অস্ত্রধারণ করলো। প্রথমে আমাদের আক্রমণ করলো রাষ্ট্রকূটের শিবরাজদেব। পরাজয়ের ভাণ করে তাকে আমরা দেশের মধ্যে এগিয়ে আসার সুযোগ দিলাম। অনভিজ্ঞ শিবরাজ ভাবলো সমগ্র বরেন্দ্র-ভূমি সে অধিকার করে ফেলেছে। তারপর দেশের ভেতর পেয়ে চারিপাশ থেকে তাকে আমরা ঘিরে ফেললাম। বেচারার জয়ের আনন্দ লুপ্ত হয়ে গেল। তার ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে আমরা গঙ্গা পার করে দিলাম। তারপর চোদ্দজন সামন্তরাজের সৈন্যরা এসে ছাউনি ফেললে ভাগীরথীর তীরে। আমরা এপারে প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের নৌবাট তাদের গতিরোধ করলো। রাত্রির অন্ধকারে ভাগীরথীর বুকে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হোল। বিত্তপালের নৌবাহিনীকে আমরা হাটিয়ে দিলাম। একবার দু'বার নয়, পরপর তিনবার। শেষে ঠিক করলাম ওদের সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে সমতট পার করে দিয়ে আসবো। ইতিমধ্যে আমরা খবর পেলাম এক বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ টাকার লোভে কৌশলে ওদের নদী পার করে দিয়েছে। মহারাজ নিজে তাদের গতিরোধ করলেন। একাদিক্রমে দিনের পর দিন ধরে লড়াই চললো। কিন্তু বিধাতা ছিলেন বিরূপ। রাত্রির অন্ধকারে কোথা থেকে একটি বল্লম এসে মহারাজকে আঘাত করলো। হাতীর পিঠ থেকে তিনি পড়ে গেলেন। তারপর আর যুদ্ধ পরিচালনা করার সুবিধা হলো না। নৌযুদ্ধ শেষ করে আমরা যখন ফিরলাম তখন তিনি বন্দী হয়েছেন। আমরা বার বার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না—পরম ভট্টারক মহারাজ ভীমকে আমরা শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারলাম না। শেষ

পর্যন্ত আমাকে পালিয়ে আসতে হোল। দুদি'নে মহারাজের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে পারলাম না, তাঁর পরম বিশ্বাসভাজন হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করলাম।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিজয় চুপ করলো।

গোবর্ধন বললো—আচ্ছা, রামপাল তো পিতৃরাজ্য হারিয়ে এতকাল ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সহসা এতো সৈন্যসামন্তের মাইনে, এতো অস্ত্রশস্ত্র কেনার টাকা সে কোথায় পেল জান?

—কেন, উত্তরাপথের মহাস্থবির দিয়েছেন। রামপাল বৌদ্ধ, তার উপর তিনি ধর্মচক্রের শরণাপন্ন হয়েছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য জগদ্দলে এক মহাবিহার তৈরী করিয়ে দেবেন। গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধ প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্যই উত্তরাপথের ধর্মচক্র রামপালের এখন যতটাকা প্রয়োজন সব দিচ্ছে।

গোবর্ধন চিন্তিতভাবে বললো - এ ছাড়া তোমাদের ঘরেই শত্রু রয়েছে, বামুন-কায়েতেরা ছোটজাতের শাসন মানতে চায় না।

বিজয় বললো—তা জানি। আর এ'ও জানি যে, শত শত বছর ধরে এই কৈবর্তরা যখন প্রাণ দিয়েও শক আর হুনদের সঙ্গে লড়েছিল তখন ছোটজাতের কথা ওঠেনি। কিন্তু যখন নিজের যোগ্যতার পুরস্কার হিসাবে রাজসিংহাসন দখল করে বসলো তখনই হোল ছোটলোক। আর এই পাল রাজারাই বা কি উঁচু কুল শুনি? ওরা তো এসেছে সমুদ্রের ওপার থেকে। জাত-কুল বলে কিছু নেই, নিজেদের সমুদ্র-বংশ বলে পরিচয় দেয়। তারাই হোল উঁচু, আর আমরা বাহুবলে বাংলার মান-মর্যাদা রক্ষা করলাম, আমরা হলাম নিচু।

—ওসব পুরাণো কথা বলে তো কোন লাভ নেই, এখন তুমি কি করতে চাও তাই বল?

—আর একবার আমি শক্তির পরীক্ষা করতে চাই।

—কিন্তু ন'লাখ সৈন্য দিয়ে তোমরা যা পারনি, আজ দু'চারজন লোক নিয়ে তুমি একা তার কতটুকু পারবে?

—ন'লক্ষ নিয়ে যা সম্ভব হয়নি, দু'চারজনকে দিয়ে তাই সহজ হবে। রাত্রির অন্ধকারে আমি রামপালের রাজধানী 'রমাবতী' আক্রমণ করবো —ভীমদেবকে কারাগার থেকে মুক্ত করবো; তারপর বাংলার বিশলাখ কৈবর্তকে সঙ্ঘবদ্ধ করে দেখবো উঁচুজাতের এই অভিমান ভাঙতে পারি কি না।

গোবর্ধন সর্দারের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, বললো—পারলে ভালই।

তবে কা'কে দিয়ে তুমি কাদের জব্দ করবে? তারা তো আর লড়বে না, তোমার বিরুদ্ধে আসবে তোমাদেরই জাত-ভাই। এই যে সামন্তচক্রের সঙ্গে তোমাদের লড়াই হোল, এরা কারা?—বেশীর ভাগই কি কৈবর্ত আর নমঃশূদ্র নয়?

বিজয় বললো—সেই জন্যই আমি আরেকবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবো। যদি জিতি—যদি মহারাজ ভীমকে আবার সিংহাসনে বসাতে পারি, তাহলে ব্রাহ্মণ্যবাদ চিরদিনের মত গৌড়বঙ্গভূমি থেকে মুছে দোব। সামান্য একটা উপবীতের অভিমানে গুণী ও যোগ্য লোককে পদানত করে রাখার যে স্পর্ধা তা চূর্ণ করে দোব।

বাঁ হাতের তালুর উপর বিজয় সশব্দে ডান হাতের এক ঘুসী বসিয়ে দিলে। সে তখন উত্তেজিত হ'লে উঠেছে।

গোবর্ধন চুপ করে তাকিয়ে রইলো নদীর জলের পানে। সন্ধ্যার অন্ধকার ছাপিয়ে ওদিকে পাহাড়ের আড়াল থেকে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে নদীর বুকে। একটি চাঁদ হাজার টুকরো হয়ে ঢেউয়ের মাথায় নাচছে। নদীর প্রবাহকে আর ঠাহর করা যায় না, মনে হয় অভ্রের টুকরো ছড়ানো প্রশস্ত রাজপথ বরাবর চলে গেছে দিগ্বলয়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত।

বিজয় বললো—কি সর্দার, কথা বলছেন না যে?

—কি বলবো?

—আপনি তাহলে আমাকে সাহায্য করবেন না?

—করবো না তো বলিনি, যতটা সম্ভব আমার স্বজাতির জন্য তা আমি করবই।...একী, তোমার হাতের জামাটা যে লাল হ'য়ে গেছে, ওখানে.........

বিজয়ের জামার হাতার উপর নজর পড়তেই গোবর্ধন চমকে উঠলো।

—ও এমন কিছু নয়—বিজয় হেসে বললো—বল্লমের সামান্য একটু খোঁচা লেগেছিল মাত্র।

—বেঁধে রাখনি?

—বেঁধেই রেখেছি। কিন্তু ওষুধ কিছু দেওয়া হয় নি বলে এখনও সামান্য সামান্য রক্ত পড়ে।

—তিন দিন ধরে রক্ত বন্ধ হয় নি, আর বলছ 'সামান্য খোঁচা লেগেছিল মাত্র'। তা সকালে আমাকে তো কিছু বলও-নি। এখন উঠে পড়; চলো, এখনই একবার বদ্যিকে দেখিয়ে আসি—

বিজয় আর 'না' বললো না। বিজয়ের হাত ধরে গোবর্ধন অগ্রসর হোল।

রাত তখন বেশী হয়নি।

নদীর বুকে চাঁদের রেখা মুছে গেল, তারা-ছড়ানো আকাশ ঢাকা পড়ে গেল মেঘের আস্তরণে। মেঘালি বাতাসের এক একটি ঝাপ্‌টা গাছের পাতায় পাতায় ঝির ঝির শব্দ তুলে চারিপাশ স্নিগ্ধ করে তুলছিল। নদীর এপার ওপার এখন আর দৃষ্টি চলে না। কালিন্দী ব্রহ্মপুত্রের কালো ঢেউ নৌকাগুলির গায়ে ঠেলা দিয়ে ছল্ ছল্ করে হেসে উঠছিল। সারি সারি চঞ্চল নৌকার দোদুল আলোর পানে চোখ পড়লে মনে হয় দীপালির রাতে নদীতট আলোকমালায় সাজানো হয়েছে বুঝি! মাঝে মাঝে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে।

ঢং ঢং করে নগর কোতোয়ালীতে রাত প্রথম প্রহর শেষ হবার ঘণ্টা পড়লো। মাথা-ন্যাড়া গেরুয়া-পরা এক সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালো নদীর কিনারে প্রকাণ্ড এক বট গাছের নীচে। উৎসুক চোখে ঘাটের সিঁড়ির পানে তাকিয়ে রইল, মনে হোল সে যেন কার প্রতীক্ষা করছে।

এক এক করে কয়েকটি অনুপল কেটে গেল। সন্ন্যাসী চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ির উপর একটি দীর্ঘ ছায়া দেখা গেল। ছায়াটি এগিয়ে আসতে লাগলো সেই গাছটির দিকে। সন্ন্যাসী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো। কোমরে হাত দিয়ে কি-যেন ঠিক আছে কি না দেখে নিলে। ছায়াটি সন্দিগ্ধপদে বটগাছের নীচে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো।

সন্ন্যাসী কোমল কণ্ঠে বললো—কে, আনন্দ?

আনন্দ এবার নিঃশঙ্কচিত্তে এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলো।

—কি খবর?

—আজ সকালে ছিপ ঘাটে এসে লেগেছে। কোতোয়ালী ছিপ জিজ্ঞাসা করলে, ছোকরা বললো—'আমি ডম্বরু নগরের এক জহুরী।'

—তারপর?

সকালে ঘাটে কোতোয়ালী ছিপের সঙ্গে বিজয়ের যা কথাবার্তা হয়েছিল আনন্দ সব বলে গেল।

সব শুনে প্রশ্নকর্তা বললো—তারপর ? তুমি তার পিছু নিয়ে ছিলে ?

—আজ্ঞে হঁ্যা। আপনার কথামত আমি তার অনুসরণ করি। ছোকরা গোবর্ধন সর্দারের ওখানে গিয়ে উঠেছে।

—ছিপে ক'জন ছিল ?

—ওই ছোকরা ছাড়া আরো দশজন।

—এখনও কি ওই দশজনই আছে ?

—খুব সম্ভব।

—তোমার ডিঙ্গিতে কে আছে ?

—এখন আমি একা !

—বেশ। আমায় একবার নিয়ে চল দিকি—

—চলুন—

ঘাটের পাশেই ডিঙ্গি বাঁধা ছিল। সন্ন্যাসী হাল ধরলো। আনন্দ বসলো দাঁড়ে। নৌকা নিঃশব্দে জলের উপর পিছলে চললো।

বিজয়ের ছিপের কাছাকাছি এসে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলো—আনন্দ, না'য়ে কোন হাতিয়ার নেই ?

—নিশ্চয় আছে। চারগাছা বড় সড়কি। নীচে হাত দিলেই পাবেন।

সন্ন্যাসী সড়কি চারগাছা বের করে পাশে হাতের কাছে রেখে দিলে।

অল্পক্ষণের মধ্যে আনন্দের ডিঙ্গি এসে আলগোছে লাগলো বিজয়ের ছিপের পিছনে। ছিপের লোকগুলি তখন দীর্ঘ পরিশ্রমের পর আহারাদি শেষ করে সবেমাত্র দেহগুলি এলিয়ে দিয়েছে, এমন সময় ডিঙ্গির ধাক্কায় ছিপখানি মৃদু দুলে উঠলো। আর কেউ হলে তখনই ধরতে পারতো না কিন্তু রঘুয়াকে ফাঁকি দেওয়া বড়ই কঠিন। পাঁচ বছর বয়স থেকে সে নৌকা চড়ছে, আজ তার বয়স পঞ্চান্ন। ধড়মড় ক'রে উঠে বসে রঘুয়া জিজ্ঞাসা করলো—কে ?

উত্তর হোল—কোতোয়ালী ?

—এতো রাত্রে কোতোয়ালী ? কি চাই ?

—জরুরী দরকার আছে।

—এই রাতে এমন কি দরকার পড়লো, শুনি ?

—এই ছিপেই কি ডম্বরু নগর থেকে জহুরী এসেছে ?

—হঁ্যা।

—সে সত্যি জহুরী তো ?

—কেন ?

—তবে যে আমরা খবর পেলাম সে জহুরী নয়, মহারাজ ভীমের নৌবাট-অধ্যক্ষ বিজয়শ্রীহরি।

রঘুয়ার সঙ্গীরা চম্‌কে উঠ্‌লো, গায়ের উপর একটা বিষাক্ত সাপ লাফিয়ে পড়লে লোকে যেমন চমকে ওঠে।

—কে হে তুমি ? কি সব বাজে বকছ ?—বলে রঘুয়া সোজা হয়ে বসে কোতোয়ালী ছিপখানির পানে পূর্ণদৃষ্টিতে একবার তাকালো। সেই অন্ধকারেও পাশের ডিঙ্গিতে উপবিষ্ট মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীটীকে দেখে বলে উঠলো—ও, রতনলাল তুমি ? তাই বলি চেনা-চেনা গলা—

রঘুয়ার কথা আর শেষ হোল না।—হ্যাঁ, আমি—বলেই হাতের পাশ থেকে একটি সড়কি তুলে নিয়ে, চকিতে রতনলাল ছুড়ে দিলে রঘুয়ার পানে। রঘুয়া সাবধান হবার সুযোগ পেলে না। সড়কিটী তার কোথায় গিয়ে যে লাগলো তাও ঠিক ঠাহর করা গেল না, 'বাপ্'—বলে উল্টে সে জলে পড়ে গেল। প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি লেগে ছিপখানি উঠলো দুলে।

দয়াল ও মথুরা তখনই জলে লাফিয়ে পড়লো। আর সবাই হৈ হৈ করে উঠলো।

তখনই ছিপখানি আক্রমণ করলো ডিঙ্গিখানাকে, কিন্তু ডিঙ্গিতে তখন মানুষের চিহ্নমাত্র নেই, আনন্দ ও রতনলাল আগেই জলমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডিঙ্গির মধ্যে পাওয়া গেল শুধু তিনটি সড়কি।

কলরব শুনে চারিপাশের অনেকগুলি নৌকা কাছে এল। এবার সত্যিকারের কোতোয়ালী-ছিপও এল। অনেক খোঁজাখুজি হোল, কিন্তু আহত রঘুয়াকে পাওয়া গেল না।

ভাদ্রের ভরা নদী টল্ টল্ করছে। ছলাৎ ছলাৎ করে আঘাত করছে দু'পাশের তটে। উচ্ছ্বাসে যেন দু'কুল ছাপিয়ে উঠতে চায়। আপনার বেগে আপনি চঞ্চল। স্ফীত নদ দু'পাশের তটের বাঁধনকে যেন আর মেনে চলতে পারছে না। স্রোতের স্পর্ধাকে সে আর ধরে রাখতে পারছে না বুঝি।

নদীর ঘাটে আজ সকাল থেকেই কাতারে কাতারে লোক জমছে।

আজ বাচ্-খেলার দিন।

নদীর কিনারে সারি সারি দশী ছিপ অপেক্ষা করছে শুধু একটা আদেশের প্রতীক্ষা।

ওদিকে মহারাজের ময়ূরপঙ্খী না'ও দেখা দিল। জনতা উল্লসিত হয়ে উঠলো। কে একজন চীৎকার তুললো—জয় মহারাজের জয়!

চারিপাশের জনতা গম্ভীর গলায় প্রতিধ্বনি তুললো—জয় মহারাজের জয়!

জয়ধ্বনির শেষে ভেরীর নিনাদ উঠলো।

ঘুম ভেঙ্গে বাচের আরোহীরা যেন চমকে উঠলো। নিজ নিজ দাঁড় ও হাল ধরে সোজা হয়ে সবাই বসলো। এক সার হয়ে দাঁড়ালো সব বাচগুলি।

মহারাজের নৌকার দণ্ডে একটি সাদা পতাকা হাওয়ায় দুলে দুলে উপরে উঠতে লাগলো। দণ্ডের শীর্ষে পতাকা পৌঁছানো মাত্রই শিঙা বেজে উঠলো—ভোঁ। ভোঁ। পোঁ।

ধনুকের ছিলা থেকে তীর যেমন ছিট্‌কে যায়, ছিপগুলি তেমনিভাবে ছিট্‌কে গেল সামনের দিকে। তালে তালে দাঁড় উঠতে লাগলো, পড়তে লাগলো। দূর থেকে মনে হয় যেন দিন-শেষে এক ঝাঁক বলাকা আকাশের গ য় ডানা মেলছে আর গুটাচ্ছে।

দাঁড়ের তালে তালে সুর উঠলো:

> শুধু জল্ নদী জল্—আগে চল্ ঠেলে চল্—
> ছল্ ছল্ ঝল্ মল্—শুধু জল্ ঠেলে চল্—

নদীর আকাশ বাতাস মুখর করে ধুমকেতুর পুচ্ছের মত শাদা ফেনার রেখা টেনে বাচগুলি সারি সারি এগিয়ে চললো।

প্রথমে যে রেখার সরলতা চোখে সুন্দর লাগছিল, ক্রমশঃ তা বেঁকে গেল। তারপর ছিন্নভিন্ন ভাব। ছিপগুলি খাপছাড়া ছড়িয়ে পড়লো, কোনটি আগে, কোনটি পিছে, কোনটি আসেপাশে। শুধু দাঁড় উঠছে আর পড়ছে। যারা পিছিয়ে যাচ্ছে তাদের হাতের বিরাম নেই।

মহারাজের ময়ূরপঙ্খী এগুচ্ছে সকলের শেষে। ময়ূরপঙ্খীর ছাদে সোনালী ঝালর দেওয়া চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। চাঁদোয়ার নীচে মহারাজ ইন্দ্রপাল

উপবিষ্ট এবং তাঁর চারিপাশে বসেছেন মহামাত্য, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাদণ্ডনায়ক, মহাবলাধ্যক্ষ, মহাপ্রতিহার, অক্ষপটলিক প্রভৃতি।

সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি—কার ছিপ আগে যায় সেই দিকে।

লাল রঙের একখানি বাচ ক্রমশঃই এক একখানি অগ্রগামী ছিপকে অতিক্রম করে পুরোভাগে যাচ্ছিল। সেই ছিপখানির উপরেই মহারাজের স্থির দৃষ্টি। তার দ্রুত অগ্রগতির পানে তাকিয়ে মহারাজের মুখে প্রশান্ত হাসি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

ছিপখানি মহাকুমার বীরবাহু নরেন্দ্রপালের।

ছিপগুলি দু'ক্রোশ পার হয়ে গেল। নদীর বুকে একটি পাহাড়ের চূড়া মাথা তুলে আছে, সেইটি একপাক ঘুরেই নৌকাগুলি এবার ফিরবে। এই ঘুরটি যার যত সংক্ষিপ্ত হবে, অগ্রগামী হবার সুবিধা তার তত বেশী। এইখানেই ধাক্কা লাগার, নৌকা উল্টে যাবার, প্রতিযোগীদের আঘাত লাগার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী।

মহাকুমারের নৌকা এইখানেই প্রথম নৌকাখানি ধরে ফেললো। দু'খানি ছিপই বেগবান, কিন্তু শুধু বেগই তো সব নয়, প্রথম ছিপখানি এমন কৌশল সুরু করলো যে, মহাকুমারের নৌকা কোনমতেই তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারলো না। কিন্তু বৃত্ত শেষ করেই তো আবার সেই প্রশস্ত নদ, সেখানে তো আর কৌশলের বিশেষ সুবিধা নেই, সেখানে মহাকুমারের বাচের গতি রোখে কে!

কিন্তু মহাকুমারের বাচ যেই প্রথম নৌকাখানি অতিক্রম করার উপক্রম করলো, অমনি সেই বাচখানির হাল গেল ঘুরে—সোজা বাচখানি এসে ধাক্কা মারলো মহাকুমারের নৌকার গায়। হাল্কা সাধারণ ছিপ, তৎক্ষণাৎ উল্টে গেল।

নদীর তটে উঠলো সোরগোল।

নৌ-গোল্মিকদের পাহারাদার নৌকাগুলি ছুটে এল চারিদিক থেকে।

মহাকুমারের নৌকায় প্রথমেই ছিল বিজয়শ্রীহরি। সাধারণতঃ এইদিন কোন বাচেই নূতন লোকের স্থান হয় না, নৌ-বলাধ্যক্ষ গোবর্ধন সর্দারের চেষ্টায় বিজয়শ্রীহরি মহাকুমারের ছিপে স্থান পেয়েছিল। সর্দারের উদ্দেশ্য ছিল—রাজকুমারের সঙ্গে বিজয়ের খানিকটা পরিচয় ঘটে যাক।

জলে পড়ে বিজয় নৌকাখানি সোজা করার চেষ্টা করছিল। প্রথম

নৌকাখানিতে যে লোকটি হাল ধরেছিল, সে এতক্ষণ ধারালো চোখে বিজয়ের মুখের পানে তাকিয়েছিল, এবার সে পায়ের ধাক্কায় নিজের বাচখানি উল্টে দিয়ে একেবারে লাফিয়ে পড়লো বিজয়ের ঘাড়ের উপর। এক নিমেষে বিজয়ের নাকে এক প্রচণ্ড ঘুসি মেরে, বিজয়কে নিয়ে সে জলের ভিতর তলিয়ে গেল।

ঘুসি খেয়েই বিজয়ের মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। অমন জায়গায়, অমনভাবে যে কেউ তাকে আক্রমণ করতে পারে, সে তা কল্পনাও করেনি, সেজন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নিজেকে একটু সামলে নিতে গিয়েই সে দেখলে, সে জলে ডুবে যাচ্ছে, তার উপর কে একজন তার নাকটা টিপে ধরে আছে। একটু দম নেবার জন্য একটা নিঃশ্বাস টানতে গিয়েই সে খানিকটা জল খেয়ে ফেললো।

এবার যেন বিজয়ের অনেকটা চেতনা হোল, একটু বাতাসের জন্যে বুকের মধ্যে আঁকু-পাকু করে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, কেউ যেন তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সে কে, কেন তাকে ডোবাতে চায়? আততায়ীর দিকে সে দু'হাত বাড়িয়ে দিলে। প্রথমেই একটি ন্যাড়া মাথার উপর হাত পড়লো, দপ্ করে বিজয়ের মনের মাঝে ভেসে উঠলো একখানি মুখ। জলের মধ্যে বিজয় বিড় বিড় করে উঠলো। সে কথা কেউ শুনতে পেলে না, শুধু জলের উপর দু-একটা বুদ্বুদ ভেসে উঠলো মাত্র। নাকের উপর শত্রুর হাতের পেষণ যেন আরো অসহ্য হয়ে উঠলো।

মৃত্যুর আশঙ্কায় তখনই বিজয়ের দেহে কোথা থেকে সব শক্তি আবার ফিরে এলো। আততায়ীর মুখের উপর সে অবিরাম ঘুসি মারতে সুরু করলো। কয়েকটি ঘুসি খেয়েই আততায়ী বুঝলে গতিক সুবিধার নয়, বিজয়কে সে ছেড়ে দিলে। তার ছায়াটা চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়া মাত্রই বিজয় তার পিছনে ছুটলো।

ব্রহ্মপুত্রের স্বচ্ছ জলের নীচে দু'টি মানুষের অস্পষ্ট ছায়া কিলবিল করে এগিয়ে চললো।

প্রথম ছায়াটির পিছনেই জলের উপর মাথা তুললো দ্বিতীয় ছায়া। পরস্পর মুখের পানে তাকালো এবং চিনতেও পারলো পরস্পরকে। বিজয় বলে উঠলো—ওঃ রতনলাল!

তাড়াতাড়ি সে ধরতে গেল রতনলালকে। কিন্তু রতনলাল তৎক্ষণাৎ জলের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিজয়ের ইচ্ছা হোল রতনলালের অনুসরণ করে কিন্তু তখন তার বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে, দেহের সামর্থ্যেও আর কুলিয়ে উঠলো না। জলের উপর সে হাঁপাতে লাগলো।

গোল্লিকেরা যখন তাকে জল থেকে তুললো, তখন সে অবসাদে এলিয়ে পড়েছে।

নগরীর উপকণ্ঠে এক শিবমন্দির।

এইমাত্র সন্ধ্যা-আরতি শেষ হোল। পুণ্য-লোভী নরনারীর দল মন্দির প্রাঙ্গন থেকে তখনও সব বিদায় হয় নি। এক ধারে ক'জন ব্রহ্মচারী উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করছে :

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

অস্থির পদক্ষেপে রতনলাল এসে ঢুকলো, স্তোত্রপাঠীদের সামনে এসে দাঁড়ালো। অমন কত জনই তো তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, কেউই মুখ তুলে তাকালো না, সমভাবেই তারা আবৃত্তি করে চললো :

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকার রূপো
বিভুতাশ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ণমেয়
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

রতনলাল অধৈর্য হয়ে পড়লো, অসহিষ্ণুস্বরে ডাকলো—হীরালাল! হীরালাল!!

ব্রহ্মচারীদের একজন এবার মুখ তুলে তাকালো, সামনে রতনলালকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, বললো—প্রণাম হই আচার্যদেব!

—শুভমস্তু!···রতনলাল আশীর্বাদ করলো।

স্তোত্রপাঠ শেষ হয়ে গিয়েছিল, হীরালালের একখানি হাত ধরে রতন

তাকে নাটমন্দিরের এক প্রান্তে নিয়ে গেল। প্রায় অন্ধকার কোণটিতে পাথর-বাঁধানো চাতালের একপাশে বসে পড়ে বললো—বসো!

হীরালাল পাশে বসলো।

—তারপর এদিককার খবর কি বল?

—গোবর্ধন সর্দার সমস্ত কোষা আর শতী ছিপকে খবর পাঠিয়েছে সোণাঘাটে এসে পৌছবার জন্য।

—মহারাজ ইন্দ্রপাল কি তাহলে হরিকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন?

—সে খবর এখনও পাই নি, তবে শুনেছি গোবর্ধন সর্দার নাকি বলেছে, মহারাজ সাহায্য করতে সম্মত না হলে, যত কৈবর্ত সেনা আছে তাদের সবাইকে নিয়ে সে রামপালদেবের রাজধানী আক্রমণ করবে, কৈবর্ত-প্রাধান্য এইভাবে নষ্ট হতে তারা দেবে না।

—মহারাজের অসম্মতি থাকলেও?

—হ্যাঁ।

—মহারাজকে যদি আগে থেকে এই খবর জানিয়ে দেওয়া হয়?

—তাতেও বিশেষ কিছু লাভ হবে না। প্রথমতঃ মহারাজ এ কথা বিশ্বাস করবেন না, তারপর সমস্ত কৈবর্ত সেনা গোবর্ধনের মুঠোর মধ্যে, তারা বিরক্ত হয় এমন কিছু করবার মত সাহস মহারাজের নেই।

—বুঝেছি!—বলে রতনলাল দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে ধরলো, মুখ তার কালো হয়ে উঠলো মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত। কিছুক্ষণ পরে বললো—আচ্ছা, কবে সব নৌবাট সোনাঘাটে এসে লাগবে খবর নিয়েছ?

—তিন চার দিনের মধ্যে। সম্ভবতঃ আগামী সপ্তাহেই তারা রমাবতী আক্রমণ করবে।

—অসম্ভব!—রতলাল উত্তেজিত হয়ে উঠলো—আবার কৈবর্তরাজ্য ফিরে আসবে? ব্রাহ্মণদের উপর মাহিষ্যরা আদেশ চালাবে? রাজার সিংহাসনে বসবে ছোট জাত, ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে আমরা মাথা নোয়াবো। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য—উচ্চবর্ণেরা তাদের যোগ্য সম্মান পাবে না?—তা অসম্ভব। আমরা তা সইব না, তার চেয়ে সমগ্র গৌড়বঙ্গ যদি শ্মশান হয়ে যায়, সেও ভাল!

সহসা হীরালালের মুখের পানে তাকিয়ে নিজের উত্তেজনায় নিজেই লজ্জিত হয়ে রতনলাল ক্ষণেক চুপ করলো, তারপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললো —এর মূলে কে আছে বলত? গোবর্ধন সর্দার, না?

—হ্যাঁ। আপনি সেদিন বাচ্ খেলার সময় হরিকে জলের মধ্যে আক্রমণ করেছিলেন, তার ফলেই নাকি গোবর্ধন সর্দার হরিকে সাহায্য করাই ঠিক করেছে।

—বেশ, তাহলে আগে তাকেই সরিয়ে দাও।

—তা'হলে কিন্তু একটা মস্ত গোলযোগ বাধার সম্ভাবনা, তারপর আমাদের লোক যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে তো আর কথাই নেই।

রতনলালের চোখ দুটি এবার ছোট হয়ে এল, ভ্রূ দুটি কুঁচকে বললো—তাহলে তুমি কি করতে বল?

—আসল মূলকে সরিয়ে দেওয়াই তো সব চেয়ে ভাল।

—হরিকে?

—হ্যাঁ।

—পারবে?

—আপনি পারেন নি বলে আমরা পারবো না—হীরালাল এবার একটু বাঁকা হাসি হাসলো।

—বেশ, তবে তাই করো—

—কিন্তু আমাদের পারিশ্রমিকটা?

—শত স্বর্ণ।

—মহারাজ ভীমের মহা-নৌবলাধ্যক্ষকে সরিয়ে দেবার জন্য মাত্র একশত স্বর্ণ মুদ্রা? না আচার্যদেব, তাতে হবে না।

—বেশ দু' শো।

—মহারাজ রামপাল দেবের চিরশত্রুকে নির্মূল করার মূল্য মাত্র দু' শো স্বর্ণ মুদ্রা?

—তবে কত চাও?

—সহস্র।

—আমি কিন্তু পাঁচশোর বেশী দিতে পারি না।

—না পারলে কাজ হবে না।

—তুমি না পার অন্য লোক করবে।

—আর আমি যদি প্রকাশ করে দিই ?

—তাহলে তোমাকেও এই জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে !

—তাহলে আপনিও রেহাই পাবেন না আচার্যদেব !—হীরালালের মুখে আবার সেই বাঁকা হাসি।

রতনলাল কি ভেবে বললো—আচ্ছা, যাক্ মিছে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই, তুমি যা চাও তাই পাবে, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ চাই।

—পারিশ্রমিক চাই হাতাহাতি।

—সঙ্গে সঙ্গে, খবর পাবামাত্রই।

—বেশ, আমি তাহলে এখন বিদায় হই আচার্যদেব—প্রণাম করে হীরালাল মন্দিরের মধ্যে ফিরে এল।

রতনলাল পথে নামলো, তার ঠোঁট দু'খানি তখন কাঁপছে, মনে মনে কি-সব সে বিড় বিড় করছিল।

ছোট সহরটির বুকে বিদ্যুতের মত খবর ছড়িয়ে পড়লো: রাজবাড়ীর দাঁতালো হাতীটি ক্ষেপে উঠে শিকল ছিঁড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে। সামনে যা-কিছু পড়ছে শুঁড়ের আঘাতে ছুঁড়ে ফেলছে দূরে, দলিত করছে পায়ের নীচে। ইতিমধ্যেই ক'খানি দোকান, চার-পাঁচখানি রথ, আর একজন মাহুতকে শেষ করেছে। তারপর এখন নাকি আসচে এই দিকেই !

চারিদিকের লোক সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, ছুটোছুটি করে, সোরগোল পড়ে যায়। চারিপাশেই শোনা যায়,—হাতীটি সেই পথেই নাকি আসছে।

কিন্তু যে-পথে হাতীটি আসছে, সে পথে তখন হুলস্থূল পড়ে গেছে। ভীত নরনারীর চীৎকার আর ছুটোছুটিতে, ক্ষ্যাপা হাতী ভয় পেয়ে আরো বেশী উগ্র হয়ে উঠেছে। আশেপাশে যা-কিছু চোখে পড়ছে ভেঙ্গে-চুরে ছিটকে ফেলে দিচ্ছে। সকলের মুখে শুধু এক কথা—পালা পালা পালা !

মহাকুমার বীরবাহু নরেন্দ্রপাল রথে আসছিলেন, ছুটন্ত রথ এসে পড়লো একেবারে মত্ত হস্তীর সামনে। মাথার উপর শুঁড় তুলে হাতী ডেকে উঠলো, ছুটন্ত ঘোড়া দু'পা সামনে তুলে গতি সংযত করলো, চারি পাশ থেকে চীৎকার উঠলো—গেল ! গেল !

আর শ'খানেক হাত মাত্র ব্যবধান, তার পরেই·········

মহাকুমার বিচলিত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে রাজকুমারী জয়শ্রী, রথ ঘুরিয়ে নেবেন সে স্থান নেই, ক্ষ্যাপা হাতীকে যে প্রতিরোধ করবেন সে সম্বল নেই। কাছে আছে একখানি মাত্র তলোয়ার তা দিয়ে আঘাত করা চলবে হয়তো, কিন্তু আত্মরক্ষা করা চলবে না। একমাত্র পথ হচ্ছে রথ থেকে লাফিয়ে পড়া, আশেপাশে কোথাও আশ্রয় নেওয়া। কিন্তু জয়শ্রীর কি হবে ?—আর রাজার ছেলে একটা হাতীর ভয়ে রথ ছেড়ে পালাবে ছোট বোনকে ফেলে ?

মহাকুমার কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না, এদিকে মত্ত হাতী প্রতি মুহূর্তেই নিকটতর হয়ে আসছে !

আর হাত কয়েক মাত্র তফাৎ।

জনতা স্তব্ধ। ভীষণ একটা কিছু প্রত্যক্ষ করার জন্য রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই প্রতীক্ষা করছে অথচ রাজকন্যা ও রাজকুমারের প্রাণরক্ষার জন্য কেউ-যে এগিয়ে আসবে, সে সাহস কারুর নেই।

হাতী শুঁড় বাড়িয়ে দিলে, এইবার ঘোড়াটাকে জড়িয়ে ধরবে, তারপরই রথ ও রাজকুমার·········

সহসা পিছন থেকে এক অশ্বারোহী ছুটে এল, রথ পার হয়ে এগিয়ে গেল হাতীর সামনে। তার শাদা তেজালো ঘোড়াটা সামনের দু'পা তুলে দিলে হাতীর গায়, অশ্বারোহীর হাতের চাবুক সশব্দে এসে পড়ল হাতীর চোখের উপর।

পাগলা হাতী এতক্ষণ আঘাত করেছে, আঘাত পায়নি। এবার আঘাত পেয়ে সে থমকে দাঁড়ালো। আবার অশ্বারোহীর চাবুক গর্জে উঠলো। চাবুকের শেষপ্রান্তটা এবার এসে পড়ল একেবারে তার চোখের উপর। অসহ্য যাতনায় হাতীটা চীৎকার করে উঠলো—এখনি বুঝি শুঁড়ের আঘাতে আঘাতকারীকে বিপর্যস্ত করে পায়ের তলে পিষে ফেলবে। কিন্তু অশ্বারোহীর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, আবার সে আঘাত করলো ঠিক সে-ই চোখের উপর। পাগলা হাতী কিছু ভাববার সময় পেল না, এবার বোধ হয় সে সত্যই ভয় পেল, তখনই পিছু ফিরে যে-পথে এসেছিল সোজা ফিরে চললো সেই পথে।

শুদ্ধ জনতার মুখে এবার ভাষা ফুটলো, সবাই ধন্য ধন্য করে উঠলো।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার পরিচয় কি যুবক? কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি, ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।

—দেখেছেন মহাকুমার, বাচ খেলার দিনে আপনার নৌকায় আমি ছিলাম।

—ওঃ, তুমি নৌবলাধ্যক্ষ গোবর্ধন সর্দারের আত্মীয়।

যুবক স্মিত হাস্যে সমর্থন জানালো।

মহাকুমার বললেন—তোমার সৎসাহস আমার জীবন রক্ষা করেছে, সেজন্য আমি চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। তোমার কোন প্রার্থনা থাকলে বল, সাধ্যমত আমি তা পূরণ করার চেষ্টা করবো।

—আপনার অশেষ অনুগ্রহ মহাকুমার, কিন্তু উপস্থিত আপনার কাছে নিবেদন করার মত কোন প্রার্থনা আমার নেই।

—তোমার নাম কি যুবক?

—বিজয়।

—বেশ, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে। এই নাও আমার অভিজ্ঞান —মহাকুমার নিজের নাম-লেখা আংটি খুলে বিজয়ের হাতে পরিয়ে দিলেন। বিজয় নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে যেমন ক্ষিপ্রগতিতে এসেছিল তেমনই দ্রুত বেগে পথের ধূলা উড়িয়ে চলে গেল।

প্রাসাদের অলিন্দ। সামনেই দুটি দীর্ঘ অশথ গাছ তার বিরাট পাতার ছাতা ছড়িয়ে দিয়েছে, মাথার উপর অনেকখানি আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে। পাশে প্রাচীরের নীচে দিয়ে নদের স্রোত তর তর করে বহে চলছে, পাহাড়ের গায় ধাক্কা খেয়ে মোড় ফিরে হারিয়ে গেছে দিগ্বলয়ে। নদের পিছনে মেঘের মত ধূমেল পাহাড়ের সারি দেখা যায়।

অলিন্দের একপাশে একখানি কাল পাথরের উপর বসেছিলেন মহারাজ ইন্দ্রপাল। তাঁর চারিপাশে ঘিরে বসে আছেন মহামাত্য, মহাবলাধ্যক্ষ, মহাপ্রতীহার এবং আরো ক'জন বিশিষ্ট অমাত্য। অন্তরঙ্গদের একটি ঘরোয়া বৈঠক বসেছে, আলোচনা হচ্ছে অত্যন্ত গোপনীয় একটি বিষয়ের।

আজ গুপ্তচর এসে খবর দিয়েছে: রামপালদেব ব্রহ্মপুত্রের ওপারে বিরাট

জাহাজ তৈরি করাচ্ছেন। মিথিলা জয় করে তিনি কামরূপের দিকে আসবেন। এখন থেকে প্রস্তুত না হলে তখন এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হবে।

মহারাজ ইন্দ্রপাল জিজ্ঞাসা করলেন—কি স্থির করলেন মহামাত্য?

মহামাত্য চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—রামপালদেব ও তার শক্তিশালী সামান্তচক্রকে সম্মুখযুদ্ধে প্রতিহত করতে পারি তেমন শক্তি আমাদের নেই।

মহাবলাধ্যক্ষ বললেন—তাহলে কি আমরা বিনাযুদ্ধেই নতি স্বীকার করবো?

—তাই তো চিন্তা করছি।

—কিন্তু আমাদের পার্বত্য সৈন্য যে ভারতে অদ্বিতীয় মন্ত্রীমশাই! তাছাড়া গিরিমালার অন্তরাল থেকে লড়ার সুবিধা আছে।

—সব জানি মহাবলাধ্যক্ষ, কিন্তু যাদের কাছে ভীমদেবের নবলক্ষ বাহিনী পরাজিত হয়েছে, সে তুলনায় আমরা কত ক্ষুদ্র!

মহারাজ বললেন—তাহলে এতদিন ধরে এতো সৈন্যসামন্ত রাখা, যুদ্ধের নব নব কৌশল শেখানো, সবই যে অর্থহীন মন্ত্রীমশাই?

—অতি সত্য কথা মহারাজ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামার আগে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েই নামা উচিৎ, কার্যক্ষেত্রে নামার পর আর বিচার করার অবসর থাকবে না।

—তোমার কি অভিমত, নৌবলাধ্যক্ষ?—মহারাজ গোবর্ধন সর্দারের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

—ওসব বিচার-বিবেচনা বুঝি না মহারাজ, আমি বুঝি—যে আমাকে আঘাত করবে, আমি যত ছোট বা নগণ্যই হই না কেন তাকে আমি প্রতিঘাত করবোই! যে আঘাত করবে তাকে আঘাত পেতে হবে।

—তুমি নৌবলাধ্যক্ষের যোগ্য কথাই বলেছ সর্দার,—মহামাত্য বললেন—কিন্তু যেখানে পরাজয় সুনিশ্চিত, সেক্ষেত্রে লোকক্ষয় করতে আমি ইচ্ছা করি না। সেইজন্যই আমি চাই এমন একটা মধ্যপথ অবলম্বন করতে, যাতে আমাদের শক্তি ক্ষয় হবে না, প্রজাপুঞ্জের শান্তিও অক্ষুণ্ণ থাকবে, এবং আমাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতাও আমরা হারাব না।

—আপনার উদ্দেশ্য সাধু মহামাত্য—মহারাজ বললেন—কিন্তু সন্ধি ছাড়া

আর কোন মধ্য পথ আছে বলে আমার জানা নাই।

মন্ত্রীমশাই মহারাজের মুখে এই কথাটিই যেন এতক্ষণ শোনার প্রত্যাশা করছিলেন, এবার তিনি বললেন—প্রয়োজন হলে আমরা সন্ধিই করবো মহারাজ।

—কিন্তু গৌড়বঙ্গেশ্বর অমাদেরকে সমকক্ষ বলে মানবেন কেন? তাঁর সঙ্গে আমাদের মত এক ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যের সমান-সমান সন্ধি হওয়া সম্ভব হবে কি?

—সেটাই তো আজকের আলোচ্য বিষয় মহারাজ, সেই সমস্যার বিচার করার জন্যই তো আজকের এই মন্ত্রণা সভায় আমরা সকলে সমবেত হয়েছি।

কিন্তু অনেক বিচার, বিতর্ক ও অলোচনা করেও কোন নিশ্চিত সমাধানে তাঁরা পৌছিতে পারলেন না। তবে উপস্থিতের মত স্থির হলো যে—এখন কিছুদিনের জন্য চুপ করে রামপালদেব ও তাঁর সামন্তচক্রের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখাই ভালো, এবং এই অবসরে রাজ্যের প্রত্যেকটী যুবককে নৌযুদ্ধে ও পার্বত্যযুদ্ধে শিক্ষিত করে তোলা হোক। যেন প্রয়োজন হলে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করতে পারে।

মহারাজ বললেন—নৌবাহিনী গঠনের ভার গ্রহন করুন নৌবলাধ্যক্ষ গোবর্ধন সর্দার, আর পার্বত্য-বাহিনীর ভার গ্রহণ করুন মহাবলাধ্যক্ষ রঘুপতি রায়।

দু'জনেই সসম্মানে হাত জোড় করে বললেন—মহারাজের আদেশ শিরোধার্য!

মহারাজ বললেন—তাহলে যুবকদের সৈন্য দলে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে কাল প্রভাতেই রাজ্যের সর্বত্র আমার আদেশ প্রচার করার ব্যবস্থা করবেন মহামাত্য।

—যথা আজ্ঞা মহারাজ!

—তা'হলে আজ এইখানেই আমাদের সভা ভঙ্গ হোক।

গোবর্ধন সর্দার তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলে উঠলেন—অধীনের একটা আবেদন আছে মহারাজ!

—কী বলুন?

—আমার বয়স হয়েছে মহারাজ, আমার একার পক্ষে এই গুরুদায়িত্ববহন

করা এখন বড়ই কষ্টসাধ্য, সেইজন্য আমি একজন সহকর্মী চাই।

—প্রত্যেক উপনায়ক আপনাকে সাহায্য করবেন।

—তা জানি মহারাজ, কিন্তু আমি একজন বিশেষ সহকর্মী চাই—যাঁর উপর একান্তভাবে নির্ভর করা চলবে!

—বেশ, বলুন কাকে আপনি মনোনীত করেছেন?

—আমার অধীনস্থ কোন নৌবাটনায়ক নয় মহারাজ, সে আপনার রাজ্যে নবাগত, আমার ভ্রাতুস্পুত্র বিজয় সর্দার।

—আপনার ভ্রাতুস্পুত্র, যে সেদিন ক্ষ্যাপা হাতীর মুখ থেকে মহাকুমারের জীবন রক্ষা করেছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ।

—তার সৎসাহস প্রশংসনীয়, কিন্তু নৌযুদ্ধের কৌশল তার ভালমত জানা আছে তো?

—আজ্ঞে, আত্মীয় হলেও অযোগ্য ব্যক্তির জন্য আপনার চরণে আমি আবেদন জানাতাম না মহারাজ। বললে অত্যুক্তি হবে না, সে নৌযুদ্ধে আমার চেয়েও দক্ষ।

—বেশ, আজ থেকেই আমি তাকে আপনার বিশেষ সহযোগীর পদে নিয়োগ করলাম।

—মহারাজের অশেষ অনুগ্রহ!

মৃদু হেসে মহারাজ ইন্দ্রপালদেব বিদায় নিলেন, সভা ভাঙলো।

সেই রাত্রেরই কথা।

রাত তৃতীয় প্রহর প্রায় শেষ। পাহাড়ী নগরীটী মৃতের মত স্তব্ধ নিঝ্‌ঝুম্। ঝিঁঝির ডাকও আর শোনা যায় না। এমন সময় সহসা বিজয়-হরির ঘুম ভেঙে গেল। সারা দেহ ঘামে ভিজে উঠেছে, তাড়াতাড়ি সে বিছানার উপর উঠে বসলো।

বিজয় সর্দার আজ একটু বেশী রাতেই ঘুমিয়েছে, এত শীঘ্র তার ঘুম-ভেঙে যাবার কথা নয়। একটী স্বপ্ন তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। বিজয় সর্দার স্বপ্ন দেখছিল, দেখলো: রমাবতীর কারাগারে হাতে-পায়ে শিকল-পরা মহারাজ

ভীমদেব। কারাকক্ষের প্রায়-অন্ধকার মলিনতা তাঁর মুখকে ম্লান করে দিয়েছে, রাজকীয় সে লাবণ্যের দীপ্তি আর নেই। খাঁচায় বদ্ধ সিংহের মত তিনি ঘরের মধ্যে পদচারণা করছেন। হঠাৎ বিজয়কে সামনে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, বিজয়ের চোখের উপর জবাফুলের মত লাল দুটি চোখ তুলে বললেন—কি বিজয়হরি, দেখতে এসেছ মহারাজকে শিকল পরলে কেমন মানায় ?

বিজয় কোন উত্তর দিলে না। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ভীমদেব আবার বলতে সুরু করলেন—তোমরাও শেষে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে বিজয়! তোমাকে বাল্যকাল থেকে পালন করলাম, আর আমার দুর্যোগের দিনে তোমরা আমার পাশে কেউ রইলে না!

—সেদিন সমতট থেকে ঠিক সময় ফিরতে পারিনি মহারাজ, কিন্তু তা'বলে আমি অকৃতজ্ঞ নই। সেদিনকার ভুল আমি শোধরাবো, রমাবতীর এই কারাগার ধূলিসাৎ করে দেব, আবার আপনাকে আমি বসাবো বারেন্দ্রভূমির সিংহাসনে।

—তুমি আবার আমাকে সিংহাসনে বসাবে, পারবে রামপালের সামন্ত-চক্রকে পরাজিত করতে ?

—কেন পারবো না মহারাজ, মানুষের অসাধ্য কোন কাজ আছে ?

—সৈন্য সংগ্রহ করেছ ?—অর্থ ?

—আপনি চিন্তিত হবেন না মহারাজ, যথাসময় সব ঠিক হবে।

—যথাসময়! হাহাহাঃ—ভীমদেব অট্টহাসি হেসে উঠলেন—যতদিনে তোমার সেই যথাসময় আসবে, ততদিনে এই কারাগারে মহারাজ ভীমদেব আর থাকবে না, থাকবে তার ক'খানি কঙ্কাল। তোমার অর্থ নেই, তোমার অনুচর নেই—তুমি কি করবে বিজয় ? তুমি কিছুই করতে পারবে না।

—নিশ্চয় পারবো মহারাজ!

—হাহাহাঃ—ভীমদেব আবার হেসে উঠলেন।

বিজয়হরি জোর করে কি যেন বলতে গেল, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার ঘুম গেল ভেঙে।

কিছুক্ষণ একটা কথা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রইল—'তোমার অর্থ নেই,

তোমার অনুচর নেই, তুমি কি করবে বিজয়'—সত্যই কি তাহলে সে কিছুই করতে পারবে না। তার অর্থ নেই, তার অনুচর নেই, বলে কি তার করারও কিছু নেই ! মহারাজ ভীমদেব কি তাহলে কারাকক্ষের পাষাণের উপরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন ?

বিজয়ের মাথা গরম হয়ে ওঠে। ঘরের বাইরে আসে। চাঁদ অনেকক্ষণ অস্ত গেছে, চারিপাশে অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। সেই অন্ধকারের পানে তাকালে মনে হয় না কোন আলো কোনদিন তাকে ভেদ করতে পারবে। বিজয়ের মনের আকাশেও অমনি অন্ধকার জমা হয়েছে। সে আকাশে আলোর দিশা পওয়া যায় না, কোন কোণে কোথাও একটা ক্ষীণ রেখাও নেই।

বিজয় বাগানের একটি প্রস্তর-বেদীর উপর এসে বসলো। থম্‌থমে রাত। এতটুকু বাতাস কোথাও নেই। দুশ্চিন্তায় মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে। নিঃস্ব হয়ে সে পালিয়ে এসেছে এখন অর্থ পায় কোথায় ? অথচ যুদ্ধ একটা করতে হলেই টাকা চাই, টাকা হলেই সৈন্য হবে। আর যার যত বেশী সেনা তার জয় তত সুনিশ্চিত। কিন্তু এই অর্থ—লাখ লাখ টাকা তাকে দেবে কে ? রামপাল-দেবের মত বিত্তশালী উচ্চবর্ণের সহানুভূতি সে তো পাবে না। কৈবর্ত সবাই গরীব, কেউ নগদ টাকা মাহিনা নিয়ে অস্ত্রচালনা করে, কেউ-বা করে চাষ-আবাদ। দেবার সামর্থ্য তাদের নেই। উঁচুজাত পয়সার জোরে যে অসাম্য চালাচ্ছে, তা থেকে নিজেদের মুক্ত করার মত যোগ্যতা তাদের কই !

হঠাৎ বিজয়ের মনে হোল অত্যন্ত কাছে কার যেন পায়ের শব্দ। ধারালো দৃষ্টিতে চারিপাশে ঠাহর করতে দেখা গেল : একটা মানুষের কালো ছায়া এগিয়ে চলেছে বাড়ীর দিকে। ছায়াটা বাড়ীর ভিতর না গিয়ে বাইরের দিক দিয়ে ঘুরে বিজয়ের শোবার ঘরের জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। খানিকক্ষণ কি যেন দেখলো, তারপর কোমর থেকে ছোট একখানি ছোরা বের করে ছুঁড়ে মারলো ঘরের ভিতর। ঠিক সেই মুহূর্তে বিজয়শ্রীহরি লাফিয়ে পড়লো তার ঘাড়ের উপর।

তারপর ধ্বস্তাধ্বস্তি, গোলযোগ।

লোকজন এসে পড়লো।

আলো এলো।

গোবর্ধন সর্দার প্রথম দৃষ্টিতেই আততায়ীকে চিনতে পারলেন,—আরে, এযে আমাদের শিবমন্দিরের হীরালাল ব্রহ্মচারী। তা ব্রহ্মচারী, এতো রাত্রে এখানে এসেছিলে কি মনে করে?

—ব্রহ্মচারী এসেছিলেন মানুষ খুন করতে—বিজয় উত্তর দিলে।

—আজ্ঞে, আ-মি ··আ-আ-মি···ব্রহ্মচারী ততক্ষণে কাঁপতে সুরু করেছে।

—হ্যাঁ, তুমি।—বিজয় বলে উঠলো—এখনও ছোরাখানা আমার বিছানায় বিঁধে আছে।

গোবর্ধন সর্দার একবার জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর তাকালেন, সত্যই একখানি ছোরা বিছানায় বিঁধে আছে। হীরালালের মুখের পানে তাকিয়ে রুষ্টস্বরে বললেন—ব্রহ্মচারীর যোগ্য কাজই হয়েছে। গুপ্তঘাতকের দণ্ড কি জান ত? তোমাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হবে।

হীরালাল কাঁপতে কাঁপতে গোবর্ধনের পা জড়িয়ে ধরলো—আমাকে প্রাণে মারবেন না সর্দার, আমার কোন দোষ নেই উত্তরাপথের ধর্মচক্র আমাকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছিল···আমি না করলে তারা আমাকে মাটির নীচে একটি ঘরে আজীবন আটকে রাখবে বলেছিল···

—বলেছিল কে?

—আজ্ঞে, রতনলাল।

বিজয় বিজ্ঞের মত মাথা নাড়লো, গোবর্ধন সর্দার আর কোন কথা বললেন না।

হীরালালকে তখনকার মত মহাপ্রতিহারের হাতে সমর্পণ করা হোল।

রাজবাড়ীর বাগানের যে দিকটা একেবারে নদীর ধারে এসে পৌচেছে সেইখানে এক গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বিজয়হরি বসেছিল। মুখে চিন্তার রেখা। সঙ্গীহীন নির্জনতায় মনের খাতা খুলে সে হিসাব নিকাশ করতে বসেছে। একে একে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে এক একখানি মুখ—একান্ত বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ যারা ছিল, আজ তারা একে একে মৃত্যুর অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মহারাজ ভীমদেব আজ রমাবতীর কারাগারে। অনাবৃত কঠিন পাষাণের বুকে রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে অনিদ্রায়—অধিনায়ক বিজয়হরি দশজন মাত্র অনুচর আর একখানি মাত্র ছিপ সম্বল করে

আজ পলাতক। তারও পিছনে অনুসরণ করছে গুপ্তঘাতকের শাণিত ছুরী। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর বিপর্যয়!

এই বিপর্যয়কেই কি তাহলে মেনে নিতে হবে? নিজের অক্ষমতাকে কি তাহলে অদৃষ্টের খেলা বলেই স্বীকার করতে হবে? যে অদেখা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে হিন্দুস্থানের জনগণ যুগ যুগ ধরে মুষ্টিমেয়ের পদাঘাত সইছে, তার কোন প্রতিবিধান হবে না? নীচজাতির দীর্ঘনিঃশ্বাস, দিনের পর দিন মহাশূন্যেই লীন হয়ে যাবে? মানুষ হয়ে জন্মেও মানুষের অধিকার তারা পাবে না?

—না না না, তা হয় না। অদৃষ্টের চেয়েও মানুষ বড়। নিজের অদৃষ্টকে মানুষ নিজেই তৈরী করতে পারে। আমার ইঙ্গিতে একদিন দীপালোকিত নগরী অরণ্যের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, আমার ইচ্ছায় একদিন নির্জন নদী-তট বিরাট বন্দরে পরিণত হয়েছে। আর আজ আমি অদৃষ্ট আর ভাগ্যের উপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো? আমার অদৃষ্ট এখনও আমায় চিনতে পারে নি। হাহাহাঃ!

নিজের অট্টহাসিতে বিজয় নিজেই চমকে উঠলো। এমনভাবে সে হাসছে কেন? এখন তো তার মনোবিকারের সময় নয়, এখন যে প্রতি পদে তাকে হিসাব করে চলতে হবে। সৈন্যহীন সেনাপতির দায়িত্ব সৈন্য-বহুল নায়কের চেয়ে যে অনেক বেশী।

বিজয় উঠে দাঁড়ালো।

—কে ওখানে?

পিছু ফিরে বিজয় দেখলে যুবরাজ নরেন্দ্রপাল, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি টেনে এনে বললো—কি আদেশ মহাকুমার?

মহাকুমার এগিয়ে এলেন, বললেন—তুমিই বুঝি হাসছিলে, সর্দার?

—হ্যাঁ, মহাকুমার।

—কি জোরেই তুমি হাসতে পার বিজয়!

—আপনার বিরক্তি সঞ্চারের জন্য ক্ষমা করুন মহাকুমার।

—তোমার সঙ্গে আর কেউ ছিল?

—আজ্ঞে না, আমি একাই বসে আছি।

—একা একাই অমন হাসছিলে? অদ্ভুত মানুষ তো তুমি!

—আমারও অনেক সময় নিজেকে কেমন অদ্ভুত লাগে মহাকুমার, আমি নিজেই বুঝিনা।

—কিন্তু হাসবার নিশ্চয়ই কোন কারণ ঘটেছিল ?

—বিশেষ কিছুই নয়।

—অকারণে কেউ কখনও হাসে নাকি ? কি ভাবছিলে তখন বলত ?

—কি ভাবছিলাম!—ক' মুহূর্ত বিজয় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, তারপর বললো—হ্যাঁ সত্যই হাসবার একটা কারণ ঘটেছিল: ওই দোলন-চাঁপা ফুলটির উপর একটা প্রজাপতি এসে বসলো, সূর্যের কিরণ তার পাখার রঙে ঝলমলিয়ে উঠলো, ঠিক সেই সময় কোথা থেকে একটি পাখী এসে প্রজাপতিটাকে ধরে নিয়ে গেল। দেখে আমার মনে হোল—যা শান্ত ও সুন্দর, বলিষ্ঠের নিষ্ঠুরতা তাকে বাঁচতে দেয় না। ন্যায় ও নির্মমতাই প্রকৃতির বিধান। বাঘ চিরদিনই হরিণ ধরে খায়, ফড়িং মরে চড়ুই-পাখীর ঠোঁটের আঘাতে, ছোট মাছগুলোকে বড় মাছ নির্বিবাদে গ্রাস করে যায়—এই চিরদিন ঘটছে ও ঘটবে, তবু মানুষ এই বিধানকে মানতে চায় না, এর উল্টো কথাটাই জোর গলায় সত্য বলে প্রচার করে। এটা কি আমাদের নিছক পাগলামি নয় মহাকুমার ? হাহাহাঃ!

বিজয় হেসে উঠলো, তবে আগের মত উচ্চ হাসি নয়।

রাজকুমারের মুখেও এবার মৃদুহাসি ফুটে উঠলো, বললেন—যুদ্ধ-শাস্ত্র ছাড়া কিছু-কিছু দর্শন ও সাহিত্য আলোচনাও করেছ দেখছি।

—আমি নিজে কিছুই শিখিনি মহাকুমার, অভিজ্ঞতা আমায় শিখিয়েছে।

—তোমার বয়স তো খুব বেশী নয় সর্দার, এরই মধ্যে তোমার জীবনে কি নিদারুণ অভিজ্ঞতা ঘটলো, যা তোমার মনকে এমন বিচলিত করেছে।

—বিচলিত। না, ঠিক বিচলিত নয় মহাকুমার। মাঝে মাঝে নানান্ চিন্তা মনের মাঝে এমন ভীড় করে আসে যে ভেবে-চিন্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলার সময় পাই না, যা মুখে আসে তাই বলে ফেলি। ওটা আমার একটা সাময়িক দুর্বলতা মাত্র। আপনি আমায় ক্ষমা করুন মহাকুমার।

—অপরাধ কি করলে তাই বুঝলাম না আর ক্ষমা চেয়ে বসলে ? বুঝেছি এক সঙ্গে বাপ-মা হারিয়ে আর গুপ্তঘাতকের ছুরী দেখে তুমি খুব মুষড়ে পড়েছ,·· আমার মা যখন মারা গেলেন তখন আমারও মনের অবস্থা অমনই

হয়েছিল। তারপর ক্রমশঃ সবই সহে গেল। এখন মার মুখখানি আর স্পষ্ট মনেও পড়ে না। তোমারও মনের ক্ষত একদিন এমনিভাবেই শুকিয়ে যাবে বন্ধু !···থাক্, ওসব দুঃখের কথা বলে তোমার মনকে আমি আরো ব্যাথাতুর করে তুলতে চাই না, চল একটু বেড়িয়ে আসি।

—কোথায় মহাকুমার ?

—আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি, সংঘমন্দিরে আজ মহোৎসব, সেইখানেই যাই চলো।

—চলুন।

—দু'জনে উদ্যানের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলো।

ফটকের কাছাকাছি এসেছে এমন সময় কাছাকাছি এক কুঞ্জের আড়াল থেকে একটি মেয়ে ছুটে এল, কলকণ্ঠে বলে উঠলো—তুমি খুব লোক যা হোক্ দাদা, বন্ধু পেয়ে আমার কথাটা একেবারে ভুলে গেলে !

—আরে, আমি জানি তুই রথে বসে আছিস্।

মেয়েটি মাথা দুলিয়ে বললো—জানি তুমি এখন বলবে অমনি একটা কিছু।

নরেন্দ্রপাল সস্নেহে বোনের একখানি হাত ধরলো। বাইরে রথ প্রতীক্ষা করছিল। তিনজন রথে এসে বসলো।

নদীর তীরে মন্দির। আকাশ-ছোঁয়া বিরাট মন্দির। দেবতার নামে মানুষ পাথরের পর পাথর সাজিয়েছে, নিজ নিজ শ্রদ্ধাকে চিরস্মরণীয় করার জন্য সেই পাথরের গায় করেছে নানান্ কারুকাজ। শীর্ষের স্বর্ণ চূড়ায় অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা ঝলমল করছে। নীল আকাশের ছায়া পড়েছে তার পিছনে। মাঝে মাঝে পেঁজা তূলার মত শাদা-শাদা মেঘ সেই আলোর রশ্মিকে ঢেকে দিচ্ছে, মেঘের গায় জাগছে স্বর্ণাভ সীমা-রেখা।

রাজকুমারী বলে উঠলো—চমৎকার !

—কি চমৎকার জয়শ্রী ?—রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন।

—ওই মন্দির। যত দেখি ততই আমার ভালো লাগে। দূর থেকে দেখলেই মনে হয় যেন কোন ঋষি তন্ময় হয়ে ধ্যানে বসে আছেন। ইচ্ছা হয় বার বার নমস্কার করি। তোমার ভক্তি হয় না, দাদা ?

—হয় বই-কি বোন, তবে সে মন্দিরকে নয়, মন্দিরের ভিতর যিনি

আছেন তাঁকে।

—ওই হোল, ওই একই কথা!

মন্দির প্রাঙ্গনে তিনজন রথ থেকে নামলেন, চারিপাশে উৎসব-মুখর জনতার ভীড়। রাজকুমার ও রাজকুমারীকে দেখে জনতা সমীহ জানিয়ে পথ ছেড়ে দিলে। তিনজনে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন।

মন্দিরের মধ্যে শ্বেত-পাথরের তথাগত মূর্তি। সৌম্য শান্ত মহীয়ান। মুখে স্নিগ্ধ হাসি, চোখে বিশ্বের করুণা। এক হাতে শান্তি, অপর হাতে প্রজ্ঞা। রাজ্যত্যাগী রাজকুমার বিশ্বের রোগ, শোক, হিংসা, দ্বেষ ও নীচতার মধ্যে যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন সেই পূর্ণতার বাণী তিনি শুনিয়ে গেলেন জ্ঞাননিঃস্ব অজ্ঞ মানব সমাজকে। ধরণীর স্বার্থান্ধ নরনারী সে জ্ঞানকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে না পারলেও, মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা জানাতে ভুললো না, তাঁর স্মৃতিকে মনোদেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করে চললো যুগ যুগ ধরে।

অসংখ্য দীপালোক গর্ভগৃহের ধূপ-ধূনার ধূমেলতায় রহস্যময় হয়ে উঠেছে, মর্মর-মূর্তি হয়ে উঠেছে মহিমান্বিত, অস্ফুটতপঃ-প্রভার মত স্নিগ্ধ দ্যুতি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারিপাশে। সমবেত ভিক্ষুরা উদাত্ত কণ্ঠে সুরের তরঙ্গ তুলেছে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

বন্দনা শেষ হলে শ্বেত পুষ্পের অঞ্জলিতে মূর্তির দু'চরণ ঢাকা পড়ে গেল; একে একে দীপের পর দীপ জ্বালিয়ে দিলে শ্রমণ ও মঙ্গলকামী নাগরিক-নাগরিকার দল। বাহিরে ঘণ্টারবের সঙ্গে সঙ্গে বার বার শোনা গেল—ওঁ শ্রীমণিপদ্মেহুঁ! ওঁ শ্রীমণিপদ্মেহুঁ!

বিজয় একপাশে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কোন এক সময় রাজকুমার তার কাঁধে একখানি হাত রেখে বললেন—চল বন্ধু!

বিজয় সচেতন হয়ে উঠলো, বললো—হ্যাঁ, চলুন।

চলতে চলতে মহাকুমার বিজয়ের একখানি হাত চেপে ধরলেন, বললেন—কি ভাবছ বলত?

বিজয় চমকে উঠলো, বললো—ভাবছি?—তারপর বর্তমান স্থান কাল

পাত্রে ফিরে এসে সে বলতে সুরু করলো—হ্যাঁ ভাবছি; ভাবছি: একা রাজার কুমার সংসার ও সিংহাসন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। যুগ যুগ ধরে আত্মাভিমানের অহঙ্কারে যারা আর সবাইকে পদাঘাত করেছে তাদের বিরুদ্ধে করলেন অভিযান। ধীর উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—বেদ বড় নয়, উপবীত বড় নয়, প্রেম বড়, ভ্রাতৃত্ব বড়! জন্ম নিয়ে মানুষের বিচার চলবে না, কর্ম দেখে মানুষের বিচার করতে হবে। উঁচু-নীচু বলে কোন ভেদ নাই, মনুষ্যত্বই সবার উপরে, সত্যই সবার বড়। চারিপাশের জনতা দলে দলে এসে গ্রহণ করলো তাঁর মন্ত্র, পূজা করলো তাঁর ব্যক্তিত্বকে, সমগ্র ভারত আশ্রয় নিলে তাঁর চরণতলে। কিন্তু কালের আবর্তনে আমাদের শঠতা ও ক্রূরতা আবার ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বকে ছাপিয়ে উঠলো। আবার এলো উঁচু-নীচুর বিচার, পরস্পরকে দাবিয়ে রাখার দ্বন্দ্ব, পরস্পরকে বঞ্চিত করার আকাঙ্ক্ষা। চারিপাশের এই স্বার্থপরতা থেকে মাঝে মাঝে মুক্তি পাবার জন্য মানুষ মন্দির গড়লো, শাক্যমুনির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলো সেই মন্দিরের মধ্যে। ওই মূর্তির পানে তাকিয়ে মানুষ ক্ষণেকের জন্যও সত্যিকারের মানুষ হতে চায়, কিন্তু পরক্ষণেই নীচতা ও ক্রূরতা, অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা তার মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়—আবার সে এই পঙ্কিল বিশ্বের সাধারণ মানুষে ফিরে আসে। আমরাও এদেরই একজন,—নীচ, ক্রূর, অহঙ্কারী, স্বার্থপর সাধারণ মানুষ!

বিজয় থামলো। কেমন যেন অন্যমনস্কের মত সে রথে উঠে বসলো। রাজকুমার ও রাজকন্যাও অনেকক্ষণ কোন কথাই বললো না।

রূপালী রথে দুধের মত শাদা দুটী ঘোড়া ধনুকের মত ঘাড় বেঁকিয়ে কেশর দুলিয়ে তালে তালে পা ফেলে ছুটছে, রথ চলছে।

রথে তিনজন স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। মুখে কারুর কথা নেই। মৌনতার আবরণে নিজ নিজ চিন্তাধারাকে তারা প্রচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাদের ঘিরে বাতাস থম থম করছে। ঘোড়ার পায়ের আঘাত আর চাকার ঘূর্ণন ধূলো উড়াচ্ছে পিছন পানে। রথ ছুটছে।

পিছনে পাহাড়ের মাথায় চাঁদ দেখা দিয়েছে। দু'পাশের গাছের পাতায় দমকা হাওয়া শিরশির করছে। ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ মাঝে মাঝে বাতাসে সুরভির চাঞ্চল্য তুলছে। সেই নির্মলতাকে ধূলি-ধূসর করে রথ ছুটছে।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, গাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে ধূলিময় মলিন পথটি বরাবর একেবেঁকে যেতে যেতে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সামনে পাহাড়ের উপর সহরটী চোখে পড়ে, স্তিমিত চাঁদের আলোয় মনে হয়ে ওটা যেন একটী স্বপ্নপুরী, আর ওই পথটী যেন একটী আকর্ষণী সুতো—মানুষের মন ভুলিয়ে, টেনে নিয়ে যায় ওই স্বপন-সহরের রহস্যপুরীতে।

বিজয়ের মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কোন এক সময় জয়শ্রী বলে উঠলো —দেখ দাদা—

মহাকুমার মুখ ফেরালেন—কি দিদি?

—বিজয় সর্দার খুব বেশী কথা বলতে ভালবাসে, না দাদা?

মহাকুমার হেসে ফেললেন।

নিজের নাম শুনে বিজয়ের মন বর্তমানে ফিরে এল, বললো—আমায় কিছু বলছেন রাজকুমারী?

—হ্যাঁ, বলছিলাম যে তুমি খুব কথা বলতে ভালবাস, না সর্দার? একটু সুযোগ পেলেই একটা করে বক্তৃতা দেওয়া তোমার অভ্যাস।

—না রাজকুমারী, ওগুলো বক্তৃতা নয়, ওগুলো আমার স্বপ্ন।

দুষ্ট হাসি হেসে রাজকুমারী বললো—জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছ? আবার সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা?

মুখে একটু মিষ্টি হাসি টেনে এনে বিজয় বললো—ও আমার একটী বিশেষ ব্যায়রাম রাজকুমারী।

—তা আমাদের বভিবুড়োকে একবার দেখাও না কেন?

—অনেক বড় বড় বদ্যি দেখিয়েছি রাজকুমারী, এ রোগ না মরলে সারবে না—বিজয়ের স্বর বিষণ্ন হয়ে উঠলো!

জয়শ্রী বললো—তুমি যখন কথা বলছিলে, তোমার চোখদুটির পানে তাকিয়ে আমার কিন্তু তখন বড় ভয় করছিল। তোমার চোখ দুটি যেন জ্বলে জ্বলে উঠছিল।

—তাতো করবেই রাজকুমারী, এ যে বড় কঠিন ব্যায়রাম। কত বড় বড় জোয়ান ভয় পেয়ে সরে গেল আর তুমি তো আমার ছোট্ট দিদিভাই!

জয়শ্রীর চোখ দুটি এবার ছলছল করে উঠলো, সেই চোখের পানে তাকিয়ে বিজয় বললো—তোমার চোখে জল এসে পড়লো দিদিভাই!

—কাঁদবো কেন, বারেঃ! তোমার অসুখ তো আমার কি?—বলে রাজকুমারী অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

—রাগ করলে দিদিভাই—বলে হাসতে হাসতে বিজয় তার একখানি হাত তুলে ধরে আঙুলের আংটিটি সস্নেহে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো।

রথ ছুটছে।

জনতা সংক্ষেপ করার জন্য সারথী জনবহুল পথ ছেড়ে একটা নির্জন পথ ধরলো। পথটা দীর্ঘ হলেও ভীড় নেই, তাড়াতাড়ি রথ ছুটিয়ে যাওয়ায় পক্ষে সুবিধা। নগরীর উপকণ্ঠে উপবনকে বেষ্টন করে সোজা পথ চলে গেছে, পিছনে ধূলার পতকা উড়িয়ে রথ ছুটলো সেই পথে।

চাঁদের আলোয় দেখা গেল সামনের দিকে কি যেন একটা আসছে।

কি আসছে ধূলার আবরণ ভেদ করে ম্লান জ্যোৎস্নায় প্রথমে কিছুই ঠাহর করা গেল না। বোঝা গেল খানিক পরে, যখন সেই ধূলার পর্দা ঠেলে দেখা দিল একজন ঘোড়-সওয়ার। কাছে এসে অশ্বারোহী, একেবারে রথের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলো—রাজকুমারের রথ, না?

সারথী রথ রুখলো, উত্তর করলো—হ্যাঁ, আপনি কে, কি প্রয়োজন বলুন?

অশ্বারোহী সে কথার কোন জবাব দিল না, রথের পাশে এসে এক জোড়া ধারালো চোখের দৃষ্টি তুলে ধরলো বিজয়ের মুখের উপর, বললো—চিনতে পার বিজয়হরি?

মৃদু হেসে বিজয় বললো—কে, রতন রাও?

—হ্যাঁ, হরিসর্দার।

—তা এই অসময়ে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, এখানে কি মনে করে? বন্ধুত্ব করতে নয় নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ, বন্ধুত্ব করতেই এসেছি হরিসর্দার, তবে তোমার সঙ্গে নয় তোমার তলোয়ারের সঙ্গে।

—কি করতে চাও, খুন?

—আর কেউ হলে তাই করতো, কিন্তু আমি ততো কাপুরুষ নই। আমি এসেছি তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে। আমি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। আমি যদি যোগ্য হই আমি তোমায় উচিতমত প্রতিফল দেব, আর যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরূপ হয়……

বিজয় বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—কিসের প্রতিফল রতনরাও?

—পিতৃহত্যার।

—আমি তোমার পিতাকে হত্যা করিনি রতনরাও। শত্রুর কাছে গুপ্ত সংবাদ বিক্রয় করার অপরাধে বিশ্বাসঘাতক বলে সাধারণের আদালতে তার বিচার হয়েছিল, আমি শুধু তাকে গ্রেপ্তার করেছিলাম মাত্র।

—বিশ্বাসঘাতক!

—শুধু বিশ্বাসঘাতক নয়, রাজদ্রোহী। যে রাজার অন্নে ও অনুগ্রহে তিনি পুষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরই বিরুদ্ধে তিনি করেছিলেন ষড়যন্ত্র।

—রাজা!—রতনের মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠলো—নীচ কৈবর্ত হবে বারেন্দ্রভূমির মহারাজা আর ব্রাহ্মণ তার চরণতলে বসে পদসেবা করবে! ছোটজাতের এই রাজসিক অহঙ্কার সইতে হবে, মনুর শাস্ত্রে এমন বিধান কোথাও নেই হরি সর্দার।

—মনুর শাস্ত্র!—বিজয়হরির মুখে উপেক্ষার বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো—ব্রাহ্মণের লেখা শাস্ত্রে উপবীতের মূল্যই বেশী ধরা হয়, রতনরাও। ওই শাস্ত্রের পাতায় আজ ঘুণ ধরেছে, ওটা আগাগোড়া আরেকবার নতুন করে লেখার দরকার। এ যুগে একগোছা সুতোর চেয়েও বাহুর শক্তির সম্মান অনেক বেশী। যে দেহের শক্তিতে দেশ রক্ষা করতে পারবে, দেশবাসীর কাছে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দাবী করার অধিকারও তার আছে। শুধু জন্ম-গৌরব আর শাস্ত্র-সৌরভ দিয়ে মনুষ্যত্বকে অবহেলা করা আর চলে না, রতনরাও! শুধু কথার জোরে আর কতদিন দেশবাসীকে ভুলিয়ে রাখবে বল?

—তার নিষ্পত্তি এইখানেই হয়ে যাবে সেনাপতি।

—সেনাপতি?—যুবরাজ বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

রতন মৃদু হেসে বললো—ইনি ভীমরাজের নৌবলাধ্যক্ষ সর্দার বিজয় শ্রীহরি।

যুবরাজ, রাজকুমারী ও সারথী, সকলের বিস্মিত দৃষ্টি এসে পড়লো বিজয়ের মুখের উপর।

বিজয় বললো—আজ আর আমি নৌবলাধ্যক্ষ নই রতন, আজ আমি একজন পলাতক নাগরিক মাত্র।

—তুমি কি ছিলে, কি হয়েছে, আর কি হবে—তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমার প্রয়োজন শুধু তোমাকে নিয়ে, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

—আমি সব সময়েই প্রস্তুত !

—উত্তম। আমার কাছে দু'খানি তলোয়ার আছে। এর মধ্যে যেখানি তোমার অভিরুচি—বলে জিনের একপাশ থেকে ঝক্‌মকে দু'খানি তলোয়ার, আরেক পাশ থেকে দু'খানি নূতন ঢাল টেনে নিয়ে রতন বিজয়ের সামনে ধরলো।

বিজয় একটি ঢাল ও একখানি তলোয়ার তুলে নিলে।

যুবরাজ তাড়াতাড়ি বললেন—আজ তোমার শরীরটা ভালো নেই, মনটাও বড় অশান্ত। আজ থাক না বিজয়, আরেকদিন না হয়…

রতন বাধা দিয়ে বললো—তা হয় না মহাকুমার, সুযোগ বারবার আসে না। বহুদিন অপেক্ষা করে আজ এই সুযোগ পেয়েছি, এই সুযোগ আমি ত্যাগ করতে পারি না।

এক লাফে রথ থেকে নেমে পড়ে মৃদু হেসে বিজয় বললো—আমরা ক্ষত্রিয় মহাকুমার, দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বানকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, সৈনিকের ধর্ম তা নয় !

তারপর ঢাল তলোয়ার বাগিয়ে ধরে বললো—আমি প্রস্তুত, রতন।

—উত্তম, আমিও প্রস্তুত—বলে রতন ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো।

পরমুহূর্তে বিজয় ও রতন পরস্পরের সম্মুখীন হোল। ধারালো তলোয়ারে চাঁদের আলো ঝক্‌মক্ করে উঠলো, বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল তলোয়ারের গায়। অসিতে অসি খন খন করে উঠলো, ঠক্ ঠক্ করে ঢালের উপর ধারালো ইস্পাতের আঘাত প্রতিহত হতে লাগলো। দ্রুত ক্ষিপ্র চঞ্চল তরবারি পরস্পরকে বিপর্যস্ত করে তুললো। কিন্তু কেউ কারুর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারলো না। জয়শ্রী ও নরেন্দ্রপাল নিঃশ্বাস রোধ করে দাঁড়িয়ে রইল, রতনের তলোয়ারের প্রতি ঝলকে তাদের চোখে আশঙ্কা জাগছে, বুক কেঁপে উঠছে।

কয়েকটি দুরন্ত ঘাত-প্রতিঘাতের পর যোদ্ধা দু'জন পরস্পর থেকে তফাতে সরে গেল। তারপর বৃত্তাকারে ঘুরতে সুরু করলো পরস্পরের চোখের পানে

তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে। প্রতিদ্বন্দ্বীর এতটুকু ত্রুটি দেখলে তখনই আক্রমণ করবে, আঘাত করবে সেই ত্রুটির সুযোগে।

অসিযুদ্ধের আরম্ভেই প্রতিপক্ষের ত্রুটি পাওয়া বড় কঠিন। তার উপর ভালো অসিযোদ্ধা হলে তো কথাই নেই! সেক্ষেত্রে যে আগে বিপক্ষকে অবসন্ন করতে পারবে, তার জয় সুনিশ্চিত। রতন জানে বিজয় তার চেয়ে ঢের বেশী কৌশলী, সমগ্র বারেন্দ্রভূমিতে তার অসি-যুদ্ধের খ্যাতি আছে। সেই বিজয়কে সে যে দ্বন্দ্বে আহ্বান করার সাহস পেয়েছে সে শুধু তার ক্লান্তির সুযোগ পেয়ে। গুপ্তচরের মুখে সে খবর পেয়েছে, ক'দিন ধরে বিজয়ের দেহ মন ভালো নেই, বিজয়কে আঘাত করতে হলে এই অবসাদের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। সেই জন্য বিজয়কে নিঃশ্বাস ফেলার মত যথেষ্ট অবসর রতন দিলে না, বৃত্ত সংক্ষেপ করে তখনই সে আবার বিজয়কে আক্রমণ করলো।

বিজয়শ্রীহরির সমকক্ষ অসি-নৈপুণ্য তখনকার বাংলায় আর কারুর ছিল না। তলোয়ার ধরেই নিজের দুর্বলতার কথা সে বুঝতে পারলো, সেই জন্য আক্রমণ করার চেয়ে আত্মরক্ষা করার দিকেই সজাগ হোল বেশী। অনিয়ম ও দুশ্চিন্তায় তার দেহে পূর্বের দৃঢ়তা ছিল না সত্য, তাহলেও রতনের আঘাত সে প্রতিরোধ করছিল স্বচ্ছন্দে। রতনের তলোয়ার ডাইনে-বাঁয়ে, উপরে-নীচে, সামনে কেবলই বাধা পেতে লাগলো।

শান্ত প্রকৃতির বুকে দুটি হিংস্র মানুষের আস্ফালন।

সহসা কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে বিজয়ের উষ্ণীষ উড়ে গেল, সামান্য এক-চুলের জন্য রতনের অসির অগ্রভাগ তার মাথা স্পর্শ করতে পরলো না। বিজয় চকিতে এক পা পিছিয়ে গেল, সে বুঝতে পারলো যে, শুধু প্রতিরোধ করলেই হবে না প্রতি-আক্রমণও করতে হবে সমভাবে, নাহলে বিপক্ষ আঘাতে আঘাতে তাকে বিব্রত করে তুলবে।

বিজয় এবার রতনকে প্রতি-আক্রমণ করলো। উপরে-নীচে ডাইনে-বাঁয়ে বিজয়ের তলোয়ার ক্ষিপ্রবেগে বারবার এসে পড়লো রতনের ঢাল-তলোয়ারের উপর।

আঘাতের পর আঘাত দিতে দিতে এক একবার দু'জনে পিছিয়ে আসে, তারপর আবার পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, অসিতে অসিতে আগুনের ফুলকি ওঠে—ঠনাঠন্।

অতো সতর্কতার মধ্যেও রতনের অসি এক সময় বিজয়ের ঢালের নীচে এমন ভাবে বেধে গেল যে, হাত বাঁচাতে হলে ঢাল ছাড়তে হবে। বাধ্য হয়ে বিজয় ঢাল ছেড়ে দিল। রতনের তলোয়ারের চাপে ঢালখানি উৎক্ষিপ্ত হয়ে শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে হাত ক'য় দূরে ছিটকে গিয়ে পড়লো। রতনের মুখে এবার হাসি ফুঠে উঠলো, স্পর্ধার ক্রুর হাসি। ঢালহীন বিজয়কে আঘাত করা সহজ হবে ভেবে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো, বিজয়ের উপর এবার আক্রমণ চালালো পূর্ণোদ্যমে।

ঢালহীন বিজয়কে এবার তলোয়ার দিয়েই তলোয়ারের প্রতিটি আঘাত রুখতে হোল। সে দেখলো রতনকে যতটা অসিদক্ষ বলে সে জানতো, সম্প্রতি সে তার চেয়েও ঢের বেশী কৌশলী হয়ে উঠেছে। এখন তার নিপুণতাকে এতটুকু উপেক্ষা করলেই তার অসির আঘাতে মৃত্যুবরণ করে নিতে হবে। একজন অখ্যাত ব্রাহ্মণ যুবকের তরবারির আঘাতে মহারাজ ভীমদেবের নৌবলাধ্যক্ষ সর্দার বিজয়শ্রীহরি মৃত্যুর অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যাবে—এ যে বাংলার মাহিষ্যজাতির কপালে চিরদিনের কলঙ্কতিলক হয়ে থাকবে! যুগে যুগে বাহুবলে যারা বাংলার গৌরব রক্ষা করেছে, সেই কৈবর্ত-সন্তান চির-দুর্বল ব্রাহ্মণের অসির নীচে মাথা নোয়াবে?—কখনও না। বিজয়ের দেহের প্রতিটি পেশী শত হস্তীর শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় রতনের প্রতিটি আঘাত সে প্রতিহত করতে থাকে।

রতন কিন্তু অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বিজয়ের ঢাল যখন একবার সে হস্তচ্যুত করেছে, তখন আর ভাবনা কিসের। এখন শুধু আর এক লহমার সুযোগ, তারপরেই মহারাজ ভীমের পলাতক সেনাপতির দেহ লুটিয়ে পড়বে পথের ধূলার উপর।

ঝনাঝন করে অসি চলে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শোনা যায়। টস্ টস্ করে কপাল থেকে ঘাম ঝরে। হাতের পেশীগুলি ফুলে ফুলে ওঠে। পায়ের আঘাতে পথের ধূলা ওড়ে। সহসা কোন এক অতর্কিত মুহূর্তে রতনের তলোয়ার অনিবার্য বেগে নেমে এল বিজয়ের মাথার উপর। নরেন্দ্রপালের বুক কেঁপে উঠলো, জয়শ্রী দু'হাতে মুখ ঢাকলো।

চোখের নিমেষে একলাফে বিজয় পিছু হটে গেল, কিন্তু হাতের তলোয়ার-

খানি এমনভাবে রতনের তরবারির সঙ্গে বাধিয়ে দিলে যে কব্জিতে কব্জি জমে গেল। এখন যে আগে অসি টেনে ছাড়াতে যাবে সেই আঘাত পাবে, যার বাহুর শক্তি বেশি সেই হবে জয়ী।

উভয়েই পরস্পরকে ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, হাত কাঁপতে লাগলো থরথর করে, বাহুর পেশী স্ফীত হয়ে উঠলো, মুখে দেখা দিল উত্তেজনার রক্তিমা। বিজয় এবার আর অবসর দিলে না, সারাদেহের শক্তি কেন্দ্রীভূত করলো নিজ বাহুতে। থরথর করে রতনের সারা দেহ কেঁপে উঠলো, বিজয়ের পেষণে ধীরে ধীরে সে পিছু হটতে লাগলো। দেখতে দেখতে পথের এক গাছের গায়ে রতনের পিঠ ঠেকলো।

রতন এবার শঙ্কিত হয়ে উঠলো। বিজয়ের সেই বাহু-বন্ধন থেকে এখন অসি টেনে নেওয়া সত্যই কঠিন, কিন্তু টেনে না নিলেও তো আত্মরক্ষা করা যায় না। অথচ অসি মুক্ত করতে গেলে আঘাত পাবার সম্ভাবনা আছে। রতন ইতস্ততঃ করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আচম্বিতে রতনকে বিচলিত করে অসির এক ঝট্‌কায় বিজয় তার হাতের তলোয়ার ছিট্‌কে ফেলে দিলে,—একটুর জন্য রতনের হাতের আঙুল কয়টি রক্ষা পেল। বেচারা রতনের চোখে এবার অসহায়ের দৃষ্টি ফুটে উঠলো। বিজয় নিজ তলোয়ারের সূচ্যাগ্রভাগ বাড়িয়ে ধরলো রতনের বুকের উপর। কি করবে রতন ঠিক করতে পারলো না, একবার মনে করলো তলোয়ারখানি কুড়িয়ে নেয়. কিন্তু বিজয়ের ধারালো দুই চোখ, আর বুকের সামনে লক্‌লকে তলোয়ারখানির পানে তাকিয়ে সে-আশা ত্যাগ করলো।

বিজয় মৃদু হেসে বললো—কি রতনরাও। তোমার দ্বন্দ্বযুদ্ধের সখ এবার মিটেছে?

—আমায় প্রাণভিক্ষা দাও বিজয়!

বিজয়ের দু'চোখ দৃপ্ত হয়ে উঠলো, বললো—কৌটিল্যের রাজনীতিতে আছে —শত্রুর শেষ রাখতে নেই, আমিও সেই নীতির বিশেষ পক্ষপাতী।

রতনের চোখদুটি বড় বড় হয়ে উঠলো, বললো—তুমি আমাকে খুন করতে চাও?

—হ্যাঁ! আজ যদি তুমি আমাকে ঠিক তোমার মত অবস্থায় পেতে তাহলে কি আমার বুকে তোলোয়ারখানা আমূল বসিয়ে দিতে না? তুমি কি

সেই জন্যই আজ আমাকে অসিযুদ্ধে আহ্বান করনি? তুমি মহৎ ব্রাহ্মণ হয়ে যা করতে পার আমি নীচ কৈবর্ত হয়ে তা পারবো না,—আমি কি এতই অপদার্থ?—বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বিজয় রতনের বুকের উপর তলোয়ার-খানি একবার কাঁপিয়ে তুললো।

রতনের মুখ এবার সত্যই পাংশু হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি ভয় ব্যাকুল হয়ে সে বলে উঠলো—না না সেনাপতি, তুমি এবারকার মত আমায় ক্ষমা কর, আমায় প্রাণভিক্ষা দাও?

—না না, তোমার মত লোককে আমি ক্ষমা করিতে পারি না, তোমার মত লোককে প্রাণ ভিক্ষা দেওয়াও পাপ।

—আমি ব্রাহ্মণ, নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি…

—আবার সেই ব্রাহ্মণ? নীচ জাতের কাছে নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইতে ব্রাহ্মণের মর্যাদা কোথাও বাধে না, রতনরাও?

রতনের মুখে এবার কথা জোগালো না, থর থর করে সে বারেক কেঁপে উঠলো। তার অসহায় মৃত্যুভীত মুখের পানে লহমা ক'য় তাকিয়ে থেকে বিজয় সহসা হাহা করে হেসে উঠলো; তারপর তলোয়ার কোষবদ্ধ করতে করতে বললো—মৃত্যুভীত নিরস্ত্র শত্রুকে আঘাত করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়, তোমায় প্রাণভিক্ষা দিলাম, তুমি যাও—

এক নিমিষে রতনের মুখের চেহারা বদলে গেল। সে আর একতিল অপেক্ষা করলো না, এক লাফে ঘোড়ায় উঠে বসলো, তারপর একটা কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত না জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। পথের ধূলার মেঘে ঘোড়া অদৃশ্য হয়ে গেল, পিছন থেকে বিজয়ের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপভরা উচ্চ হাসির রেশ রতনের কানে এসে বাজলো।

মহাকুমার নরেন্দ্রপাল ডাকলেন—বন্ধু!

বিজয় রথে উঠে বসলো।

মহাকুমার তার একখানি হাত ধরে বললেন—তুমি যে উপপুরের নৌবলাধ্যক্ষ সর্দার বিজয়শ্রীহরি, একথা তো এতদিন বলনি ভাই?

—দরকার হয়নি, রাজকুমার।

—তুমি তাহলে আমাকে বন্ধু বলে মনে কর না?

—কিন্তু বন্ধু বলে নিজের দুঃখের বোঝা বন্ধুর মাথায় তো চাপিয়ে দিতে

পারি না ভাই। তাছাড়া আজ তো আমি আর সেনাপতি নই, আজ আমি একজন সাধারণ প্রজা মাত্র, সেই জন্যই আজ আমার আত্মগোপন করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। নাহলে আমি এখানে আশ্রয় পেয়েছি জানলে রামপালের সামন্তচক্র আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে।

—ইস বিজয়দা, আপনার হাত যে অনেকখানি কেটে গেছে—জয়শ্রী তাড়াতাড়ি বিজয়ের বাঁ হাতখানি তুলে নিলে, তারপর আঁচলে রক্ত মুছে ফেলে জিজ্ঞাসা করলো—এ হাতে লাগলো কেমন করে বিজয়দা? ইস্, এতখানি কেটে গেল, আর আপনি লোকটাকে এমনি ছেড়ে দিলেন?

—যে প্রাণভিক্ষা চায়, তাকে আঘাত করতে নেই দিদি—বলে রথের এক পাশে দেহটিকে হেলিয়ে দিয়ে অবসন্নের মত বিজয় চোখ বুঁজলো।

কেউ আর কোন কথা বললো না।

অঙ্গরক্ষার বস্ত্রখণ্ড দিয়ে জয়শ্রী বিজয়ের ক্ষতস্থানে একটী পটি বেঁধে দিল।

রথ তখন আবার চলতে সুরু করেছে।

নগরের বাইরেই নিবিড় বন। পাহাড়ের কালো কালো পাথর ঢাকা পড়ে গেছে ছোট বড় নানান্ গাছের সবুজ লতাপাতায়।

সেই বনের প্রান্তে ছোট একটি সঙ্ঘারাম। ছোট হলেও মঠটি বহু প্রাচীন, লোকে বলে—মহারাজ হর্ষবর্ধনের সময় নাকি এটী তৈরী হয়েছিল। অত দিনের পুরাণো না হলেও, তার জরাজীর্ণ অবস্থা দেখলে বোঝা যায় যে, তার বয়স কম নয়। বাহিরের প্রাচীর বহু দিন হোল ভেঙে পড়ে গেছে, ভিতরটাও কবে ভেঙে পড়তো, তবে এখনও যে ক'জন ভিক্ষু এখানে বাস করে, দরকার মত তারা সংস্কার করে নেয় বলেই টিঁকে আছে। রাত্রে এখানে আলো জ্বলে না। সহসা দেখলে এখানে মানুষ আছে বলে বিশ্বাস হয় না।

রাত প্রথম প্রহর কেটে গেছ।

অন্ধকার বনপথ অতিক্রম করে এক অশ্বারোহী সেই সঙ্ঘরামের সামনে এসে থামলো। এক গাছের ডালে ঘোড়াটিকে বেঁধে সে মঠের ভিতর অগ্রসর হোল।

একপাশে একটি ঘর আর সব ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন। অশ্বারোহী সেই ঘরের দরজায় গিয়ে করাঘাত করলো, ভিতর থেকে উত্তর হোল—কে?

—আমি রতন।

দ্বার মুক্ত হোল। রতন ভিতরে প্রবেশ করলো।

ভিতরে একটি প্রদীপ জ্বলছে। দীপের সামনে কাষ্ঠাসনের উপর একখানি জীর্ণ পুঁথি। সামনে একখানি কম্বল বিছানো। দ্বার রুদ্ধ করে ভিক্ষু এসে সেই আসনে বসলেন, রতনকে বললেন—বসো!

রতন মেঝের উপরেই বসলো, ভিক্ষু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন—কতদূর কি করলে?

—আপনার উপদেশ মত যথাসময় তার রথের সম্মুখীন হলাম। প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। সর্দার আজ সত্যই ক্লান্ত হয়েছিল, গোড়া থেকেই সে আমার সঙ্গে পেরে উঠছিল না। প্রথমে সুবিধামত তাকে দু'এক ঘা আঘাত করলাম, তারপর আমার তরবারির আঘাতে তার উষ্ণীষ ছিটকে পড়লো কিন্তু অদৃষ্ট তার প্রতি সুপ্রসন্ন, চরম আঘাতের পূর্ব মুহূর্তে একটি পাথরের। টুকরোয় আমার পা পিছলে গেল।···

রতনের কথা শেষ হোল না, ভিক্ষু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো—আর সেই কথা বলতে এসেছে আমাকে? জীবনে আমি ঢের নির্লজ্জ দেখেছি কিন্তু তোমার মত অদৃষ্টের দোহাই দেয় এমন নির্লজ্জ আমি একটিও দেখিনি। তুমি কাপুরুষেরও অধম।

রতন চুপ করে রইলো।

ভিক্ষু বললো—এখন বুঝতে পারছি তোমার যোগ্যতা কোথায়! তোমার উপর এতদিন আস্থা রেখেছিলাম বলে আজ আমার অনুশোচনা হচ্ছে।

আবার দরজায় করাঘাত হোল।

এবার যিনি ভিতরে এলেন তিনিও ভিক্ষু। বয়সে তিনি প্রথম ভিক্ষুর চেয়ে কিছু বেশী প্রবীণ। সব কথা শুনে তিনি বললেন—তুমি মিছামিছি রতনকে দোষ দিচ্ছ বুদ্ধগুপ্ত। মানুষ যে একেবারও ব্যর্থ হবে না, এমন তো কোন কথা নেই!

বুদ্ধগুপ্ত বললেন—এই তো প্রথম ব্যর্থতা নয়, আরও একবার···

—সেই জন্যই তৃতীয় বারে হয়তো ও আর ব্যর্থ হবে না। গত দু'বারের অভিজ্ঞতা ওকে সাফল্য লাভে সাহায্য করবে।

—কিন্তু এদিকে আমরা যে আর অপেক্ষা করতে পারছি না সিদ্ধাচার্য, যতই আমরা দেরী করবো, ততইহরি সর্দারের শক্তি বৃদ্ধির সুবিধা হবে।

সিদ্ধাচার্য হেসে বললেন—এবং জগদ্দলে সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করতে তত বিলম্ব ঘটবে।

—তা ছাড়া—বুদ্ধগুপ্ত বললেন—এখন আমরা ব্রাহ্মণদের যে সহযোগিতা পেয়েছি, বিলম্বে হয়তো আমরা তা থেকে বঞ্চিত হতে পারি।

সিদ্ধাচার্য বললেন—সেই জন্যই আমাদের উচিত হিসাব করে অগ্রসর হওয়া। বড় বড় কাজে দু-একবার বিফল হলেই চঞ্চল হওয়া চলবে না। পরের বারে এমন ভাবে এগুতে হবে যেন আবার ব্যর্থ না হতে হয়। আমি যা বলি তাই শোন···আলোটা আগে নিভিয়ে দাও, বাইরে থেকে কেউ না লক্ষ্য করে যে আমরা এখনও জেগে আছি।

আলো নিভিয়ে তিনজনে মুখোমুখি হয়ে বসলো।

রাজ সভা।

মহারাজ ইন্দ্রপালকে ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে বসে আছেন মহামাত্য, ধর্মাধিকরণ, মহাবলাধ্যক্ষ, অক্ষ-পাটলিক, নায়ক ও মহানায়কেরা। মহারাজ নানা রকমের অভাব-অভিযোগের বিচার করছেন। এমন সময় প্রতিহারী এসে নিবেদন করলো—বারেন্দ্রভূমি থেকে এক দূত এসেছেন,—মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

মহারাজ বললেন—নিয়ে এসো।

এক গৈরিকধারী তরুণ ভিক্ষু এসে মহারাজকে প্রণাম জানালো।

বিচার শেষ করে মহারাজ ভিক্ষুর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। ভিক্ষু নিবেদন করলো—বারেন্দ্রভূমির রাজচক্রবর্তী, পরম ভট্টারক পূজ্যপাদ শ্রীরামপাল দেবের কাছ থেকে আসছি, আমি বিশেষ বার্তাবহ মাত্র।

সভার সকলে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।

মহারাজ বললেন—আপনি কি বারতা বহন করে এনেছেন নির্ভয়ে বলুন।

দূত বলতে সুরু করলো—আমাদের সম্রাট বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছেন যে, বিদ্রোহী কৈবর্ত-নায়ক ভীমরাজের নৌবলাধ্যক্ষ সর্দার বিজয়হরি পালিয়ে এসে উঠেছে আপনার আশ্রয়ে। মহারাজকুমার বীরবাহু নরেন্দ্রপাল তাকে সখা রূপে গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি আপনার নৌবলাধ্যক্ষ গোবর্ধন সর্দারের সহকর্মী হিসাবে সে রাজকার্যে নিযুক্ত। চতুর্দশ সামন্তচক্রের নায়ক বারেন্দ্রভূমির

রাজ-চক্রবর্তী পরমভট্টারক শ্রীরামপালদেব আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন —উক্ত পলাতককে অবিলম্বে শৃঙ্খলিত করে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন এবং সম্রাট রামপালদেবের সখ্যতা লাভ করে নিজ গৌরব বৃদ্ধি করুন।

মহারাজ ইন্দ্রপাল বললেন—আপনার সম্রাট ভ্রমে পড়েছেন।

দূত বললো,—মহারাজ শ্রীরামপালদেব কোন সংবাদের সত্য নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজে অগ্রসর হন না। মহাকুমার বীরবাহু নরেন্দ্রপাল ও নৌবলাধ্যক্ষ গোবর্ধন সর্দারকে জিজ্ঞাসা করলেই এই সংবাদের যথার্থতা আপনি নিরূপণ করতে পারবেন।

মহারাজ মৃদু হেসে বললেন—আপনার সম্রাটের সত্যনিষ্ঠায় আমি কোন সন্দেহ প্রকাশ করিনি। তাঁর বিচার-বুদ্ধির ভ্রম হয়েছে, সেই কথাই বলছিলাম। আশ্রিতকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করা রাজোচিত ধর্ম নয়।

দূত বললো—সামান্য একটা নীতিকে বজায় রাখতে গিয়ে রাজ্য ও প্রতিষ্ঠাকে বিপন্ন করা দূরদর্শিতার পরিচয় নয়, মহারাজ। মহারাজ শ্রীরামপাল-দেব আপনার এই ঔদ্ধত্য সহ্য করবেন না, অবলিম্বে তাঁর সামন্তচক্র আপনার রাজ্য আক্রমণ করবেন। রাজ্যহীন রাজার এক পলাতক সেনাপতিকে আশ্রয় দিয়ে অসংখ্য প্রজার জীবন বিপন্ন করা যুক্তিযুক্ত কিনা আপনি বিবেচনা করে দেখুন। তাছাড়া বারেন্দ্রভূমির রাজচক্রবর্তীর চিরশত্রুতা আপনার কাম্য কিনা তা'ও বিচার্য !

মহারাজ ইন্দ্রপালের চোখে মুখে এবার বিরক্তির আভাষ দেখা দিল, বললেন—আপনাদের মহারাজকে বলবেন যে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যাকে একবার আমি আশ্রয় দিয়েছি তাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

—বেশ, আপনি যদি তাকে আমাদের হাতে সমর্পণ করতে না চান, তাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করুন। তারপর যা করা প্রয়োজন আমরাই করবো।

রাগে মহারাজের মুখ এবার কালো হয়ে উঠলো, শান্ত গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন—আমরা পাহাড়ী জাত, রাজনীতির ওসব কূটকৌশল আমরা বুঝি না। যে মহাকুমারের জীবন রক্ষা করেছে, জেনে শুনে তাকে আমি মরণের মুখে ঠেলে দিতে পারবো না।

—তাহলে পরমভট্টারক সম্রাট শ্রীরামপালদেবের সঙ্গে আপনার বিরোধ

অনিবার্য। এই বিরোধের অর্থ বাংলার পরাক্রান্ত সামন্তচক্রের শত্রুতা আহ্বান করা। চতুর্দশ সামন্ত এক যোগে চারি পাশ থেকে আপনাকে আক্রমণ করবেন। তখনকার অবস্থাটা একবার ভালো করে বিচার করে দেখলে ভাল হোত মহারাজ।

—অনেক বিচার করেই আমি তোমার উত্তর দিয়েছি—বলে মহারাজ ইন্দ্রপাল আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সভা ভাঙলো।

মহামাত্য এতক্ষণ ইতস্ততঃ করছিলেন। এমন গুরুতর একটি বিষয়ে এতো শীঘ্র সিদ্ধান্ত করা তাঁর রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এতক্ষণ তিনি কোন কথা বলার সুযোগ পাননি। এখন দূতকে একান্তে পেয়ে তিনি বললেন—তুমি দু'দিন থেকে যাও, আমরা ইতিমধ্যে মহারাজের সঙ্গে বিষয়টি আর একবার আলোচনা করে দেখি।

দূত হৃষ্টচিত্তে সম্মতি জানালো।

মহাকুমার, বিজয়শ্রীহরি ও গোবর্ধন সর্দারের মধ্যে দু'একটা কি কথা হোল, তারপর তারা তিনজনে এসে দাঁড়ালো দূতের কাছে। গোবর্ধন সর্দার বললো,—ভিক্ষু, তুমি সত্যই মহারাজ শ্রীরামপালদেবের দূত? তোমার কাছে মহারাজের কোন বিচিহ্ন আছে, দেখাও দেখি।

বজ্রাহতের মত দূত থমকে দাঁড়ালো, সহসা তার মুখে কোন কথা জোগালো না।

গোবর্ধন সর্দার বললেন—কই, দেখাও বিচিহ্ন?

দূতের মুখের কথা জড়িয়ে গেল, অস্ফুট-স্বরে সে যে কি বললো তা মোটেই বোঝা গেল না, তবে সে যে বিশেষ বিচলিত হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

গোবর্ধন বললো—রাজ সকাশে মিথ্যা পরিচয় দেওয়া এবং একাধিক রাজ-পুরুষকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকার অপরাধে আমি তোমাকে বন্দী করলাম, রতনরাও।

মহামাত্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন—তুমি ভুল করনি ত গোবর্ধন সর্দার?

—প্রয়োজন হলে আমি এখনই প্রমাণ দিতে পারি মহামাত্য!

গোবর্ধন এগিয়ে এসে রতনের হাত ধরলো, রতন এতটুকু বাধা দিলনা,

তার মুখখানি তখন ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দু-তিন বার কথা বলার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই উচ্চারণ করতে পারলো না। নির্যাতনের শঙ্কায় তার সারা দেহ কেঁপে উঠলো।

নিষ্ক্রান্তমান সভাসদেরা কৌতূহলে থমকে দাঁড়ালো তার চারিপাশে।

সঙ্ঘারামের মন্দির মধ্যে আচার্য বুদ্ধগুপ্ত ধর্মসূত্র আবৃত্তি করছিলেন—

অসতো মা সদ্ গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যো র্মা অমৃতং গময় !

[অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। অন্ধকারের মাঝে আমাকে আলোর পথ দেখাও। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে অমৃতের অমর-লোকের সন্ধান দাও—জগদীশ্বর, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।]

কোন এক সময় সিদ্ধাচার্য এসে ভিতরে প্রবেশ করলেন, বললেন—তোমার সব প্রার্থনাই ব্যর্থ হোল আচার্য, জগদ্দলের নতুন সঙ্ঘারামে মহাস্থবির হওয়া আর তোমার অদৃষ্টে ঘটে উঠলো না, বুদ্ধগুপ্ত।

বুদ্ধগুপ্ত মুখ তুলে তাকালো।

সিদ্ধাচার্য বললেন—তোমাদের সব কূট-কৌশল ধরা পড়ে গেছে। গোবর্ধন সর্দার রতনকে বন্দী করে মহাপ্রতিহারের হাতে সমর্পণ করেছে।

সিদ্ধাচার্য সভার ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত করলেন।

বুদ্ধগুপ্ত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মুণ্ডিত শীর্ষে বার কয় হাত বুলালো তারপর বললো—তাইত, এখন কি করা বিধেয় ?

—আবার নতুন করে সব সুরু করতে হবে ?

—তাইত !

—আমার কি মনে হয় জান ? আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সবচেয়ে বড় বাধা গোবর্ধন সর্দার। সব কিছুর মূলে ওই একটি লোক, এখানে বিজয়-হরির এতো প্রতিপত্তির কারণও সে। কাল রতনকে সে-ই পাকড়াও করেছে। কোন রকমে ওকে সরিয়ে দিতে পারলেই আমাদের ব্যাপারটা আরও সহজসাধ্য হোত।

—এর আগেও রতন একবার সে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয় নি

—তার জন্য কি? আরেকবার চেষ্টা করে দেখ, ভগবান শাক্যসিংহ ভরসা!

ইতিমধ্যে বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সিদ্ধাচার্য গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করতে সুরু করলেন—

যে ধর্মা হেতু প্রভবা হেতুস্তেষাং তথাগতো।

হ্যবদৎ তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবং বাদী মহাশ্রমণঃ॥

নদীর উপর প্রাসাদের গাঙ্‌দুয়ারী ঘাট। মহারাজ ইন্দ্রপাল স্নান শেষ করে সবেমাত্র উঠেছেন, তখনও সূর্যোদয় হয়নি, এমন সময় পিছনে পদশব্দ শোনা গেল। সামনের গাছপালাগুলির আড়াল থেকে দেখা গেল একটি লোক আসছে। মহারাজের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠলো। এই সময়টুকু তিনি একান্ত নির্জনে উপভোগ করতে ভালবাসেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই যে লোকটি সামনে এলো সে বিজয়শ্রীহরি। মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বললো—প্রভু, সর্বনাশ হয়ে গেছে। নদীতটে নৌবলাধ্যক্ষ গোবর্ধন সর্দার নিহত হয়েছেন।

—বল কী!

মহারাজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বিজয়শ্রীহরি সংক্ষেপে যা বললো: রাত্রিশেষে দু'জনে স্নান করতে গেছেন। স্নান শেষে গোবর্ধন সর্দার তটে উঠেছেন, বিজয় তখন জলে। তখনও ভালো করে উষার আলো ফুটে উঠেনি। সহসা পিছনে একটা আর্তনাদ শুনে বিজয়-শ্রীহরি চমকে উঠলো, দেখলো—একটি তীর গোবর্ধনের পিঠে এসে বিঁধেছে, তিনি মাটিতে পড়ে ছটফট্ করছেন। বিজয় তখনই জল থেকে উঠে এল, দেখলো দূরে গেরুয়া-পরা কে-একটা লোক ছুটে পালিয়ে গেল। তখনই আততায়ীর অনুসরণ না করে, সে আগে গোবর্ধন সর্দারের সেবায় নিযুক্ত হোল। কিন্তু গোবর্ধন সর্দারের মুখে একটু জল দিতে না দিতেই তিনি স্থির হয়ে গেলেন। তীরটা সম্ভবতঃ বিষ-মাখানো ছিল।

মহারাজ কিছুক্ষণ অভিভূতের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো বিজয়ের হাত ধরে তিনি প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন।

প্রাসাদ অলিন্দে মহাপ্রতিহার অপেক্ষা করছিলেন, বললেন—প্রভু, সর্বনাশ হয়েছে, কালকের সেই রতনভিক্ষু কারাগার থেকে পালিয়ে গেছে। দু'জন

সান্ত্রী খুন হয়েছে তার হাতে।

মহারাজ সহসা কোন উত্তর দিলেন না। অলিন্দে বার কয় অস্থিরভাবে পদচারণা করলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—বনের মাঝে যে সঙ্ঘারাম আছে, সেখানে এখন কে কে থাকে?

—আচার্য বুদ্ধগুপ্ত, আর জনকয় ভিক্ষু।

—ওদের সকলকে বন্দী করে এখনই সভায় নিয়ে এসো।

মহাপ্রতিহার তখনই বেরিয়ে পড়লেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজ আদেশ প্রচারিত হোল—নগরমধ্যে মুণ্ডিত-শীর্ষ গৈরিকধারী সন্ন্যাসী দেখলেই বন্দী কর!

গাঙদুয়ারী ঘাটে সিঁড়ির উপর বিজয় বসেছিল, মনটা তার বড়ই শোকাচ্ছন্ন। এই অল্প ক'দিনে গোবর্ধন সর্দারকে সে একান্ত আপনার করে পেয়েছিল। তাই তার আকস্মিক মৃত্যুতে শুধু যে সে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হারালো তা নয়, তার ভবিষ্যৎও মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। যা কিছু করবে বলে সে ভেবেছিল, তা ওই একটি লোকের মৃত্যুতে ম্লান হয়ে উঠলো। সেই দুঃখের বেদনাই তার মনে মুখর হয়ে উঠছে। একা একা নির্জনে বসে থাকতে তার ভালো লাগছিল।

মহাকুমার এসে তার পাশে বসলেন, বললেন—বন্ধু, কি ভাবছ?

বিজয়ের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো, বললেন—ভাবছি!

—কি ভাবছ, কী?

—ভাবছি আমার জীবনের ব্যর্থতা। যেখানে এতটুকু আলোর শিখা দেখেছি অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তখনই তা স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে। যে আমাকে এতটুকু সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে বিধাতার ভ্রূকুটিতে সে-ই মৃত্যুর অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

—কিন্তু এবার আর তা হবে না বন্ধু, এবার আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

—আমার মত অভাগাকে সাহায্য করলে আপনাকেও হয়তো অনেক দুর্ভোগ সইতে হবে মহাকুমার।

—তুমিই তো বলেছ বন্ধু, আমাদেরই মত পাহাড়ী জাত দু'বার ভারতের

ইতিহাসকে নতুন দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, দেখা যাক না আরেকবার তা সম্ভব হয় কি না।

—সত্যি বন্ধু, পারবে!—বলে বিজয় নরেন্দ্রের একখানি হাত চেপে ধরলো। ধীরে ধীরে হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে মহাকুমার বললেন—গাও না বন্ধু, সেই গান তোমার মুখ থেকে বার বার শুনতে ইচ্ছা করে।

—কিন্তু আজ বোধহয় ভালো জমবে না ভাই, আজ আমার মনটা…

—আজকেই ভালো জমবে বন্ধু, মনের দুঃখে সংগীতই তো সবচেয়ে ভালো-সান্ত্বনা ভাই।

—বেশ, গাইছি—বলে খানিকক্ষণ বিজয় গুনগুন করে সুর ভাঁজলো, তারপর মৃদুকণ্ঠে সুরু করলো: ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ জমে উঠেছে, দিগ্বিজয়ী সেকেন্দারের বাহিনী ধীরে ধীরে হিন্দুস্থানকে গ্রাস করছে, মগধের অত্যাচারী সম্রাট উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে ডুবে আছেন। পরাজিত চন্দ্রগুপ্ত পালিয়ে গেছেন ছদ্মবেশে। শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতে গ্রীক্ বাহিনীর সম্মুখীন হবার মত আর কেউ নেই।

এই দুর্যোগের দিনে কে ভারতভূমিকে রক্ষা করবে? হিন্দুস্থানের রাহুগ্রস্ত চন্দ্রকে মুক্ত করবে কে? ওই দেখ অরণ্যের প্রান্ত থেকে এগিয়ে এসেছে এক তরুণ রাজকুমার। অর্ধসভ্য পার্বত্য জাতি বলে যাদেরকে চিরদিন অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, তাদেরই চোখে ভেসে উঠেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন। শত সহস্র তীরন্দাজ নিয়ে সে এগিয়ে এলো। নন্দবংশের উচ্ছেদ করে চন্দ্রগুপ্তকে বসিয়ে দিলে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে। তার দুর্ধর্ষ বাহিনীর সামনে পঞ্চনদ, গান্ধার, উত্তরকুরু ও কিরাতভূমির গ্রীক্‌বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো। তার হাত ধরে উত্তরের হিমাচল থেকে দক্ষিণের মহাসমুদ্র পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত এক সূত্রে গেঁথে ফেললেন। কে বলে পার্বত্যজাতি অসভ্য, কে বলে তারা স্বার্থপর, কে বলে তারা আর্যদের চেয়ে হিন্দুস্থানের কথা কম ভাবে, কে বলে তাদের দেশপ্রেম কম?…

ওই দেখ হূনেরা ভারতের নগর ও প্রান্তর পঙ্গপালের মত ছেয়ে ফেলেছে, তোরামানা ও মিহিরকুলের দুর্জয়বাহিনীর সামনে বিপুল গুপ্তসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মগধের সে গৌরব-সূর্য বুঝি চিরদিনের মতই অস্তমিত। প্রতিষ্ঠান দুর্গে অশীতিপর বৃদ্ধ কুমারগুপ্ত সম্মুখ সমরে আত্মাহুতি দিয়েও মগধের

শেষ গৌরবটুকু রক্ষা করতে পারলেন না। কদাকার বর্বর হূনদের অত্যাচারে সমগ্র উত্তরাপথ আজ ম্লান, শঙ্কাতুর। মন্দির লুন্ঠিত, সঙ্ঘারাম ভস্মীভূত, জনপদ পরিত্যক্ত। কে আজ ওই বাহিনীর সম্মুখীন হবে? কে ওই বর্বর দলকে বিতাড়ন করে ভারতের আকাশকে আবার মেঘমুক্ত করবে?

ওই দেখ মধ্যভারতের পার্বত্য ভূমিতে এক তরুণ যুবক মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আর্যাবর্তের শত শত রাজা যেখানে পরাজয় মেনেছে, এক পর্বতবাসী যুবক সেখানে অসি ধরলো। মুষ্টিমেয় পাহাড়ী সেনার কৌশলে দিগ্বিজয়ী হূনবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, মিহিরকুল মৃত্যু বরণ করলেন। সমগ্র উত্তরাপথ আবার স্বাধীনতার গৌরবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হিন্দুস্থানের জনগণ রাজচক্রবর্তীর জয়মাল্য পরিয়ে দিল সেই পাহাড়ী যুবকের গলায়। কে বলে পার্বত্যজাতি হেয়, কে বলে তারা শূদ্র, কে বলে তারা অনার্য?.........

কে জানে আবার কবে ভারতের এই পুণ্যভূমিতে নিদ্রিত শূদ্র শক্তি জেগে উঠবে? আজকের এই খণ্ড, ছিন্ন, দুর্গত ভারতকে কে আবার সংস্কারমুক্ত করবে? কারা আবার জানিয়ে দেবে—জাতি বড় নয়, মানুষ বড়; ধর্ম বড় নয়, সভ্যতা বড়। কোন্ পাহাড়ী উপত্যকা থেকে নেমে আসবে সেই মানুষ, নতুন দিনের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে—ভারতের পুণ্যভূমিকে নতুন করে গড়ে তুলবে,—সত্য ও প্রেমের বাণী নিয়ে আসবে, কিন্তু কবে?

বিজয়হরির ভাষার ঝঙ্কার থামলো।

দেখা গেল মহাকুমারের চোখদুটি জল জল করছে।

মহারাজ ইন্দ্রপাল ভাবনায় পড়লেন।

গোবর্ধন সর্দারের শূন্যপদে কাকে নিয়োগ করা হবে—এই সমস্যা। নৌসেনা আছে দশ হাজার, কিন্তু তা পরিচালনা করার মত যোগ্য ও অভিজ্ঞ নায়ক চাই। যদি রামপালদেব সত্যই কোনদিন রাজ্য আক্রমণ করেন তখন তাঁর সম্মুখীন হবার মত বিচক্ষণতা কার আছে?

মহামাত্য ও মহাবলাধ্যক্ষের সঙ্গে মহারাজ পরামর্শ করছেন, পাশে আছে মহাকুমার বীরবাহু নরেন্দ্রপাল।

মহাবলাধ্যক্ষ একে একে নাম করে যাচ্ছেন আর মহারাজ তাদের

—স্বার্থ যখন বড় হয়ে দেখা দেয় তখন মানুষ কোন যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা দোষগুণের বিচার করছেন।

মহাবলাধ্যক্ষ বললেন—বিরাট সেন?

মহারাজ বললেন—যোদ্ধা ভালো, কিন্তু কৌশলী নয়। কি ভাবে সৈন্য চালনা করলে শত্রুকে আঘাত করা যায়, সেদিকে মাথা ঘামায় না।

—বিজয়কুমার?

—কূটবুদ্ধি বেশী। শত্রুর সম্মুখীন হবার মত দৃঢ়তা কম।

—রুদ্রনায়ক?

—অত্যন্ত রূঢ়। অধীনস্থ সেনাদের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করে যে, তারা বিরক্ত হয়।

—রঘুনন্দন?

—বড় অহংকারী। কোনদিনই কারুর যুক্তি গ্রহণ করতে চায় না। তার বিশ্বাস দেহের শক্তি ও শাণিত তলোয়ার সব যুক্তি তর্কের উপরে।

—তাহলে উপস্থিত আর তো তেমন কাউকে দেখছি না মহারাজ।

মহারাজ বললেন—তাইত ভাবছি।

মহামাত্য বললেন—তাইত···

মহাকুমার এতক্ষণ শুনছিলেন, এবার সহসা বলে উঠলেন—মহারাজ, বিজয়শ্রীহরিকে নিয়োগ করলে কেমন হয়?

সেনাপতি বললেন—বিজয়শ্রীহরি?

মহামাত্য বললেন—বিজয়শ্রীহরি?

নামটি সকলের কাছেই অপ্রত্যাশিত।

মহাকুমার বললেন—কেন মহারাজ, বিজয়শ্রীহরি কৈবর্তরাজ ভীমের নৌবলাধ্যক্ষ ছিল। বারেন্দ্রভূমির নৌ-সেনা তো বড় কম ছিল না?

কথাটি মহাবলাধ্যক্ষের মনের মত হোল না, বললেন—কিন্তু অতো সৈন্য থেকেও সে তো আজ পলাতক, তার যোগ্যতার পরিচয় কোথায়?

—প্রজারা বিশ্বাসঘাতকতা করলে কেউ পারে না, মহাবলাধ্যক্ষ।

—কিন্তু অজানা অচেনা কাউকে একেবারে মাথার উপর বসিয়ে দিলে অধস্তন নায়কেরা বিদ্রোহ করতে পারে মহাকুমার।

—আমাদেরই অন্নে পালিত হয়ে আমাদেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে?

রাখে না মহাকুমার।

—তেমন লোক যারা আছে অবিলম্বে তাদের বিদায় করুন।

—তাদেরকে কর্মচ্যুত করলে একদল বিদ্রোহীর সৃষ্টি হবে, লাভের চেয়ে তাতে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশী। একজনের জন্য বহুজনকে অসন্তুষ্ট করা কি ঠিক হবে?

মহাকুমারের ভ্রূদুটি কুঁচকে উঠলো। ক' লহমা তিনি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—বেশ, তাহলে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হোক, যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে যে হবে সবার সেরা তাকেই নিয়োগ করা হবে।

মহারাজ এবার যেন অকূলে কূল খুঁজে পেলেন, বললেন—এটি নেহাৎ মন্দ কথা নয়, আপনি কি বলেন মহামাত্য?

মন্ত্রী মশাই মাথা নেড়ে বললেন,—ঠিক, এই প্রস্তাবই সবচেয়ে সমীচীন।

সেদিনকার সভায় মহারাজ ইন্দ্রপালদেব সেই কথাই বললেন,—একাধিক নৌবাট-নায়ক সম-পদে নিযুক্ত রয়েছেন, একজনের পদোন্নতি হলে আর পাঁচ জনের মনে ক্ষোভ জাগতে পারে, সেইজন্য বিশেষ বিচার ও বিবেচনা করে নৌবলাধ্যক্ষের শূন্যপদের জন্য আমি প্রতিযোগিতায় আহ্বান করছি, প্রতিযোগীদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবেন, তাকেই আমি স্বর্গতঃ গোবর্ধন সর্দারের শূন্য পদে নিয়োগ করবো। এবং এই প্রতিযোগিতায় যে কোন লোক নির্বিচারে অংশ গ্রহন করতে পারেন। এই বিষয়ে আপনাদের মধ্যে কারুর কিছু বলার থাকলে, নির্ভয়ে বলতে পারেন।

উপনায়কদের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো—প্রভু, কি কি বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, তাই জানার জন্য আমরা প্রত্যেকেই বিশেষ উৎসুক হয়ে আছি।

মহারাজ বললেন—যে কোন বিষয়ে,—অসিচালনা, লক্ষ্যভেদ, নৌচালনা—যিনি যা পছন্দ করেন।

উপনায়কেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো, তারপর একজন আবার জিজ্ঞাসা করলো—প্রভু, শুধু আমাদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা হবে না বাইরের লোকও থাকিবে?

মহারাজ বললেন—যিনি ইচ্ছা করবেন তিনিই যোগ দিতে পারবেন, কোন বিচার-বিভেদ করা হবে না

উপনায়কেরা অবার নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন তুললো। মহামাত্য আশ্বাস দিয়ে বললেন—তোমাদের ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই, এখনও দু'দিন সময় আছে, তৃতীয় দিনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগে নাম দিলেও চলবে।

তখনকার মত গুঞ্জন থামলো, মহারাজ সভার কাজ সুরু করলেন।

খবরটা কেমন করে যেন জানাজানি হয়ে গেল: এই প্রতিযোগিতার মূলে আছেন মহাকুমার আর তাঁর নূতন-পাওয়া বন্ধু বিজয়শ্রীহরি। এদের দু'জনকে সুখী করার জন্যই মহারাজ এই প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন।

আরো শোনা গেল: এই বিজয়শ্রীহরিই হচ্ছেন বারেন্দ্রভূমির ভীমরাজের নৌবাট-অধ্যক্ষ শ্রীহরি বর্মা। ভীমরাজের পরাজয়ের পর তিনি এখানে পালিয়ে এসেছেন। সম্প্রতি মহাকুমারের প্রাণরক্ষা করেছেন। মহাকুমার তাঁকেই গোবর্ধন সর্দারের পদে মনোনীত ক'রেছেন। তারই সঙ্গে প্রত্যেককে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। হরি বর্মার মত কৌশলী নৌ-নায়ক গৌড়বঙ্গে আর একজনও নেই।

সকলেরই মুখ ম্লান হয়ে গেল।

দু'দিনের মধ্যে কেউই বিজয়শ্রীহরির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলো না।

তথাপি বিজয়শ্রীহরির নিয়োগের সময় মহাবলাধ্যক্ষ আপত্তি তুললেন, বললেন—প্রভু, একজন অপরিচিতকে আপনি একেবারে সবার উপর তুলে ধরেছেন, এতো কম বয়স, আমাদের নায়কেরা যদি ওর প্রভুত্ব না মানতে চায়?

—প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে না, প্রভুত্বও মানবে না, তাহলে তারা পদত্যাগ করুক। আমার সেনাদলকে যদি যোগ্যতম লোকের নায়কত্বে রাখি, তাহলে ওদের বলার কিছু নেই।

সেনাপতি আর কোন কথা বলতে পারলেন না।

বিজয়শ্রীহরি বর্মা অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে নৌবলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন।

ক'দিনের মধ্যেই খবর এল: সুন্দরগিরির প্রজারা বিদ্রোহ করেছে।

মহাকুমার বললেন—শুনেছ?

বিজয় বললো—শুনেছি, প্রভু।

—কেন তারা 'রাজষষ্ঠ' বন্ধ করেছে জান?

—জানি, তারা আমার নিয়োগে আপত্তি জানিয়েছে।

—তারা চায় দ্বিতীয় নায়ক বিরাটসেনকে নিযুক্ত করতে, অন্যথা তারা সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে বলে শোনা যাচ্ছে।

তাও আমি শুনেছি।

—তুমি তাদের দমন করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাও?

—মহারাজ আমাকে যেমন নির্দেশ দেবেন, আমি তাই করবো।

—মহারাজ নির্দেশ না দিলে তুমি কিছু করবে না? ধর, যদি মহারাজ কোন আদেশ না দেন।

—তাহলে আমি নিজেই একবার সুন্দরগিরি যাব।

—কবে?

—যদি অনুমতি করেন, তো আজই। এসব ব্যাপারে অকারণ কালক্ষেপ করতে নেই।

—কত সৈন্য নিয়ে যাবে?

—একজনও নয়।

—একা?

—হ্যাঁ!

—তুমি জান এই বিদ্রোহের নায়ক বিরাটসেন এখন সেখানেই আছে। প্রত্যক্ষ কোন অংশ না নিলেও তারই ইঙ্গিতে এই আগুন জ্বলেছে। একা পেলে সে তোমাকে কৌশলে বন্দী করে গোপনে হত্যা করবে।

বিজয় হাসলো, বললো—আমি হলাম প্রধান নৌবলাধ্যক্ষ, বুদ্ধির যুদ্ধে আমি যদি দ্বিতীয় নায়কের কাছে পরাজিত হই, তাহলে তার চেয়ে উচ্চপদে থাকার যোগ্যতা আমার কই?

—কিন্তু সেখানে তাদের দলবল আছে, আর তুমি গিয়ে পড়বে একা।

—সেজন্য কিছু যায় আসে না। যারা সেখানে আছে, তারা অনেকেই আমার অধীনস্থ সেনা। তাদেরকে পরিচালনা করার দায়িত্ব আপনারা আমার উপরেই ন্যস্ত করেছেন। তাদের চালনা করার বুদ্ধিটুকু আমার আছে কিনা তা আমায় পরখ করে দেখতে হবে, নাহলে তাদের নেতৃত্ব করা আমার পক্ষে উচিৎ হবে না।

—তাহলেও তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে না বন্ধু।

—গেলে আমি একাই যাব মহাকুমার, এবং আজ রাত্রেই যাব।

সুন্দরগিরি উপত্যকায় সাড়া পড়ে গেছে।

ক'দিন ধরে প্রবল বৃষ্টি নেমেছে, দু-পাশের পাহাড়ের গা বয়ে জল নেমে এসে চারিপাশ ভাসিয়ে দিয়েছে, ক্ষেত-খামার সব ডুবে গেছে, অন্নকষ্টের আশঙ্কায় প্রজাদের মুখ মলিন।

এই অঞ্চলে অনেক দিনের পুরাণো এক ভৈরবী মন্দির আছে। সেখানে সম্প্রতি এক সন্ন্যাসী এসেছেন। সন্ন্যাসী তান্ত্রিক। তাঁর দীর্ঘ জটা দেখলে শ্রদ্ধা জাগে, কপালে রক্ত-চন্দনের পানে তাকালে ভয় হয়। তিনি সব দেখে-শুনে বলেছেন,—রাজার পাপে প্রজার এই দুঃখ। এ শুধু অনর্থের সূচনা মাত্র, আরো অনেক বাকী আছে—অন্নকষ্ট, যুদ্ধবিগ্রহ, রোগ, শোক, এসবও আসন্ন।

শোনা গেল: ইনি পাথরের প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারেন—প্রতিমা মানুষের মত কথা বলেন। কৈবর্তরাজ ভীমের কথামত ইনি চলনবিলের ক্ষ্যাপা-কালীকে জাগিয়েছিলেন। যা যা বলেছিলেন, তাই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। রামপালদেব এঁরই উপদেশমত সামন্তচক্র গড়ে তোলেন। তাঁর সব কিছু সাফল্যের মূলে নাকি এই সন্ন্যাসীটি। তাছাড়া পাটলিপুত্রে, কনৌজে···ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রজারা দলে দলে গিয়ে তাঁকে ধরে পড়লো—আমাদের একটা কিছু উপায় করুন ঠাকুর, নাহলে আমরা ধনে-পুত্রে মারা যাই।

সন্ন্যাসী প্রথমে ঘাড় পাতেননি, শেষে বিরাটসেনের অনুরোধে তিনি সম্মত হলেন,—অমাবস্যার রাত্রে মা ভৈরবীকে জাগাবেন প্রজাদের মঙ্গল-কামনায়।

দেখতে দেখতে সত্যই একদিন অমাবস্যা এসে পড়লো, চারিপাশ থেকে শত শত প্রজা এসে জড়ো হোল মন্দির প্রাঙ্গণে। সামনের খোলা মাঠে যতদুর দৃষ্টি চলে কাতারে কাতারে শুধু মানুষের মাথাই দেখা গেল। সকলেরই অন্তরে কৌতূহল, চোখেমুখে ঔৎসুক্য।

এদিকে দণ্ডের পর দণ্ড এগিয়ে চলেছে, প্রহরের পর প্রহর যাচ্ছে গড়িয়ে।, চারিপাশ শান্ত স্তব্ধ। গাছের পাতাগুলো ঝির-ঝির করে কেঁপে উঠছে। এক আকাশ তারা জ্বলছে মিটমিট করে। সাগরের ঢেউয়ের মত সারি সারি পাহাড়ের ছায়া মিলিয়ে গেছে দূরে—হারিয়ে গেছে আকাশের গায়।

অমাবস্যার রাত। এই মাত্র শিয়ালের ডাক জানিয়ে দিলে রাত দু'প্রহর

কেটে গেছে। উৎকণ্ঠিত জনতা আকাশের দিক থেকে মুখ ফেরালো মন্দিরের পানে। ভিতরের কিছুই দেখা যায় না, ধূপ-ধূনার ধোঁয়ার পিছন থেকে দীপালোকের মৃদু আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। চারিপাশ নিস্তব্ধ নিঝুম। মানুষগুলোও কথা বলতে ভুলে গেছে যেন। অমাবস্যার অন্ধকার সবাইকার বুকে চেপে বসেছে বুঝি।

সহসা সেই অন্ধকারের মাঝে চারিপাশের স্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে মন্দির মধ্যে সন্ন্যাসীর গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠ গম্ গম্ করে উঠলো, সকলেই স্তব্ধ অভিভূতের মত শুনলো:

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

সন্ন্যাসীর ছায়া এসে দাঁড়ালো মন্দিরের দ্বারে, ভাবের আতিশয্যে তখনও তাঁর কণ্ঠ থর-থর করে কাঁপছে, তিনি আবৃত্তি করছেন:

ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবী ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা স্থিতিরূপা চ পালনে
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতি
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥

[দেবী, তুমি এই জগৎ সৃষ্টি করেছ, পালন করছ, ধ্বংস করছ। সৃষ্টিকালে তুমিই এই জগতের মা, পালন কালে তুমিই এর পালয়িত্রী, সংহার কালে তুমিই সংহার স্বরূপা। তুমিই মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি, মহাদেবী ও মহাসুরী। তোমাকে প্রণাম করি !

মন্দিরের মৃদু আলোকিত পীতাভ ধূমেলতার মধ্যে কিসের যেন চলমান আভাস দেখা গেল। ক্রমশঃ দেখা গেল সন্ন্যাসীর সামনে শুভ্র এক দেবী-মূর্তি। মন্দিরের প্রস্তরময়ী প্রতিমা যেন প্রাণময়ী হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সমবেত জনতা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। অনেকে দু'চোখ ভাল করে মার্জনা করে নিলে,—কিন্তু এতো মিথ্যা নয়, সত্যই তে দেবী এসে দাঁড়িয়েছেন। সকলের মনে রোমাঞ্চ জাগলো।

সন্ন্যাসী চীৎকার করে উঠলেন—মা, মা, মা !

দেবীপ্রতিমা ধীর স্থির।

সন্ন্যাসী এবার দেবীর চরণে আছড়ে পড়লেন, আকুল কণ্ঠে ডাকলেন—মা, মা, মা!

দেবীর ঠোঁট দু'খানি এবার কেঁপে উঠলো, হাত তুলে তিনি অভয় জানালেন। মনে হলো যেন মৃদু মিষ্ট স্বর শোনা গেল—জয়স্তু!

সমবেত জনতা আর স্থির থাকতে পারলো না, আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি তুললো—মা, মা, মা!

সন্ন্যাসী আর মাটি থেকে উঠলেন না, বললেন—আমাদের এই দুর্গতি কেন মা, তোমার চরণে আমরা কি অপরাধ করেছি—কি দোষে আমাদের এই শাস্তি দিলি মা?

সেই ধূমেলতার মাঝে দেবী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

জনতা আবার চীৎকার করে উঠলো— মা মা!

এবার দেবী মুখ তুললেন, ঠোঁট দু'খানি কেঁপে উঠলো, মিষ্ট মধুর স্বর ভেসে এলো দৈববাণীর মত: বৎস! রাজার পাপে রাজ্যে অশান্তি ঘটে, ক্ষুদ্র শক্তি যখন ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণকে অবহেলা দেখায়, তখন তার পতন অবশ্যম্ভাবী। এই রাজ্যেও সেই পাপ প্রকাশ পেয়েছে। ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণের অভিশাপে এই রাজ্য রোগ, শোক, শস্যহানি ও অন্নকষ্টে বিপর্যস্ত হবে।

দেবী থামলেন।

জনতা ভয়ে ভক্তিতে রোমাঞ্চদেহে আভূমি প্রণতঃ হোল। তারপর মাথা তুলে দেখে দেবী মন্দির-মধ্যে অদৃশ্য হয়েছেন।

সন্ন্যাসী কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো—মা! মা!! আমাদের কি হবে মা? আমরা কি করবো?

জনতা প্রতিধ্বনি তুললো—মা! মা!

ধূমাচ্ছন্ন গর্ভগৃহের ভেতর থেকে এবার দেবীর সাড়া পাওয়া গেল: যদি শান্তি চাও—মঙ্গল চাও তাহলে রাজ-অনুজ্ঞাই শিরোধার্য কর না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর। বিজয়শ্রীহরিকে তাড়িয়ে দাও, ভিক্ষুদের মুক্তি দাও, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর!

সন্ন্যাসী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, চীৎকার করে উঠলেন: বিদ্রোহ কর,—দেবীর আদেশ!

সেই স্বরের প্রতিধ্বনি মহাব্যোমে মিলিয়ে যাবার আগেই মন্দিরের পিছনে শাদা ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘ সুঠাম এক যুবকের ছায়া দেখা গেল, উদাত্ত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন—বিদ্রোহের প্রয়োজন নেই বন্ধুগণ. বিজয়শ্রীহরি তোমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমরা আমাকে যে শাস্তি দেবে, তাই আমি মাথা পেতে নেব. কিন্তু তার আগে আমি কি অপরাধ করেছি—তাই আমাকে বলে দাও।

সকলেই চমকে উঠলো, ভূত দেখলেও বুঝি মানুষ অমন চমকায় না।

সন্ন্যাসী উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলেন—দুর্বিনীত অনাচারী! তুই সঙ্ঘারাম কলুষিত করেছিস, মৃত্যুই তোর যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত!

বিজয়শ্রীহরি দৃঢ় কণ্ঠে বললো—মিথ্যা অপবাদে দেবীমন্দির নররক্তে কলুষিত করতে চাও, এই নাও আমার তরবারি, (কোষ থেকে তলোয়ার মুক্ত করে বাড়িয়ে ধরলো) কে চাও আমাকে খুন করতে, এগিয়ে এসো! শুধু এই কথাটি স্মরণ রেখো, আমি তোমাদেরই একজন। মানুষের মাঝে মানুষের মত বাঁচতে চেয়েছিলাম বলে জগন্মাতার মন্দির প্রাঙ্গণে তোমরা আমাকে হত্যা করছ। এগিয়ে এসো, এই নাও তলোয়ার।

জনতা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লো; কি করবে ঠিক করতে পারলো না।

জনতার এই জড়তা সন্ন্যাসী সইতে পারলো না, তার চাঞ্চল্য উত্তেজনায় ফেটে পড়লো, চীৎকার করে উঠলো—এখনও তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ? দেবীর আদেশ পালন কর!

—দেবীর আদেশ! —বিজয়শ্রীহরি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—কোথায় দেবী? পাথরের প্রতিমা কখনও কথা বলতে পারে? যে কথা বললো সে দেবী নয়, মানুষ—সাধারণ তোমার আমার মতই মানুষ। ওই সন্ন্যাসী তোমাদের ভুল বুঝিয়েছে। আমার কথায় সন্দেহ হয়, ওই মন্দিরের মধ্যে যাও দেখতে পাবে যাকে তোমরা দেবী বলে মনে করেছ, সে অতি সাধারণ এক মানবী ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রাহ্মণ আজ নিজ অধিকার ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, তোমাদের প্রবঞ্চিত করছে। মনে রেখো, আমরা হলাম ছোট জাত—ওই ব্রাহ্মণেরা নিজেদেরই লেখা খানকয় পুঁথির দোহাই দিয়ে আমাদের ছোট করে রেখেছে,—আমাদের দেবতাকে পূজা করার অধিকার আমাদের নেই, আমাদের ধর্মের বই আমাদের পাঠ করা নিষিদ্ধ, আমাদের সঙ্গে খেলে ব্রাহ্মণের

জাত যায়, আমাদের স্পর্শ করলে তাদেরকে স্নান করে শুদ্ধ হতে হয়। হিন্দু হয়েও আমরা হিন্দুর অধিকার থেকে বঞ্চিত, মানুষ হয়েও আমরা মানুষের মর্যাদা পাই না। আমরা সেই অধিকার, সেই মর্যাদা দাবী করেছি বলেই তোমাদেরকে উত্তেজিত করা হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য। রাত্রির অন্ধকারে এক ধূমেল আবছায়ার মধ্যে এক মেয়েকে দাঁড় করিয়ে তোমাদেরকে দেবী দেখানো হচ্ছে, আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে···

—মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা—সন্ন্যাসী চীৎকার করে উঠলো—শুধু কথার চাতুরি দিয়ে তুমি সবাইকে ভোলাতে চাও হরি সর্দার। কিন্তু তোমার পাপে, তোমার অনাচারে সুন্দরগিরির হাজার হাজার প্রজা অনাহারে মরবে কেন? দেবী জানিয়েছেন···

—আবার সেই দেবী!—বিজয়শ্রীহরি বাধা দিয়ে বললো—একটা মশাল পেলে এখনই আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারি,—এই মন্দিরের মধ্যে থেকে জীবন্ত দেবীকে আমি এখনই বাইরে নিয়ে আসতে পারি তোমাদের সকলের চোখের সামনে।

বিজয়শ্রীহরি সেই অন্ধকারেই মন্দিরের ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়ালো, সন্ন্যাসী আর স্থির থাকতে পারলো না, ছুটে এসে বিজয়ের হাত থেকে তলোয়ারখানি কেড়ে নিলে, তারপরে তলোয়ারখানি বাড়িয়ে ধরলো বিজয়ের বক্ষ লক্ষ্য করে।

আঘাত পেয়ে বিজয়শ্রীহরি তখনই ঘুরে পড়তো, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আর একখানি তলোয়ারের আচম্বিত আঘাতে সন্ন্যাসীর তলোয়ার লক্ষ্যভ্রষ্ট হোল। সকলে দেখলো সেই নবাগত তলোয়ারধারী আর কেউ নন্, স্বয়ং মহাকুমার বীরবাহু নরেন্দ্রপাল। মুহূর্তমধ্যে সন্ন্যাসী তলোয়ার ফেলে দিয়ে ছুটে মন্দিরের মধ্যে আত্মগোপন করলো।

কিন্তু তখনই মহাকুমারের অনুচরেরা তাকে ধরে ফেললো। তার মুখের উপর মশালের আলো ধরে বিজয় বললো—এই দেখ তোমাদের সন্ন্যাসী, ইনিই মন্ত্রের জোরে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই বলে এক টানে বিজয়হরি সন্ন্যাসীর দাড়ী ও মাথার জটা খুলে ফেললো, শঙ্কা ও অপমানে ছদ্মবেশ-মুক্ত রতনের মাথা ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে।

ইতিমধ্যে মন্দিরের ভিতর থেকে একটি মেয়েকেও তারা ধরে আনলো।

হাসতে হাসতে বিজয়শ্রীহরি বললো—আর যে দেবীকে ইনি জাগিয়েছিলেন এই দেখ সেই দেবী।

মেয়েটি লজ্জায় মুখের উপর অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছিল, বিজয়হরি, প্রায় জোর করেই সেটা খুলে দিলে। সকলে দেখলে—দেবী প্রতিমার মতই সুন্দর তার মুখখানি! খানিকক্ষণ জনতা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর ক্রমশ সব ব্যাপারটার আসল রূপ তাদের মানসচক্ষে প্রতিভাত হ'য়ে উঠলো, দেবতার নামে এমন প্রতারণার ষড়যন্ত্র! উত্তেজনায় জনতা চীৎকার করে উঠলো—মার, মার,—মেরে শেষ করে দাও, দেবতার নামে এই লুকোচুরি!

জনতা এগিয়ে আসছিল, বিজয় তাড়াতাড়ি বললো—না, না, তোমরা এদের গায়ে হাত তুলো না। রাজার সভায় এঁদের বিচার হবে। আমি শুধু তোমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলাম—দেখিয়ে দিলাম ধর্মের নামে তোমরা কিভাবে প্রতারিত হচ্ছ—শুধু একবারই নয়, প্রতিবারেই।

তারপর বন্দী দু'জনকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে, তারাও নিজ নিজ ঘোড়ায় উঠে বসলো।

এখন আর ত্বরা নেই, আস্তে আস্তে তারা যাচ্ছিল। চলতে চলতে কোন এক সময় বিজয়শ্রীহরি পিছনে তাকালো। মেয়েটির ঘোড়ার রাশ ধরে আছে একজন পার্শ্বচর। কি ভেবে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বিজয় তার কাছে এল, বললো—দেবী, তুমিও শেষে এই হীন ষড়যন্ত্রে যোগ দিলে। আমি কখনও ভাবিনি তুমি কোনদিন এত নীচে নামবে।

দেবী শুধু একবার মুখ তুলে তাকালো, তারপর মাথা নত করলো; কোন জবাব দিতে পারলো না।

বিজয় বললো—ছেলেবেলায় রাজবাড়ীতে পাশাপাশি বসে যখন নারায়ণ ভট্টের গল্প শুনতাম, তখন বার বার তোমার মুখের পানে তাকিয়ে মনে হোত, তুমিই বুঝি রূপকথার সেই রাজকন্যে। তখন ভাবিনি কোনদিন কোন পাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারে, তোমাকে বড় বিশ্বাস করতাম দেবী। আর এরই মধ্যে তুমি এত নীচে নেমে এসেছ যে, দেবতার নামে……

দেবী কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল ঠিক, সেই মুহূর্তে আচম্বিতে কোথা থেকে একটি বল্লম এসে বিঁধলো বিজয়ের কাঁধে, বিজয় ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি ঘোড়ার গলা ধরে

সামলে নিলে।

অনুচরেরা ছুটে এলো। বল্লমটি বাঁ-কাঁধ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল, টেনে বের করতে একটু সময় নিল। ইতিমধ্যে অত্যধিক রক্তস্রাবে বিজয় শ্রান্ত হয়ে পড়লো, পাথরকুচির পাতা আর দূর্বা দিয়ে তখনকার মত তাড়াতাড়ি একটি পটি বেঁধে দেওয়া হোল। তারপর গাছের ডাল-পাতা কেটে ক'জনে মিলে একটি ডুলি তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আর ক'জন বেরিয়ে পড়লো আততায়ীর সন্ধানে।

বিজয়শ্রীহরির মাথাটা দেবী কখন কোলের উপর তুলে নিয়েছিল, ব্যস্ততার মধ্যে কেউ তখন কোন আপত্তিই তোলেনি। তার মুখের পানে তাকিয়ে বিজয়শ্রীহরি ম্লান হেসে বললো—তোমার আদেশই এবার সার্থক হোল দেবী, তবে কোথায় যেন একটু ভুল হয়ে গেছে, বল্লমটা বুকে না বিঁধে কাঁধে এসে বিঁধেছে, তাই না ?

দেবী সে কথার কোন জবাব দিতে পারলো না।

মহাকুমারের চোখে ব্যাপারটা ভালো ঠেকলো না, বিরক্তির সুরে দেবীকে বললেন—একি ! তুমি······

দেবী সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো।

বিজয় বললো—খুন করার আদেশ করেছে বলে কি সেবা করার অধিকারটুকুও আর নেই ? ওটা যে মেয়েদের জন্মগত অধিকার।

মহাকুমার বললেন—তা হোক তবু···

বিজয় বললো—না না, আর ভয় নেই, অনেকদিনের জানা-শুনা······

কথাটা মহাকুমারের মনোমত হোল না, দেবীর পানে এমন চোখে তাকালেন যেন পারেন তো তাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দেন।

মৃদু কম্পিত কণ্ঠে এবার দেবী বললো—তোমার কথা আমি মোটে জানতাম না বিজয়দা, তুমি আমায় বিশ্বাস কর।

—আমি জানি দেবী।

—তুমি আমায় ক্ষমা কর।

—বলবার আগেই তো করেছি।

দেবী আর কিছু বললো না, দু' ফোঁটা চোখের জল পড়লো বিজয়ের কপালের উপর।

তারপর কয়েকটি দিন কেটে গেছে।

ছোট পার্বত্য রাজ্যের ইতিহাসে সেই দিনগুলি ভুলে যাবার মত নয়।

বারেন্দ্রভূমিতে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রামপালদেবের সামন্তচক্র দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে, বাংলা ও বাংলার বাইরের দিকে চলেছে তাদের অভিযান—মিথিলা, দ্বারবঙ্গ, চম্পারণ্য, উড়িষ্যা প্রভৃতি জয় করে কামরূপের দিকে তাদের দৃষ্টি পড়লো। সামন্তচক্রের অন্যতম নায়ক 'নদ্রাবলের বিজয়সেন এই পার্বত্য রাজ্যটী আক্রমণ করলেন।

বিজয়শ্রীহরির অসুস্থতা ও অধস্তন নৌবলাধ্যক্ষদের কুটিলতার জন্য উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে কয়েকটি নৌযুদ্ধে পর পর ইন্দ্রপালদেবে পরাজয় ঘটলে। বিজয়সেনের বিজয়ী সেনা দুর্বার বেগে গিরি-কান্তার অতিক্রম করে এসে রাজধানী অবরোধ করলো।

যে পথে তারা এলো, সেখানে গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হয়ে গেল, শস্যক্ষেত্রে এক মুঠো ছাই ছাড়া আর কিছুই রইল না। শঙ্কাতুর নর-নারীর দল প্রাণের-মায়ায় বাড়ী-ঘর ছাড়লো, যে যেদিকে পারলো পালালো, কতক-বা এসে পড়লো রাজধানীতে।

মহারাজ ইন্দ্রপাল কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না,—যুদ্ধ না সন্ধি ?

প্রবীন মহামাত্য অপ্রসন্নমুখে বললেন—আমি আর নতুন কথা কি বলবো ? ওই একটি লোকের জন্যই যখন এতো, তখন ওকে বিদায় করে দিলেই তো সব চুকে যায়।

মহাকুমার তাড়াতড়ি বললেন—কিন্তু রাজ্যের সম্মান ?

মহামাত্য দপ করে বল্লেন—সবলের কাছে দুর্বলের আবার সম্মান কি ?

—কিন্তু ওকে তো আমরা আশ্রয় দিয়েছি।

—তার জন্য কি ? রাজনীতির সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আত্মরক্ষা, রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপালন, এই তিনের জন্য সব কিছু করা চলে।

ব্যপারটা যে এতদূর গড়িয়েছে বিজয়শ্রীহরি তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। মহাকুমার প্রায়ই আসেন কিন্তু তাঁর ব্যবহারে কোন দিন কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ

পায়নি। সেদিন হঠাৎ বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে একটা কলরব ভেসে এলো, জয়শ্রী পাশেই বসেছিলো, বিজয় জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকালো তার মুখের পানে, বললো—ও কিসের গোলমাল দিদি ?

রাজকুমারী চঞ্চল হয়ে উঠলো, তাড়তাড়ি বললো—তুমি বসো বিজয়দা, আমি দেখে আসি।

সে অলিন্দের দিকে গেল।

এদিকে কলরব উত্তর-উত্তর বেড়েই চললো, বিজয়শ্রীহরি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলো না, একেবারে সুস্থ সবল না হলেও, চলা-বলায় কোন অক্ষমতা তার ছিল না, জয়শ্রীর পিছু পিছু সেও অলিন্দে এসে দাঁড়ালো।

নীচে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এক দল প্রজা এসে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ তারা কলরব করছিল, এবার বিজয়শ্রীহরিকে দেখে তারা চীৎকার করে উঠলো—ওই যে ! ওই—ওই !

তারপরেই শোনা গেল—তাড়িয়ে দাও ! ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও ! ওর জন্যই আজ আমাদের এতো দুঃখ—আমাদের বাড়ী-ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আমাদের খেত-খামার আজ খা খা করছে। ওকে বিদায় কর !

মহাকুমার কোন এক সময়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার বিজয়ের কাঁধে একখানি হাত রেখে বললেন—এখানে আর দাঁড়ায় না বিজয়, চলো। তুমি এখনও ভাল করে সুস্থ হতে পারনি, এতো উত্তেজনা তোমার সইবে না।

—কিন্তু এরা এসব কি বলছে, ভালো তো বুঝতে পারছি না ?

—সে কথা পরে শুনো, এখন ভিতরে চলো—

—এদের সব অভিযোগ তো আমারই বিরুদ্ধে ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমি এখনই সব শুনবো,—এখনই !

—চলো, ভিতরে চলো সব বলছি।

—না, আপনি এখনই বলুন।

অগত্যা মহাকুমারকে সংক্ষেপে বলতে হোল, বিজয়সেনের আক্রমণ

ও রাজধানী অবরোধের কথা।

ধীরভাবে সব শুনে বিজয়শ্রীহরি বললো—এতদিন আপনি একথা আমায় জনান নি কেন ?

—তুমি অসুস্থ ছিলে·· দুর্বল···

—আমি হচ্ছি :এর উপলক্ষ, আমার জন্যই এতো, অথচ আমিই এতদিন কিছু শুনিনি—বলে অলিন্দের পুরোভাগে এসে উত্তেজিত জনতাকে সম্বোধন করে বিজয় বললো—এই ক'দিন আমি বিছানায় পড়ে ছিলাম, এতো কাণ্ড ঘটে গেছে আমি কিছুই জানিনে, এইমাত্র সব শুনলাম। যাক্ সে কথা, তোমরা উত্তেজিত হয়ো না। আমার একার জন্য তোমাদেব মত অসংখ্য লোককে আমি মরণের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। এখনই এর ব্যবস্থা করছি।

জনতার মধ্যে দু-পাঁচজন প্রতিবাদ তুললো—ব্যবস্থা কিছু করতে হবে না, তুমি এখান থেকে বিদায় হলেই সব ঠিক্ হয়ে যাবে।

ম্লান হাসি ফুটে উঠলো বিজয়ের মুখে, বললো—আমি আজই এখান থেকে চলে যাব !

জনতা চীৎকার করে উঠলো—আজ নয়, এখনই !

—বেশ এখনই !

বিজয়শ্রীহরি বারেক মহাকুমার ও জয়শ্রীর মুখের পানে তাকালো—চললাম—বলে মৃদু হেসে নীচে নামবার জন্য পা বাড়ালো, মহাকুমার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—কোথায় যাবে ?

—কোথায় যাব !—বিজয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, যে হাসি হেসে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছিলেন, যে হাসি শ্রীচৈতন্যকে সংসার ভুলিয়েছিল,—এ সেই হাসি।

জয়শ্রী ডাকলো—বিজয়দা !

বিজয়শ্রীহরি আরেকবার শুধু হাসিমুখে পিছনপানে তাকালো, তারপর নীচে নেমে এল জনতার সামনে। যে জনতা এতক্ষণ এই মানুষটীর বিরুদ্ধে এতো চীৎকার করছিল এখন তাকেই নিজেদের মাঝে পেয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। ধীর পদক্ষেপে তাদের ভিতর দিয়ে বিজয়শ্রীহরি অগ্রসর হোল, জনতা সসম্ভ্রমে পথ করে দিল। ভীড় পার হয়ে বিজয়শ্রীহরি এসে দাঁড়ালো নদীর কিনারায়। নীল নাওখানি জলের বুকে টলমল করছিল, বিজয়

ডাকলো—দয়াল !

দয়াল নৌকা তীরে ভিড়ালো, বিজয় উঠে বসলো। তখনই একটা পাল তুলে দিয়ে দয়াল হাল ধরলো। বাতাসের ভরে হেলে-দুলে নৌকা এগিয়ে চললো স্রোত ঠেলে। মুখ ফেরালে সে দেখতে পেতো মহাকুমার ও জয়শ্রী স্তব্ধ হয়ে প্রাসাদ অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে তারই পানে তাকিয়ে, তাদের চোখ জলে ভরে উঠেছে। কিন্তু বিজয়শ্রীহরি সেদিকে আর তাকালো না।

দু'পাশে সারি সারি পাহাড়। মানুষের অত্যাচারে নরম মাটি বুঝি কঠিন পাষাণ হয়ে গেছে, রুদ্ধ আক্রোশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, মেঘকে স্পর্শ করে মানুষের পথ রোধ করতে চায়, কিন্তু মানুষের গতিকে বাঁধতে পারে না। অমন দুর্বল যে নদী সেও ছল্ ছল্ করে উপহাসের উচ্ছলতায় দু'পাশের পাহাড়ের গায় ধাক্কা দিয়ে বহে যায় নিজের পথে, পঙ্গু পাষাণ শুধু অনুভব করে, নদী বহে যায়। কঠিন পাষাণের অন্তরে অক্ষম অন্তর যে কাঁদে, তা বাইরে কোথাও প্রকাশ পায় না। ওর শক্তির প্রকাশ থাকলে পৃথিবীর বুকে আজ কত কি পরিবর্তন ঘটে যেত।

গিরিশ্রেণীর পানে তাকিয়ে স্বতঃই ভীমরাজের কথাটা বিজয়শ্রীহরির মনে পড়ে। চারিপাশে এমনি পাষাণের প্রাচীর তাঁর শক্তিকেও অকর্মণ্য করেছে, রামপাল তার সামন্তচক্র নিয়ে নদীর স্রোতের মতই উচ্ছল হয়ে উঠেছে। আজ যদি ভীমরাজের শক্তি থাকতো, কারাপ্রাচীরের বাহিরে যদি আজ তাঁকে পাওয়া যেতো, তাহলে ইতিহাসের এই চাকা অতি সহজে ঘুরে যেত, একেবারে উল্টো দিকে।

এই চাকা ঘুরিয়ে দেবার দায়িত্ব বিজয়শ্রীহরির।

বিজয়শ্রীহরি উঠে বসলো, ডাকলো—দয়াল।

দয়াল হালে ছিল, সাড়া দিলে—সর্দার !

—আমরা এখন কোথায় চলেছি দয়াল ?

—ঠিক কিছু করিনি সর্দার, তবে এখনকার মত চলেছি সমতটের দিকে।

—সমতটে কেন ?

—রামপালের হাতের বহর ওদিকে এখনও পৌছায়নি, ওখানে রূপনারায়ণের এক চরে আমরা এখন কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দেব, আপনি আগে আরেকটু সেরে উঠুন, তারপর বিচার-বিবেচনা করে যা

হোক একটা কিছু করা যাবে।

—আমি তো গা ঢাকা দেব, ওদিকে মহারাজের কোন খবর জান?

—তিনি ভালই আছেন সর্দার।

—কারাগারে আবার ভাল থাকা, বেঁচে আছেন তাই বল!

দয়াল কোন উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ পরে বিজয় আবার বললে—বড় বেশী দেরী হয়ে যাচ্ছে, না দয়াল?

—তা কিছু হচ্ছে, কিন্তু আপনি কি করবেন বলুন, সবই অদৃষ্ট!

—অদৃষ্ট, তা বটে,—বলে বিজয়শ্রীহরি বিষণ্ণ হয়ে পড়লো, তার শীর্ণ মুখের পানে তাকিয়ে দয়ালের মনে হোল সর্দারের বয়স যেন বছর দশেক বেড়ে গেছে।

নৌকা চললো। মুখে কারুর কথা নেই, শুধু হাতের দাঁড়গুলো জলে পড়ছে আর উঠছে সমছন্দে, নৌকাখানি এগিয়ে চলছে জলের উপর দিয়ে।

ক্রমশঃ দিনের আলোর বুকে রাত্রির ছায়া নেমে এল, বিশ্বের চঞ্চলতার উপর লাগলো মৃত্যুর পরশ। পাহাড়ের স্পষ্ট রেখাগুলি প্রেতের ছায়ার মত ম্লান হয়ে গেল, দিগ্বলয় হারিয়ে গেল দৃষ্টি সীমান্তে। ভগবানের দোয়াত উল্টে গিয়ে পৃথিবীর শাদা কাগজখানি কালিতে কালি হয়ে গেল।

নদীর তীরে সুন্দরী নগরী রমাবতী। একটি গণ্ডগ্রামকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে রামপালদেব বারেন্দ্রভূমির রাজধানীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করছেন। নগরীর রূপসজ্জা এখনও পূর্ণ হয়নি; সম্পূর্ণমান প্রাসাদের শীর্ষগুলি একে একে মাথা তুলতে সুরু করেছে মাত্র।

নগরের কেন্দ্রে প্রাসাদের নীচে ভূগর্ভে ভয়াবহ কারাগার, কোথাও এতটুকু দৃষ্টি চলে না। দণ্ডের পর দণ্ড তীব্রতম আর্তনাদ করলেও বাইরে তার এতটুকু প্রকাশ পায় না। কঠিন পাষাণ-প্রাচীর বন্দীর চারিপাশে সমাধির স্তব্ধতা রচনা করেছে। বাইরের দিনরাত্রির আভাষটুকুও এখানে এসে পৌছায় না, ক্রমান্বয়ে চারিপাশের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে থেকে বন্দীর দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে আসে।

এই কারাগারের অন্ধকারে মহারাজ ভীম আজ বন্দী, তাঁর রাজপোষাক জীর্ণ হয়ে মাঝে মাঝে ফালি-ফালি হয়ে ঝুলে পড়েছে, কারাকক্ষের একদিক থেকে আরেকদিক পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পায়ের ধাক্কা লেগে পোষাকের ফালিগুলি দুলে দুলে উঠছে। মহারাজ বলে এখন আর তাঁকে চেনার উপায় নেই : এক মুখ দাড়ী, মাথার চুলে জট পাকিয়েছে, হাতে পায়ে ময়লার ছোপ ধরেছে। এখন রাজপোষাকের জীর্ণাবশেষটুকু বদলে ফেললেই তাঁকে পথের পাগল ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।

ভীমরাজ কারাকক্ষের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সারাক্ষণই তিনি ঘুরছেন, আজ ক'দিনই তিনি ঘুরছেন, পদচালনার বিরাম নেই। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছেন, দেয়ালে কান পেতে যেন কি শোনার চেষ্টা করছেন, তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে উঠছেন—নাঃ, ওরা কেউ আর এলো না, দুর্দিনে ওরা সব আমায় পরিত্যাগ করেছে, লোক চিনতে আমার ভুল হয়েছিল।

আবার পদচারণা সুরু হয়, আঙ্গুলের পর্ব গুণে গুণে কি যেন হিসাব করতে থাকেন, তারপর কোন এক সময়ে বলে ওঠেন,—নাঃ, আমার ভুল হয়নি, ওরা আসবেই, নাহলে আমার ব্রত উদ্‌যাপন করবে কে? বাংলাদেশের সব জাতকে আমি সম-পর্যায়ে বেঁধে দেব—বামুন কায়েত মুচি মেথর বলে কিছু থাকবে না। বামুনের ঘরে আমি বাগ্‌দীর বিয়ে দেব, কায়েতে ও কৈবর্ত্তে এক করে দেব—সারা বাংলায় শুধু একটি জাত থাকবে—বাঙ্গালী, তার স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার থাকবে না, ছোট-বড় ভেদ থাকবে না। সূর্যের আলো যেমন সবার উপর সমানভাবে এসে পড়ে, তেমনি মহারাজ ভীমের অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশে বর্ণসাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সেদিন ব্রাহ্মণের উপবীতের কোন মূল্য থাকবে না!—মনুষ্যত্বের ওজনে একগোছা সুতো বেশী ভারী বলে মনে হবে না! মনুসংহিতাখানা আবার নতুন করে লিখতে হবে, হাঃ হাঃ! ভীমরাজ থমকে দাড়ান, নিজের হাসি শুনে নিজেই যেন চমকে ওঠেন। বলেন—তাইতো, পাগল হয়ে গেলাম নাকি, এমনভাবে এখন হাসছি কেন? ওরা তো কেউ এলো না। এই কারাগার থেকে মুক্তি না পেলে তো আমি কিছুই করতে পারবো না। আচ্ছা, ওরা যদি সত্যিই কেউ না আসে, তাহলে কি আমি এইখানেই মরবো? না, না, তা আমি পারবো না, ব্রত শেষ না

করে আমি মরতে পারবো না। এই, কে আছ এখানে?—রক্ষী! সান্ত্রী!! দৌবারিক!!! যেই থাক, আমাকে একবার ছেড়ে দাও, এই কারাগারের বাইরে একবার নিয়ে চল, আমি তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবো,—হাজার স্বর্ণ, পাঁচ হাজার, দশ হাজার—যত চাও তত দেব, শুধু আমাকে একবার বাইরে নিয়ে চল!

দরজার লোহার গরাদেগুলি ধ'রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন কিন্তু বাইরে থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে দেওয়ালের এপাশে ফিরে এলেন, আবার সুরু হ'ল পদচারণা।

এইভাবেই রাত্রি শেষ হয়ে এল।

মহারাজ ভীমের চোখ অতন্দ্র, পা গতিশীল, দেহ যেন শ্রান্তি বলে সব-কিছু ভুলে গেছে।

এবার সত্যই পদশব্দ শোনা গেল, ভীমরাজ চমকে উঠলেন, ছুটে এসে দরজার গরাদেগুলি চেপে ধরলেন; উত্তেজনায় তাঁর দেহ কেঁপে উঠলো।

সঙ্কীর্ণ সুঁড়ীপথে মৃদু আলোর আভাষ দেখা দিল, তারপর সেই আলো দীপ্যমান হতে হতে দেখা দিল একটি মশাল, তার পিছনে জনকয় সান্ত্রী।

মহারাজ ভীম একদৃষ্টে তাদের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, কাউকে চিনতে পারলেন না। তারা কাছে এলে উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—বিজয়শ্রীহরি এলো না, বিজয়শ্রীহরি?

গম্ভীরস্বরে উত্তর হোল—আমরা পরম ভট্টারক মহারাজ শ্রীরামপাল-দেবের ভৃত্য!

—তোমরা বিজয়শ্রীহরির লোক নও? তোমরা আমাকে মশানে নিয়ে যেতে এসেছ? রামপালদেব তোমাদেরকে পাঠিয়েছে আমাকে বধ করার জন্য?

ভীমরাজ টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, দু'জন সান্ত্রী দু'পাশ থেকে তাঁকে ধরে ফেললো।

ভীমরাজকে নিয়ে তারা সুঁড়িপথে অগ্রসর হোল।...

বিজয়শ্রীহরি ধড়মড় করে উঠে বসলো। চারিপাশে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে ডাকলো—দয়াল! দয়াল!!

—কী, সর্দার?

—ভারী বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখলাম দয়াল। সত্যই কি তোমরা খবর

পেয়েছ মহারাজ সুস্থ আছেন ?

—নিশ্চয় সর্দার। পরশুর আগের দিন রমাবতী থেকে লোক এসেছিল, সে-ই খবর দিলে।

বিজয়শ্রীহরি চুপ করে আকাশের পানে তাকিয়ে রইল। অসংখ্য তারার পানে, পুঞ্জপুঞ্জ ছায়াপথের পানে সে কিসের যেন নির্দেশ খুঁজে পাবার চেষ্টা করলো তারপর বললো—হাজার পাঁচেক সৈন্য জোগাড় করতে পারিস্ দয়াল ?

—মাত্র পাঁচ হাজার লোক নিয়ে কি করবেন সর্দার ?

—এবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো। একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বো রমাবতীর উপর। মহারাজকে যদি কোন রকমে একবার বের করে আনতে পারি। তাহলে আমাদের কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে।

—কিন্তু মাত্তর পাঁচ হাজার বরকন্দাজে কি কাজ হবে ?

—আমার তো এখন একটি কড়িও সম্বল নেই দয়াল, পাঁচ হাজার লোক যোগাড় করাই এখন আমার পক্ষে কঠিন।

—যদি বলি তার চেয়ে ঢের বেশি লোক আমরা যোগাড় করতে পারি সর্দার—মথুরা বললো—রূপনারায়ণের চরে রঘুয়া দশহাজার বরকন্দাজ তৈরী রেখেছে।

—রঘুয়া !—বিজয়শ্রীহরি বিস্ময়ে মথুরার মুখের পানে তাকালো, বললো—সে তো ডুবে মরেছে।

—ডুবে সে মরেনি, রতনের চোখে ধূলো দেবার জন্য গা ঢাকা দিয়েছিলো।

বিজয়শ্রীহরির মুখে এবার হাসি ফুটলো, বললো—বলিস্ কি ? তাহলে রঘুয়া এবার সত্যই একটা বড়-কিছু করলো বল !

—মহারাজের জন্য আমরা জীবন দিতে পারি, সর্দার !

—নিজের জীবন দেওয়া সহজ মোথ্রো, কিন্তু বড়-কিছু করা ততো সহজ কথা নয় !

রূপনারায়ণের চর। চর ঠিক নয়, নদীটা বোধহয় গতি বদলাচ্ছে। এক-দিকের তটে নূতন বিস্তার দেখা দিয়েছে, শুধু একটা ক্ষীণ জলরেখা পাশের জমি থেকে তফাৎ করে রেখেছে, তবে শীঘ্রই সেটি আসল জমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

নদীর জল ঠেলে যে জমি ওঠে তাতে সোনা ফলে, সেই জন্য আশপাশের গাঁ থেকে অনেক চাষী এখানে এসে ঘর বেঁধেছে। নূতন চরে নূতন বসতি গড়ে উঠেছে।

এই চরেরই ওদিকে রঘুয়া ন' দশ হাজার লোককে জড়োদরেছে, তারা সকলেই লাঠি চালাতে বল্লম ধরতে পাকা। যার কোথাও কিছু গলদ ছিল, রঘুয়া সেটুকু সেরে দিয়েছে।

তাদের রায়বেঁশে আর ঢালী নাচ দেখে বিজয়শ্রীহরি রঘুয়াকে জড়িয়ে ধরলো, বললো—সত্যি রঘুয়া, তোর ঋণ আমি জীবনে শুধতে পারবো না। এদের বলে দে, কাল রাত্রেই আমি বেরিয়ে পড়তে চাই।

—কাল রাত্তিরে কি সর্দার, তুমি আগে একটু সুস্থ হয়ে নাও?

—বড় বেশী দেরী হয়ে যাচ্ছে রে,···সেদিন একটা স্বপ্ন দেখলাম···

—তা হোক্, তুমি আগে দু'দশ দিন জিরিয়ে নাও। যখন এতদিন গেল তখন আর দু'দিন গেলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। ইতিমধ্যে সব নৌকা ঠিক করি।

—এবার আর নৌকা নয় রঘুয়া, এবার হাঁটাপথে যাব, সেই ব্যবস্থাই কর।

—বেশ তাই করবো, তবে কাল রাত্তিরে নয় সর্দার, দু'দিন যাক।

—বেশ!

তারপর নীচু গলায় সলা-পরামর্শ চল্‌লো। রল ও- মথুরাও সঙ্গে ছিল। রমাবতী নগরী কি ভাবে অতর্কিতে আক্রমণ করা যায়, তারই নানারকম জল্পনা-কল্পনায় চারিটি মাথা তন্ময় হয়ে গেল।

কোন এক সময়ে একটি বুড়ী তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা তারা খেয়ালই করেনি। কিছুক্ষণ তাদেরকে নিরীক্ষণ করে শেষে বুড়ীই সাড়া দিলে, বল্‌লে—বলি, ও ছেলেরা, শুনছ!

সকলেই মুখ তুল্‌লো।

বুড়ী বললে—বলি, তোমাদের মধ্যে চলন বিলের হরি সর্দার কোনটি।

—কেন?

সকলের মুখেই সন্দেহের ছায়া পড়লো।

—তার সঙ্গে আমি দুটো কথা কইতে চাই।

—কিসের কথা?

—সে কথা তোমাদের কাউকে বললে হবে না, ভীমরাজার সেই সেনাপতিকেই আমার দরকার। ওবছর কথায় ভুলিয়ে আমার দু-দুটো ছেলেকে টেনে নিয়ে গেল, বললে 'লড়ায়ে চল্ অনেক টাকা মিলবে,' কিন্তু কই তাদের একটাও তো আজ অবধি ফিরলো না। সবে-ধন নীলমণি একটা নাতি—আমার শিবরাত্রির সল্‌তে, সেটাকেও এবার ভুলিয়েছে, ওরা সব চলে গেলে আমি কি নিয়ে বাঁচবো বল্‌তে পার! সেই কথাটাই তোমাদের হরি সর্দারকে একবার জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তোমাদের সর্দার কোথায় বলত?

—আমিই সর্দার, বুড়ী!

—ওঃ তুমি! আমি মনে করেছিলাম, যার অতো নামডাক, সে না জানি কত বড় এক জোয়ান। তা বলি বাছা, এতো কম বয়সে এই খুনোখুনির ব্যবসা ধরেছ কেন?

রঘুয়া বললো—এসব যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা তুই কিছুই বুঝবি না বুড়ী, তোর কি জিজ্ঞেস করার আছে তাই বল্।

—কেন বুঝবো না শুনি?—বুড়ী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—আমার দু'দুটো ছেলে বিসর্জন দিলাম, নাতিটাকেও জলাঞ্জলি দিতে বসেছি, আর আমি কিছু বুঝি না, যত বোঝ শুধু তোমরা? আমাদের ছেলেরা বুকের রক্ত দিয়ে দেশ জয় করবে, আর তোমরা ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে বসে বসে সর্দারী করবে আর ঠোঁট উল্টে বলবে—'এসব রাজরাজড়ার ব্যাপার তোরা কিছু বুঝবি নে খালি যখন প্রাণ দেবার দরকার হবে তখন ঢাল-তলোয়ার লাঠি-সড়কি নিয়ে আসবি।' বলি, তোমরা তো রাজা হলে, আর যারা মরলো তারা কি পেল বলত? আমার অমন সোনারচাঁদ দুটো ছেলে, তোমাদের হাতে সঁপে দিলাম, বাছাদের কি হলো, কোথায় গেল সেটুকু পর্যন্ত জানতে পারলাম না, এবার নাতিটাকেও ···বুড়ী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

সহসা বুড়ী বিজয়শ্রীহরির পা দুটি জড়িয়ে ধরলো বললে—আমার নাতিটাকে ছেড়ে দে! আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, কি নিয়ে বাঁচবো বল্? কে আমার জন্য লাঙল ঠেলবে? কে আমাকে দুটো খেতে দেবে? ঘরের চালটা ছাওয়া হয়নি সর্দার, পরশুর জলে সব ভেসে গেল, আর ও ছোঁড়া কিনা দিব্যি তোদের দলে গিয়ে লাঠি ভাঁজছে। ওকে নিয়ে গেলে

সর্দার তোদের নারীহত্যার পাপ হবে…

বুড়ী অনর্গল কথা বলে যায়, কান্নার জন্য অনেক কথা বোঝা যায় না। তার চীৎকার শুনে সেখানে আরো দশ-বিশজন জড়ো হয়ে যায়, ভীড় জমে ওঠে।

বিজয়শ্রীহরি বহুবার বহু সৈন্য সংগ্রহ করেছে কিন্তু কখনও এমন বিব্রত বোধ করেনি।

একটি বুড়ো এতক্ষণ সব শুনছিল, এবার ভীড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে বললো—এতোগুলো জোয়ান ছেলেকে তুইতো নিয়ে যাচ্ছিস সর্দার, যাবার আগে তুই যদি আমাদের অবস্থাটা একবার দেখিস!

এতক্ষণ বিজয়শ্রীহরি যেন কথা খুঁজে পেলে, বললো—আমি সব জানি, সব দেখেছি। তোমাদের এই অবস্থার উন্নতি করবার জন্যই তো আমি লড়ছি।

—কিন্তু আজ পর্যন্ত তোরা তো কিছুই করতে পারলিনে সর্দার, এদিকে আমরা যে নির্বংশ হয়ে গেলাম। এর চেয়ে ছোঁড়াগুলো ঘরে থেকে লাঙ্গল ঠেললে, মাছ ধরলে, আমরা ঢের বেশী সুখে থাকতাম সর্দার! অসল কথা কি জানিস সর্দার, খুনোখুনি মারামারি করে কেউ কোনদিন কাউকে সুখী করতে পারে না। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে, তা ভুগতেই হবে, তুই তার কি করবি বল—সবই আমাদের অদৃষ্ট, কপালের লেখা কেউ কি কখনো খণ্ডাতে পারে যে তুই পারবি! নাহলে আমি বামুনের ঘরে না জন্মে বাগ্দীর ঘরে জন্মালাম কেন, বল্?

দয়াল মথুরা প্রভৃতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল, তাদের সলা-পরামর্শের মাঝে কোথাকার দুটো বুড়ো-বুড়ী এসে মূল্যবান সময়টা নষ্ট করে দেয়, এ তারা বরদাস্ত করতে পারছিল না। কিন্তু বিজয়শ্রীহরি অত সহজে বিচলিত হয় না, শান্ত স্বরে বললো—তা তুই কি করতে বলিস বুড়ো?

বুড়ো এবার উৎসাহ পেল, লাঠিটা মাটিতে ঠুকে বুকটা যতটা সম্ভব টান করে দিয়ে বললে,—তাই তো আমি বলছিলাম সর্দার, ওই সব লড়াই-দাঙ্গা ছেড়ে, এই জোয়ান ছেলেগুলোকে নিয়ে এমন কিছু কর, যাতে সত্যি আমাদের উপকার হয়।

রঘুয়া এবার সত্যই উঠে দাঁড়লো, বললো—তোরা এখন সব যা। সে যা করতে হয় আমরা ঠিক করছি। সব পালা এখান থেকে…

রঘুয়া তাদের তাড়া দিয়ে হটিয়ে দিচ্ছিল, এমন সময় ভীড়ের বাইরেটি কএ লোকের উপর তার দৃষ্টি পড়লো, জিজ্ঞাসা করলো—কোন নূতন খবর আছে নাকি রে, হরিপদ ?

হরিপদ এগিয়ে এল, বললো—সর্দার আছে ? খুব জরুরী খবর !

রঘুয়া জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো, হরিপদ এগিয়ে এসে তার কানে কানে কি বললো, শুনেই রঘুয়া চমকে উঠলো, বললো—তুই ঠিক জানিস ?

—সঠিক না জেনে আমি সর্দারের কাছে এসেছি ?

রঘুয়া তৎক্ষণাৎ হরিপদকে বিজয়শ্রীহরির সামনে নিয়ে গেল, নীচু গলায় বললো—হরিপদ বড় সাংঘাতিক সংবাদ এনেছে সর্দার। আমাদের মহারাজ নেই !

—মহারাজ নেই !—বিজয় চমকে উঠলো, মুহূর্তে তার মুখখানি পাণ্ডাশ হয়ে গেল—তুমি ঠিক জান হরিপদ, খবর সত্যি ?

—কোন ভুল নেই সর্দার।

বিজয় খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলো না তারপর জিজ্ঞাসা করলো—কবে ঘটনা ঘটেছে ?

—পরশু।

—ঠিক হয়েছে, সেই দিনই আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম। যাক ভালই হোল আমারও কাজ এবারের মত ফুরুলো। কি হবে আর লড়াই করে, কার জন্যই বা আর লড়াই করা !

বিজয় উঠে দাঁড়ালো; বুড়ো তখনও লাঠিতে ভর দিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিল, তাকেই উদ্দেশ করে বিজয় বললো—তুই ঠিক বলেছিস্ বুড়ো, কেউ কারো অদৃষ্ট কেড়ে নিতে পারে না, আমিও সে চেষ্টা আর কখনো করবো না। লড়াই আর আমি করবো না, তোদের নাতিদের ঘরে ফিরে যেতে বল্।

রঘুয়া দয়াল মথুরা সমস্বরে বলে উঠলো—বল কি সর্দার, লড়াই করবে না ?

—কার জন্য আর লড়বো বল ?

—প্রতিশোধ···

—তার আর দরকার নেই, ভাই। একজনের জন্য হাজার জনকে মেরে লাভ কি ?

হরিপদ এতক্ষণ চুপ করেছিল, এবার সে বললো—আরো খবর আছে সর্দার।

বিজয়শ্রীহরি ফিরে দাঁড়ালো।

হরিপদ বললো—বিজয়সেনের সৈন্যদের হাতে মহারাজ ইন্দ্রপাল নিহত হয়েছেন, যুবরাজ নরেন্দ্রপাল কোথায় পালিয়ে গেছেন কেউ জানে না, শত্রুরা রাজবাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল; সেই আগুনে রাজকন্যা জয়শ্রী পুড়ে মরেছেন! আর রতন রাওয়ের বোন দেবী আমার সঙ্গে এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

শেষ কথাগুলো বিজয়শ্রীহরি শুনতে পায়নি, নরেন্দ্রপাল ও জয়শ্রীর খবর তাকে বিহ্বল করে ফেলেছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দয়াল বললো—অমন করছ কেন সর্দার, একটু জল খাবে?

বিজয়শ্রীহরি এবার শুনতে পেলে, বললো—কি বলছ দয়াল, জল? বেশ দাও—

জল খেয়ে বিজয়শ্রীহরি বললো—জয়শ্রী পুড়ে মরেছে, নরেন্দ্রপাল নিরুদ্দেশ হয়েছে, তারপর হরিপদ?

হরিপদ পুনরাবৃত্তি করলো—রতন রাওয়ের বোন দেবী এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

—দেবী এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে? এখানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাওলেতে আছেন, বল্লেই নিয়ে আসি।

—না, তাকে আর আসতে হবে না, আমিই যাচ্ছি!

বিজয়শ্রীহরি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছাউনির বাইরে এসে দাঁড়ালো। সামনেই নদীর তীরে ভাওলে বাঁধা, ছইয়ের মধ্যে দেবী বসেছিল, বিজয়শ্রীহরিকে দেখে সে নৌকা থেকে নেমে এল। বিজয়শ্রীহরি বললো—তুমি এখানে কেন এলে দেবী?

—আর তো কোথাও যাবার জায়গা নেই বিজয়দা।

—কেন, রতন?

—না, তার কাছে আর যাব না।

—আমিই বা তোমায় কোথায় আশ্রয় দেব দেবী, আমার নিজেরও তো কোন নিশ্চয়তা নেই, আমি তো আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

—কোথায়? লড়াইয়ে?

—না, লড়াই আমি আর করবো না দেবী, এবার আমি যাচ্ছি নিরুদ্দেশের পথে,—অনেক দূরে, যেখানে মানুষের বসতি নেই, রক্তপাত খুনো-খুনি নেই, যেখানে কারুর দুঃখ আমাকে দেখতে হবে না, আমার জন্য কেউ রাজ্য হারাবে না, পুড়ে মরবে না, যেখানে কারুর বাপ-মা এসে সন্তানের মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করবে না,—চোখের জল ফেলবে না…

—সে কি এখানে থেকেই হোত না দাদা?

—না, আমি লোকালয়ে থাকলে আমার ছোঁয়া লেগে আগুন ধরে যাবে, আমার দুর্ভাগ্যের স্পর্শ পেলে সোনার সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

—বেশ, তুমি যেখানে যাবে আমিও সেইখানেই যাব, আমার তো যাবার জায়গা কোথাও নেই।

—বেশ, তবে তাই চল!

সত্যই যখন দেবীর হাত ধরে বিজয় বেরিয়ে পড়লো, দয়াল মথুরা প্রভৃতি নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলো না। রঘুয়া বল্‌লো—তুই কি সত্যি চল্‌লি সর্দার? তা'হলে আমরা বাঁচবো কাকে নিয়ে?

বিজয় বল্‌লো—তোরা বাঁচ্‌বি এদের সবাইকে নিয়ে, এদের সবার সেবা করার জন্য।

রঘুয়া কেঁদে ফেললো।

—আজকে আর চোখের জল ফেলিস্‌নে রঘুয়া, আজ আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে শেষবারের মত হাসিমুখে বিদায় দে!—বলে নিজেরই চোখের জল লুকাবার জন্য তাড়াতাড়ি সকলকে পিছনে ফেলে বিজয় এগিয়ে গেল।

নদীর সীমান্ত দিয়ে দুটি নিঃসম্বল যাত্রী এগিয়ে চলেছে। দিগ্বলয়ের প্রান্ত পর্যন্ত আর কোথাও জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই। শুধু গাছের পর গাছ ঘন বিন্যস্ত হয়ে অরণ্যের সৃষ্টি করেছে, অযত্ন-সঞ্জাত আগাছার দল সেই সব মহীরুহকে আশ্রয় করে দুর্ভেদ্য জঙ্গল তৈরী করেছে; যতদূর দৃষ্টি চলে সেই বনানীর শীর্ষ কালো ছায়ার মত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিগ্বলয়ের সীমায় গিয়ে মিশেছে। আরেকদিকে অনুর্বরা খরস্রোতা নদী ধূসর মরুর মত আকাশের পানে চেয়ে আছে। সেই বনানী আর নদীর সীমা ধরে পথিক দু'জন পথ চলেছে।

পথের আর শেষ নাই, এ যেন রূপকথার রাজপুত্রের তেপান্তরের পথ

চলা। পথেই পূর্বাচলের রবি অস্তাচলে ঢলে পড়ে, আকাশে রঙের খেলা জাগে, গোধূলির আলো-ছায়ার লুকোচুরি চোখে পড়ে, সময় শেষ হয় না।

দেবী বললো—আজ রাত কি এই জঙ্গলেই কাটাতে হবে দাদা ?

বিজয় বললো—তাইতো দেখছি।

—তুমি মোটেই কথা বলছ না, আমার কিন্তু কেমন যেন ভয়-ভয় করছে।

—সেই জন্যেই তো তোমায় আমি আসতে বারণ করেছিলাম দিদি।

—সে কথা থাক, কিন্তু তুমি সারাক্ষণ কি ভাবছ, বলত ?

—ভাবছি, এত বড় পৃথিবী, এতো জমি পড়ে আছে, এখানে কত শান্তিতে মানুষ তার জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, তবে তারা সামান্য এতটুকু জমির জন্য এতো রক্তপাত করে কেন, পরস্পরকে একটু শান্তি দেয় না কেন ? মানুষ কি কোনদিনই সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে না ? উঃ···

বিজয়শ্রীহরি ঘুরে পড়ে গেল, দেখা গেল একটি বল্লম তার পাঁজর ভেদ করেছে।

দেবী চমকে উঠলো, আর্তস্বরে ডাকলো—দাদা ! দাদা !

পিছনে অট্টহাসি শোনা গেল, গাছের আড়াল থেকে এক যুবক এগিয়ে এল তাদের দিকে। আব্ছা অন্ধকারে তাকে চিনতে দেবীর এতটুকু কষ্ট হোল না, বললো—রতন, তুমি ! তুমি একাজ কেন করলে রতন ?

বিজয়শ্রীহরি ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—মিছে অভিযোগ করছ দেবী, একদিন আমি প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলাম, আজ তার ঋণ শোধ হোল, কি বল রতন !

বিজয়শ্রীহরি রতনের মুখের পানে তাকিয়ে হাসলো—মৃত্যুপথযাত্রীর ম্লান বিষণ্ণ হাসি। সেই হাসি দেখে, তার রক্তাপ্লুত দেহের পানে তাকিয়ে রতনের মুখে কথা জোগালো না, সে দৃষ্টি নত করলো। দেবীর দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে গেল চোখের জলে।

ধরণীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাত্রির যবনিকা নেমে এল।

—শেষ—



[ভারতের বিস্মৃত যুগের এক ঐতিহাসিক কাহিনী]

"বাংলার ইতিহাস চাই—নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখনও মানুষের কায হয় নাই, তাহা হইতে কখনও মানুষের কায হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষরা চিরকাল দুর্বল—অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কখনও গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

উৎসর্গ ঃ

আগামী যুগে
গান্ধী-বাদের সত্য,
প্রেম ও অহিংসা যারা বিশ্বের
বুকে সার্থক করে তুলবে, বাংলার
সেই সব কিশোর-কিশোরীদের হাতে—

মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদ ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে অতি প্রাচীন কাল থেকেই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত—সেই তথ্যই এই উপন্যাসের অনুপ্রেরণ মহাস্থবির নাগসেন দিগ্বিজয়ী গ্রীক-সম্রাট্ মিনান্দারকে যেভাবে জয় করেন, তা ঐতিহাসিক গৌরব। কিন্তু সে গৌরব-কাহিনীর মূল্যবান তথ্য ভারতের ইতিহাসে আজ অন্ধকার-অবলুপ্ত। অক্ষয়কুমার মজুমদার লিখিত 'হিন্দু- হিষ্ট্রি', 'ক্যাম্ব্রিজ হিষ্ট্রি-অফ ইণ্ডিয়া', ও পালি গ্রন্থ 'মিলিন্দ-পঙ্‌হো' থেকে যে সামান্য ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করেছি, উপন্যাস লেখার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সেইজন্যই এই কাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক বলে বিচার করলে ভুল হবে—এ ইতিহাসের ইঙ্গিতমাত্র। 'উপন্যাস ইতিহাস নয়'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাটি প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করলে, আমার প্রতি সুবিচার করা হবে।

ছোটদের মাসিকপত্রিকা 'রামধনু' থেকে বইখানি পুনর্মুদ্রিত হোল। ইতি—

—লেখক

হে বীর, প্রণাম করি!

এক

মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র।

কম্বোজ (আফগানিস্থান) থেকে কুন্তল প্রদেশ (মহীশূর) পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদের শাসনকেন্দ্র পাটলিপুত্র। গঙ্গার তীরে বরাবর সাড়ে চার ক্রোশব্যাপী দীর্ঘ জনপদ। প্রশস্ত রাজপথ, শত শত অট্টালিকা, সুসজ্জিত পণ্যশালা ও সুদৃশ্য উদ্যানশোভিত মহানগরী। চারপাশে পরিখা দিয়ে নগরীকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। চার শ' হাত চওড়া, ত্রিশ হাত গভীর পরিখা, সর্বদাই জল থৈ থৈ করছে। পরিখার পিছনে উঁচু কাঠের পাঁচিল, সেই পাঁচিলের উপর থেকে চারিপাশে লক্ষ্য করার জন্য পাঁচশো সত্তরটি পর্যবেক্ষণ-তোরণ, আর শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য তীর নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে দেয়ালের গায় শত সহস্র রন্ধ্র। জনশ্রুতি আছে যে, সম্রাট অজাতশত্রু এই মহানগরীর পত্তন করেন; ভগবান তথাগত বুদ্ধ ভবিষ্যৎ বাণী করেন—'ভাবীকালে এই নগরী মহাভারতের মহানগরী রূপে বর্ধিষ্ণু হ'য়ে উঠবে, সমগ্র হিন্দুস্থানের গৌরব ও সমৃদ্ধির কেন্দ্র হবে!' শাক্যমুনির এই আশীষ বাণী যে সার্থক হয়েছিল, বহু শতাব্দী ধরে ভারতের ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সাধারণের আগমন নিষ্ক্রমণের জন্য মহানগরীর দ্বার ছিল চৌষট্টিটি। কুক্কুটারাম বিহারের পাশে গঙ্গার উপরেই যে দ্বার ছিল, তারই সামনেই এক প্রাচীন বটগাছের নীচে সেদিন বিকাল বেলা বেশ ভীড় জমেছিল। এক প্রৌঢ় বাক্‌জীবন (কথক) গল্প বলছিল, ছেলে বুড়ো সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। বলার ভঙ্গীটি চিত্তাকর্ষক। বাক্‌জীবন বলে যাচ্ছিল:

আর্যাবর্তের পশ্চিম প্রান্ত ধূলিধূসর হয়ে উঠলো, শত সহস্র অশ্বের পদশব্দ কম্বোজের পার্বত্য পথে প্রতিধ্বনি তুললো। সেকেন্দারের দুর্ধর্ষ গ্রীক বাহিনী শত শত যোজন পার্বত্য মরু অতিক্রম ক'রে ভারতের পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করলো। কিন্তু উত্তরাপথের কোথাও কোন সাড়া জাগলো না। খণ্ড

বিচ্ছিন্ন অক্ষম রাজন্যবর্গ পরস্পরের ঈর্ষা নিয়ে বিলাস করতে লাগলেন, একজন আর এক জনের বিলোপ দেখে আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করলেন, কিন্তু নিজেদেরও সর্বনাশের পথ যে প্রশস্ত হচ্ছে তা বুঝলেন না। শত শত হিন্দুর রক্তে পথ ও প্রান্তর রঞ্জিত হ'ল, বিজয়ী সেকেন্দারের জয়ধ্বনি এগিয়ে চললো—কম্বোজ (আফগানিস্থান) থেকে সৌবির (সিন্ধু), সৌবির থেকে পঞ্চনদে।

শশীগুপ্ত ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় বিভীষণের ভূমিকায় নামলো। মহারাজ পৌরব ভাগ্যদোষে পরাজিত হলেন, কর্দমাক্ত প্রান্তরে তাঁর দুর্ধর্ষ রথী সৈন্যদের রথ অচল হয়ে পড়লো। পঞ্চনদের পাঁচ শত জনপদ শ্মশান হয়ে গেল। বন্দীদের পায়ের শিকল ঘর্ষণে ঘর্ষণে রাজপথের বুকে গভীর রেখা ফুটিয়ে তুললো। কঠরাজ্য থেকে বিজয়ী গ্রীকরা সত্তর হাজার নরনারীর পায়ে শিকল পরিয়ে বন্দী করে নিয়ে চললো। অশ্বায়ন রাজ্য থেকে চল্লিশ হাজার, ক্ষুদ্রক, অম্বষ্ঠ, প্রকন্ব, মধুমন্ত, আশাকানন, হস্তিনায়ন প্রভৃতি রাজ্য থেকে আরো কত জনকে যে গ্রীকরা বন্দী করেছিল আজ আর তাঁর কোন হিসাব পাওয়া যায় না। সবাইকার মনেই ত্রাস, সকলের মনেই শঙ্কা। তবু বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় সমগ্র ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হবার কথা উঠে না. খণ্ড বিচ্ছিন্ন দুর্বল ভারত দেশদ্রোহী শশীগুপ্তের চেষ্টায় যোজনের পর যোজন যবনের পদানত হ'তে থাকে।

সেকেন্দার আশাকাননের দ্বারে এসে পৌছুলেন। বিধবা রাণী কৃপা-দেবী, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সাহায্যের চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন দিক্ থেকে সাহায্য পেলেন না। তবু বিজাতীয় বিধর্মীর অধীনতা তিনি স্বীকার করে নিতে পারলেন না, সামান্য ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, আটত্রিশ হাজার পদাতিক, ত্রিশটি হাতী ও সাত হাজার রথী সৈন্য নিয়ে তিনি সেকেন্দারের সম্মুখীন হলেন। প্রচণ্ড সংগ্রামে বহু অরাতি নিধন ক'রে কৃপা দেবী সসৈন্যে মৃত্যু বরণ করলেন, কিন্তু প্রজাপুঞ্জের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারলেন না। উল্লসিত গ্রীকবাহিনী এবার রাজধানী অশোকাবতী লুঠ করতে অগ্রসর হোল, কিন্তু রাজধানীর তোরণে এসে তারা বাধা পেল, নাগরিকেরা পুরদ্বার বন্ধ করে দিয়েছে। নগরে পুরুষ মানুষ নেই, অধিকাংশই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। পুরনারীরা কি এবার বিদেশী সৈনিকের পায়ের নীচে নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইবে? হিন্দু রমণীরা কি ধর্ম ও

মর্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়ে যবনের ক্রীতদাসী হ'য়ে ভারতভূমি ছেড়ে চলে যাবে? সম্মানের চেয়ে প্রাণের মূল্য কি বেশী ধরা হবে?

না, না, না। হিন্দুর মেয়েরা দুর্বল নয়, অশ্বের বল্গা ধরতে তারা জানে, তাদের হাতের অসিতে সূর্যরশ্মি ঝলসিত হয়। অশ্ব ও অসি নিয়ে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরে তিন হাজার পুরনারী প্রস্তুত হলেন। যাদের হাতে তাদের বাপ-ভাই, স্বামী-পুত্র নিহত হয়েছেন, আর্যাবর্তে যারা মৃত্যুর তরঙ্গ তুলেছে, তাদেরকে আঘাত করার জন্য তিন হাজার পুরনারী প্রস্তুত হলেন,—এক একজন এক একটি গ্রীককে মেরে মৃত্যু বরণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কয়েক দণ্ডেই গ্রীকরা পুরদ্বার ভেঙে নগরের মধ্যে প্রবেশ করলো। তিন হাজার পুরনারী লাফিয়ে পড়লো গ্রীক সেনার মাঝে। তাদের হাতের তলোয়ার গলিত রূপার মত ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো, শিরস্ত্রাণের সোনালি আভা গ্রীক্ সেনার চোখকে ঝলসে দিল। সেকেন্দার সুদূর গ্রীস্ থেকে পঞ্চনদ অবধি দিগ্বিজয় করে ফিরেছেন, কিন্তু কোথাও কোনদিন কোন নারী-বাহিনীর সামনে এসে তাঁকে দাঁড়াতে হয়নি। যবন সেনা বারেক স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু সংগ্রামের ক্ষেত্রে চিন্তার অবসর কোথায়? নারী-বাহিনীর অসির আঘাতে গ্রীকেরা ধরাশায়ী হতে সুরু করলো, কঠোর সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল।

নগরের পথে পথে, গৃহে গৃহে, অস্ত্রের ঝঞ্ঝণা মুখর হয়ে উঠলো। তিন হাজার হিন্দু ললনাকে জয় করতে গ্রীক্ বাহিনীর তিন প্রহর লাগলো। সেকেন্দার অশোকাবর্তী দখল করলেন, তখন সেখানে একটি মানুষেরও সাড়া নেই, সব শ্মশানের মত স্তব্ধ। সেকেন্দার ক্ষণেকের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। কত রাজ্য ও কত জাতিকে তিনি জয় করেছেন, কিন্তু স্বাধীনতাকে এতো বেশী মূল্য দিতে আর কোথাও তিনি দেখেন নি। তাঁর কপালে চিন্তার রেখা পড়লো।

বিভীষণ শশীগুপ্ত সেনাপতি সেলুকাসের সহযোগে শূন্য গৃহগুলি লুঠ করলো, সেকেন্দারকে উৎসাহ দিয়ে বললো—আরো এগিয়ে চলুন সম্রাট, সমগ্র উত্তরা-পথ আপনার পদানত হবে।

পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধি দিগ্বিজয়ী সম্রাটের লুণ্ঠন নেশাকে প্রলুব্ধ করে, শশীগুপ্ত তিল তিল করে সেই লোভকে বহ্নিমান করে তোলে। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও

ধর্মাশোক কম্বোজ কাব্রুব পঞ্চনদ অবধি যে প্রশস্ত রাজপথ অগ্রগামী করেছিলেন, শান্তি ও সমৃদ্ধি বিস্তারের জন্য সেই পথ এবার বুঝি বিদেশী শত্রুকে আমন্ত্রণ করে আনবে পাটলিপুত্রের তোরণ অবধি। কে এই দুর্ভাগ্য থেকে ভারতের পুণ্যভূমিকে মুক্ত করবে? বিভীষণ শশীগুপ্তের কু-পরামর্শ থেকে কে হিন্দুদের রক্ষা করবে? নিজের জীবন দিয়ে কে দেশকে রক্ষা করবে?

ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্র-শক্তি আজ ক্ষীণ হয়ে গেছে। উত্তরাপথের নব-দধীচি জনগণের কল্যাণ কামনায় অস্থি দান করতে প্রস্তুত হলেন। ব্রাহ্মণ আচার্য পণ্ডিত সুবন্ধু উৎকোচ দিয়ে গ্রীক্ সৈন্যকে বশীভূত করলেন। রাত্রের অন্ধকারের বস্ত্রাবাসের মধ্যে শশীগুপ্ত নিহত হ'ল, সেকেন্দারের অগ্রগমন প্রতিহত হ'ল। যবন রাজের পাশে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে কূটযুক্তি দেবার কেউ রইল না, উত্তরাপথ রক্ষা পেল।

দু'শো বছর অতীত হয় নি, আবার সেই দুর্দিন সমাগত। আবার আর এক যবনের দিগ্বিজয়ের নেশা ভারতের আকাশ-বাতাস ক্রন্দন-উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে তুলেছে। দিগ্বিজয়ী মিনান্দার তার দুর্দান্ত অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে সগদিয়ে (সমরখণ্ড) থেকে সাকেত (অযোধ্যা) অবধি আত্মবিস্তার করেছে। কিন্তু আজ সুবন্ধুর মত আচার্য নেই, চন্দ্রগুপ্তের মত বীর নেই। সমগ্র উত্তরাপথ কি সত্যই আজ নিঃশেষিত শৌর্য? হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য কি তা হ'লে আজ সত্যই অস্তমিত হবে? কে আছ তরুণ, কে আছ বীর, অগ্রগামী হও—সঙ্ঘবদ্ধ হও, আজ দেশ বিপন্ন, তোমার জাতির সঙ্কট, তোমার ধর্ম ধ্বংস পাবে, তোমার সম্মান লুপ্ত হবে। জাতির চেয়ে, ধর্মের চেয়ে, দেশের চেয়ে, বড় কিছুই নেই। সব আকর্ষণ ঠেলে ফেলে দিয়ে আজ দেশ-মাতৃকার চরণে আত্মবলি দাও—কে আছ তরুণ, তরবারি গ্রহণ কর! কে আছ তরুণী মাথার চুল দিয়ে ধনুকের ছিলা বেঁধে দাও!···

চারণ থামলেন।

এক ব্রাহ্মণ এতক্ষণ গাছের পাশে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। এবার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার পরিচয় জানতে পারি কি?

চারণ উত্তর দিল—আমি বাক-জীবন। রাজ-রাজড়ার কাহিনী শুনিয়ে বড় লোকদের খুসি করাই আমার বৃত্তি?

—তোমার নাম?

—পুষ্যমিত্র।

—এই নগরে তোমাকে নবাগত বলে মনে হচ্ছে?

—তক্ষশিলা থেকে আমি আজ প্রভাতে এখানে এসে পৌঁচেছি।

ব্রাহ্মণের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। দৃষ্টিকে ধারালো ক'রে নিয়ে পুষ্যমিত্রের মুখের পানে ভালো ক'রে নজর ক'রে বললেন—আমার যতদূর স্মরণ হয় বারো বছর আগে তক্ষশিলার রাজন্য-শিক্ষালয়ে এক যুবককে আমি রাজনীতি অধ্যাপনা করার জন্য মনোনীত করেছিলাম তার নাম ছিল আচার্য পুষ্যমিত্র।

—রাজগুরু আমার প্রণাম গ্রহণ করুন!—পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন।

—জয়স্তু! কিন্তু তোমার তো এখানে এসে প্রথমেই আমার গৃহে যাওয়া উচত ছিল।

—আপনাকে বিব্রত করার ইচ্ছা ছিল না, তা'ছাড়া আমি 'কোজাগরী-সন্ন্যাস' গ্রহণ করেছি।

—সেটি কি?

যতদিন না এদেশ থেকে যবনের অনাচার দূর হবে ততদিন আমি সন্ন্যাসীর মত ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করবো, আর দেশে দেশে, পথে পথে তরুণ-তরুণীদের আহ্বান জানাবো—'কে জেগে আছে, কার শক্তি আছে, ভারতের পুণ্যভূমি থেকে যবন-অনাচার দূর কর!'

—উত্তম! তুমি এখন আমার সঙ্গে এসো।

রাজগুরু পতঞ্জলি অগ্রগামী হ'লেন। আচার্য পুষ্যমিত্র তাঁর অনুসরণ করলেন।

প্রাসাদ তোরণ থেকে চতুর্থ প্রহরের সান্ধ্য ভেরী ঘোষিত হ'ল।

দুই

পাটলিপুত্র নগরীর বাহিরে গঙ্গাতীরে মহাত্মা পতঞ্জলির আশ্রম। গোল পাতায় ছাওয়া কয়েকটি কুটীর, খানিকটা ফুলের বাগান, খুঁটিতে বাঁধা গোটা কয়েক গরু। ঘরের ভিতরে তালপাতার পুঁথি আর মাদুর, পুস্তক পাঠের সহায়ক এক একখানি কাঠের পুস্তকধারক আর মাটির পিলসুজের উপর এক একটি মৃৎপ্রদীপ। মগধের রাজগুরুর গৃহে বিলাসের কোন সমারোহ নেই।

নানা দিক-দেশাগত ছাত্রদের কাছে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ পতঞ্জলি অধ্যাপনা করছেন। আশ্রমের একপাশে উপবনের প্রান্তে প্রাচীন এক বট গাছের নীচে বিদ্যাচর্চা চলেছে। মহাত্মা যোগদর্শন ব্যাখ্যা করছেন: 'কি ভাবে মানুষ আপনাকে উপলব্ধি করতে পারে—হেয়, হেয়-হেতু, হান ও হানোপায়: এই সংসারের দুঃখ-কষ্ট আমাদের মনকে প্রতিমুহূর্তে নিম্নগামী করছে, আমরা সত্য থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। এই দুর্বলতাকে জয় করতে হবে, বাহিরের বিষয় থেকে মনকে টেনে আনতে হবে ভিতরের পানে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত ব্যাপারই ঈশ্বরে অর্পণ করতে হবে। যখন যে কাজ করবে ফলের প্রতি লক্ষ্য না রেখে, সুখের অনুসন্ধান না করে সমস্তই সেই পরমগুরু পরমেশ্বরে সমর্পণ করবে, সকল সময় তাঁরই ধ্যান করবে।

যোগ সাধনার প্রণালী সম্পর্কে বললেন: যে ভঙ্গীতে অধিকক্ষণ স্থিরভাবে বসে থাকতে পারা যায় তার নাম আসন। সেই 'আসনে' বসে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে সংযত (প্রাণায়াম) করে চিত্তের বৃত্তিগুলিকে জয় করতে হবে। তারপর সেই চিত্তকে স্থির করতে হবে ভগবানের উপর। ক্রমে ভেদজ্ঞান লুপ্ত হবে, মনের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হবে। যোগী সৎ-চিৎ-আনন্দময় সমাধি প্রজ্ঞা লাভ করবে—জীবনের শোকদুঃখের অনুভূতি আর থাকবে না; জগতের বন্ধন নষ্ট হবে, দেহী হয়েও তিনি হবেন দেহাতীত, ভগবানে সব লীন হয়ে যাবে, সাধক উপললব্ধি করবেন—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মাঃ
কর্মণাধ্যক্ষ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ [ব্রহ্মোপনিষদ্]

শ্রুতিধর ছাত্রেরা তন্ময় হয়ে গেছে, গুরুদেবের প্রতিটি কথা তাদের মানসপটে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করে যাচ্ছে। মহাত্মা চিত্তজয়ের এক একটি মার্গ ব্যাখ্যা করছেন: 'বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্'—যখন মনের কোন বৃত্তিকে জয় করতে হবে তখন তার বিপরীত ভাবকে মনের মাঝে জাগিয়ে তুলতে হবে, তাহলেই প্রথম বৃত্তিটি দুর্বল হয়ে পড়বে, কোন ক্ষতি করতে পারবে না। চিত্তজয় করার এইটাই হ'ল প্রথম রীতি।...

পতঞ্জলি পড়াচ্ছেন। বটের জটগুলো চারিপাশ দিয়ে নেমে এসেছে।

অধ্যাপকের মাথার জটগুলি যেন তাদের নিকট-আত্মীয়। ওই বটগাছটি যেন যুগান্তের সাক্ষী, মহাত্মা তেমনি যুগান্তর-সঞ্চিত জ্ঞানের ব্যাখ্যাতা। উভয়ের মাঝেই একটা যোগসূত্র আছে। বুড়ো বটগাছের নীচে ছায়াশীতল বেদীটার উপর জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতকে মানায় ভাল।

সূর্য প্রখর হয়ে ওঠে, দিবসের প্রথম প্রহর অতীতপ্রায়; গুরুদেব পাঠ শেষ করেন। শিষ্যেরা একে একে চলে যায়। ঋষি আত্মস্থ হন। চারিপাশ স্তব্ধ, পাতার মর্মর-ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না, রোদের রুক্ষতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাখীদের কাকলিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; কয়েকটা শালিখ পাখী ঘাসের বীজগুলি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

ধীর পদক্ষেপে পুষ্যমিত্র সামনে এসে দাঁড়ালেন, পায়ের শব্দ শুনে পতঞ্জলি চোখ মেললেন, পুষ্যমিত্রের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—বল ?

—দিন কয়েক ধরে আপনার বাণীই বার বার আমার মনে হচ্ছে—'বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম !'

পতঞ্জলি হাসলেন, বললেন—তুমি গ্রীক বহ্নির সম্মুখীন হতে চাও ?

পুষ্যমিত্র বললেন—আপনি সত্যদ্রষ্টা, আপনার অন্তর্দৃষ্টির কাছে কিছুই তো লুকাবার উপায় নেই গুরুদেব !

—কিন্তু যবন সেনা বিশেষ শক্তিমান, তাদের সম্মুখীন হ'তে হ'লে যে সামর্থ্যের প্রয়োজন তা তোমার কই ? শুধু বংশগৌরব কি বিদ্যার গৌরব তো রাজনীতি-ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে অর্থ। অর্থ ছাড়া লোকবল সংগ্রহ করা যায় না। সেই সৈন্য সংগ্রহ করার মত সম্পদ আগে আহরণ কর।

—আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি গুরুদেব !

পতঞ্জলি, কোন উত্তর দিলেন না, পুষ্যমিত্রের পানে তীক্ষ্ন দৃষ্টি তুলে ধরলেন।

পুষ্যমিত্র বললেন—মিনান্দার অযোধ্যার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছে। সম্রাট বৃহদ্রথকে ভয় দেখিয়ে পত্র পাঠিয়েছে—'দু' শো' রণহস্তী, দু' হাজার ঘোড়া, দু' হাজার নর্তকী ও দশ লাখ স্বর্ণ মুদ্রা চাই, অন্যথা যবন সেনা অযোধ্যার পথে পাটলিপুত্র আক্রমণ করবে।' আমি শুনলাম, মৌর্য সম্রাট যুদ্ধ করার চেয়ে এই উপঢৌকন পাঠানই শ্রেয় বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এ সংবাদ বোধহয় আপনারও অজ্ঞাত নয় ?

—তোমার সংবাদ যথার্থ।

—সেই সম্পর্কে আপনার কাছে আমার একটি বিনীত নিবেদন আছে। আপনি আমাকে মগধ-সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।

—কোন গোপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চাও?

—আপনার কাছে বলতে কোন বাধা নেই, আমি মগধ-সম্রাটের উপঢৌকনের অনুগামী হতে চাই, গ্রীক রাজের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় করার আগ্রহ হয়েছে।

—বেশ, আজ সন্ধ্যায় তোমাকে সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব

—আপনার করুণাই আমার সম্বল গুরুদেব!

পুষ্যমিত্র পতঞ্জলির পদধূলি নিলেন, পতঞ্জলি আশীর্বাদ করিলেন—শুভমস্তু!

পতঞ্জলি চোখ বুঁজলেন, মানুষের কণ্ঠ যে স্তব্ধতা খণ্ডিত করছিল তা আবার দিগন্ত ছুঁয়ে আকাশে চড়িয়ে পড়লো। সমাহিত ঋষিকে পিছনে রেখে পুষ্যমিত্র সামনের মেঠো পথ ধরলেন। পথটি ফুলের বাগানের ভিতর দিয়ে উত্তর মুখে চলে গেছে। একটা রক্ত গোলাপের ডালে একবার দোল দিয়ে, একটা সূর্যমুখীর মাথায় একবার টোকা মেরে পুষ্যমিত্র অপরাজিতা গাচ-গুলির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাতাসের মৃদু সুগন্ধটা একবার বুকভরে গ্রহণ করে, গুণ গুণ করতে করতে তিনি অগ্রসর হলেন। গঙ্গাতীরে একটা গাছের ছায়ায় এসে বসলেন। ওদিকে পটলিপুত্রের ঘাট দেখা যায়। শাদা শাদা বিন্দুর মত অসংখ্য নৌকার পাল। নগর প্রাকারটা এত দূর থেকে শুধু রেখার মত মনে হয়। মানুষ দৃষ্টিতে আসে না। পুষ্যমিত্র সেই দিকে তাকিয়ে গুণ গুণ করে সুর ধরলেন:

সাধনা আমার গ্রীক বিতাড়ন,
মন্ত্র আমার—'অস্ত্র ধর!
বেদ বেদান্ত গীতা ছেড়ে ভাই
মাতৃভূমিকে মুক্ত কর!'

বেলা এগিয়ে যায় দ্বিপ্রহরের দিকে। মধ্যাকাশের সূর্য প্রখর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাতাস জোরালো হয়ে উঠেছে, দু'-একটা দমকা ঝাপটায় তপ্ত বালুকণা গায়ে এসে বেঁধে। এক একটা ধূলার ঝাপ্‌টা পিছনের প্রান্তর থেকে

ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার উপর দিয়ে এগিয়ে যায়, প্রভাতের স্নিগ্ধতা মধ্যাহ্নের রুক্ষতায় রূপান্তরিত হয়। গাছের ছায়াতেও পাশের উত্তাপ সংক্রামিত হ'তে সুরু করে।

পুষ্যমিত্র তখনও সেই গাছের নীচেই বসে আছেন, এক টুকরো পাথর দিয়ে মাটীর উপর কত কি লিখছেন হিজিবিজি। তাঁর মাথার মধ্যে যে চিন্তার ঝড় বইছে, বাইরে থেকে সেটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

সহসা কি যেন একটা শব্দ হ'ল পুষ্যমিত্র মুখ তুললেন। সামনে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, হাতে একটি প্রকাণ্ড গাছের ডাল, এক টুকরো কৌপীন ছাড়া আর কোন বসন নেই। শ্রমণ এগিয়ে এসে বললেন—আপনার কাছেই এলাম। সদ্-ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য উত্তরাপথের ধর্মচক্র আপনাকে মগধের মহামাত্য-পদে আসীন করতে চায়, আপনি প্রতিশ্রুতি দিলেই আমরা অগ্রসর হতে পারি।

—আমি মগধের মহামাত্য হব!—পুষ্যমিত্র কথাটা ভালমত বুঝে নেবার চেষ্টা করেন, জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন সন্ন্যাসীর পানে।

সন্ন্যাসী বললেন—কুক্কুটারাম বিহারে উত্তরাপথের ধর্মচক্রের মহাসম্মেলন বসেছে, সদ্ধর্মের সংস্কার সম্পূর্ণ করে আবার আমরা প্রচারক পাঠাব চম্পা (ইন্দোচীন) থেকে সুবর্ণসপ্তক (জাপান) দ্বীপ অবধি। আপনাকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

—কিন্তু আমি যে······

—আপনার পরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত নয়। এই সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য মহাসম্মেলন আজ রাত্রি প্রথম প্রহরে আপনাকে কুক্কুটারাম বিহারে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আপনার উপস্থিতি আমরা প্রত্যাশা করি।

সন্ন্যাসী উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা করলেন না, ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসার মত গাছের ডালটার উপর উঠে বসলেন। পরক্ষণেই ডালটি মাটীর উপর থেকে শূন্যে উঠে পড়লো, আকাশপথে সন্ন্যাসী অদৃশ্য হলেন। শোনা যায় তখনকার দিনে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের পক্ষে শূন্যপথে বিচরণ করা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। পুষ্যমিত্র বারেক সেদিকে তাকিয়ে আবার নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। *

---

* এই গল্পে যে পতঞ্জলির নাম করা হয়েছে ইনি যোগদর্শনের ব্যাখ্যাতা মহর্ষি পতঞ্জলি ন'ন। মহর্ষি পতঞ্জলি ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী। প্রায় হাজার বছর আগে

তিন

সন্ধ্যা হতে তখনও কিছু দেরী আছে। পুষ্যমিত্রকে সঙ্গে নিয়ে পতঞ্জলি মগধ-সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

মগধ সম্রাটের সাতমহলা বাড়ী, পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ। গঙ্গার তীরে যোজনব্যাপী ঘন সন্নিবিষ্ট জনপদের মাঝে মৌর্য বংশের বিরাট রাজ-প্রাসাদ। মহলের পর মহল—অধ্যক্ষভূমি, কুমারভূমি, উপস্থান, মল্লভূমি, অলঙ্কারভূমি, অন্তঃপুর—একটীর পর একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা। প্রশস্ত কক্ষ, দীর্ঘ দালান; সাত রঙে রঙিন সু-উচ্চ দারুস্তম্ভমণ্ডিত সভাঘর। প্রাসাদের ভিতরে ও বাহিরে সোনা, রূপা ও লাক্ষার মনোহারী কারুশিল্প প্রভাতী সূর্যের দীপ্তিতে বহু বর্ণ বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। ভারতীয় শিল্পকলার পরম বিকাশ দৃষ্টিকে ঝল্‌সে দেয়।

অট্টালিকাশ্রেণীকে ঘিরে আছে নয়ন-মনোহারা উদ্যান। নানা দেশী ও বিদেশী ফুলের গাছ, নানা বর্ণের অসংখ্য পোষা পাখীর সমারোহ। পাখী-গুলির পায়ে কেউ শিকল পরিয়ে রাখে না, তারা ইচ্ছামত গাছে গাছে ওড়ে, কল-কাকলিতে সারাক্ষণ উদ্যানভূমি মুখরিত করে রাখে। কয়েকটী সরোবরে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জল থৈ থৈ করছে, মৃণালের পাশে পাশে নানা রঙের মাছ রামধনুর চাঞ্চল্য জাগায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য আর শিল্পীর বিলাস এসে মিলেছে এই প্রাসাদে।

আড়াই হাজার বছর আগে সমগ্র উত্তরাপথের সমৃদ্ধি আহরণ করে মৌর্য সম্রাটেরা পাটলিপুত্রের এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক ইলিয়ান এই প্রাসাদ দেখে লিখেছেন: 'এমন চমৎকার প্রাসাদ গ্রীস দেশে নেই, তৈরী করার মত শিল্পীও নেই!' চীনা দূত ফা-হিয়ান লিখেছিলেন: 'এই প্রাসাদ মানুষের তৈরী নয়, মানুষ এমন শিল্প সৃষ্টি করতে পারে না।

—খৃষ্টপূর্ব ২৮।২৯ শতকে ইনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমাদের এই কাহিনীর মহাত্মা পতঞ্জলি ছিলেন খৃষ্টপর্ব দ্বিতীয় শতকের লোক, পূর্ব ভারতের 'গোনাদি' প্রদেশের অধিবাসী। উত্তরাপথে এঁর পাণ্ডিত্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল, বিশেষতঃ বৈয়াকরণিক হিসাবে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মগধের রাজবংশ এঁকে গুরুর পদে বরণ করে ছিলেন। এঁকে আমরা দ্বিতীয় পতঞ্জলি বলতে পারি। এ সম্পর্কে অক্ষয়কুমার মজুমদার লিখিত 'হিন্দু হিস্ট্রী' দ্রষ্টব্য।

—লেখক

আগেকার রাজারা তাল-বেতালের মত ভূত আর দানবকে বশ করে এই প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন !'

দু' হাজার বছর আগে—আমাদের এই কাহিনীর যুগে—মগধের এই প্রাসাদে মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথ বাস করতেন।

গঙ্গাবক্ষে প্রশস্ত প্রাসাদ-অলিন্দ। স্বুবর্ণখচিত জাজিমের উপর বসে সম্রাট বৃহদ্রথ অন্তরঙ্গ কয়েকজন পার্ষদ নিয়ে দাবা খেলায় নিমগ্ন।

ওপারের অশথ-তমালবীথি থেকে বায়ুহিল্লোল অসংখ্য নৌকার পালে পালে ভর দিয়ে এপারের অলিন্দ পার হয়ে মহানগরীর অলিগলি-পথে হারিয়ে যাচ্ছে। শরতের স্বচ্ছতা দেখা দিয়েছে আকাশে, নীল রঙ ঢলে পড়েছে নদীর প্রান্তে, গোধূলি রঙের প্রান্তরের সীমান্তে। বর্ষণক্লান্ত মেঘে শুভ্রতা দেখা দিয়েছে, দিনশেষের সূর্যকিরণ রূপালী জরীর কাজ করছে মেঘের কিনারায়। গঙ্গা-বক্ষের স্নিগ্ধ সমীরণে প্রাসাদ-অলিন্দে স্বুবর্ণখচিত জাজিমের উপর বসে অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিয়ে সম্রাট বৃহদ্রথ দাবা খেলায় নিমগ্ন।

পতঞ্জলি এসে সামনে দাঁড়ালেন, বললেন—সম্রাটের জয় হোক !

বৃহদ্রথ চোখ না তুলেই মাথাটা খানিক ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানালেন, বললেন—প্রণাম হই গুরুদেব, আসন গ্রহণ করুন।

পতঞ্জলি বসলেন না, পার্ষদদের মুখের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—একটা সংবাদ ছিল মহারাজ !

—এখনি শুনবো গুরুদেব। আপনি একটু বস্থন, আগে এই বাজীটা শেষ করে নিই। গ্রীকদের এমন চেপে ধরেছি···নাও, কিস্তি···এইবার ?

পতঞ্জলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীর পদক্ষেপে অলিন্দের একপাশে সরে এলেন। সেখান থেকে নীচের অধ্যক্ষভূমির একাংশ দেখা যায়, ধূসর প্রাঙ্গণকে সামনে রেখে বরাবর প্রাসাদ-প্রাকারের পাশ দিয়ে হস্তীশালা চলে গেছে। সমান্তরালে গঙ্গার তট ধরে এগিয়ে গেছে দীর্ঘ রাজকীয় অশ্বশালা। অশ্ব-পালক ও হস্তীপালকের দল ছুটোছুটি করছে। সামনের প্রাঙ্গণে অশ্ব ও হস্তীর সমাবেশ হচ্ছে ; ওদের ভিতর থেকে দু'শো হাতী আর দু'হাজার ঘোড়া বাছাই করে নিয়ে সুরাষ্ট্রে (কাথিয়াবাড়) গ্রীক রাজা মিনান্দারের কাছে পাঠাতে হবে। মাধ্যমিকার (মেবার) পথে তিনি সৈন্য সমাবেশ করে অপেক্ষা করছেন। যে কোন দিন মগধ রাজ্য আক্রান্ত হতে পারে। শঙ্কিত

প্রত্যন্তবাসীরা হয়তো বিনিদ্র রজনী যাপন করছে, কিন্তু বিগত-শৌর্য মগধ সম্রাটের সে জন্য কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। তিনি নিশ্চিন্ত মনে দাবার ছকের উপর প্রতিপক্ষের রাজাকে কিস্তি দিচ্ছেন। পতঞ্জলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। গাছের নীচে ছায়ার আভাস জাগে। মেঘের কিনারায় যে রূপালী পাড় জেগেছিল, তাকে স্তিমিত করে রাত্রি-পূর্বের কৃষ্ণাভা। নীড়-সন্ধানী পাখীর কাকলিতে গাছগুলি মুখর হয়ে উঠলো। প্রাকারের পিছনে মগধের সৌধ-চূড়াগুলি অন্ধকারে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। প্রাসাদের করঙ্কবাহিনীরা ঘরে ঘরে তোরণে ও অলিন্দে দীপবর্তিকা জ্বেলে দিল, তোরণে তোরণে সন্ধ্যার ভেরীনিনাদ হ'ল, নগরীর গৃহে গৃহে জাগলো শঙ্খ-ধ্বনি, মন্দির থেকে ভেসে এলো সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ। পতঞ্জলি সম্রাটের দিকে ফিরলেন। বৃহদ্রথ তখনও গভীর মনোযোগের সঙ্গে দাবার ছকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছেন, বাইরের জগতের উপর তার বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। দু'পাশে অসিহস্তে দু'জন দেহরক্ষিণী পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। পতঞ্জলি আর সময়ক্ষেপ করলেন না, অলিন্দ পার হয়ে নীচে নেমে এলেন।

নীচে উদ্যানের এক পাশে একটী গোলাপের শাখাকে পুষ্যমিত্র দোল দিচ্ছিলেন, প্রতীক্ষা করছিলেন পতঞ্জলি কখন ডেকে সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

পতঞ্জলি নেমে এসে বললেন—সুবিধা হ'ল না, পুষ্যমিত্র সম্রাট্ দাবা খেলায় ভারী ব্যস্ত, তাঁর এতটুকু অবসর নেই। মিনান্দারের বিরুদ্ধে তিনি বার কয়েক কিস্তি দিয়েছেন, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদ-অলিন্দে গ্রীক-সম্রাট্ সসৈন্যে পরাজিত হবেন।

—রাজ্য বিপন্ন, প্রজা বিপন্ন, আর সম্রাট্ নিশ্চিন্ত মনে দাবা খেলছেন? বিস্ময়কর!

—মোটেই বিস্ময়কর নয় পুষ্যমিত্র, এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম। দৃঢ়চিত্তে কর্মপ্রতিভা দিয়ে একজন সাম্রাজ্য গড়ে তোলে, সেই সাম্রাজ্যর উপস্বত্ব ভোগ করতে করতে তার বংশধরেরা বিলাসের চরমে গিয়ে পৌছায়, শক্তি ও দৃঢ়তা—দুই-ই তারা হারিয়ে ফেলে, তখন রাজ্য শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে তদের

হস্তচ্যুত হয়, নতুন কর্মী এসে রাজ্যভার গ্রহণ করে,—নতুন রাজবংশের উদ্ভব হয়।

—সম্রাট্ বৃহদ্রথের ভবিষ্যৎ তো তা হ'লে অন্ধকার বলে মনে হয়!

—প্রাসাদের মধ্যে এই সম্পর্কে কোন আলোচনা না করাই বিধেয়, পুষ্যমিত্র!

পুষ্যমিত্র লজ্জিত হলেন, বললেন—হিন্দুস্থানের ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে মাঝে মাঝে চিত্তবিভ্রম ঘটে, স্থান, কাল ও পাত্রের কথা আর স্মরণ থাকে না, গুরুদেব।

মৌনমুখে দু'জনে প্রাসাদ-তোরণ পার হয়ে গঙ্গাতটে এসে দাঁড়ালেন।

চার

লাল কাঁকর বিছানো পথ, নগর-তোরণ পার হয়ে নদীর রেখা ধরে বরাবর চলে গেছে—বৈশালী, শ্রাবস্তী, মাধ্যমিকা, তক্ষশিলা, শ্রীনগর, ইন্দ্রপ্রস্থ, লক্ষ্মণাবতী, বারাণসী, কপিলবাস্তু। পাহাড় ও প্রান্তরকে দু'পাশে রেখে পায়ে-চলার রেখা, মানুষের যুগযুগান্তরের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার বাহিকা, গান্ধার ও হিন্দুকুশের বুক চিরে কান্দাহারের ওপারে পৌচেছে। সেই পথ আজ টেনে আনছে নিষ্ঠুর বিদেশীর রথচক্রকে।

সহসা পুষ্যমিত্রের চোখের সামনে ভেসে উঠলো, পথের কাঁকর যেন রক্তিম হয়ে উঠেছে, চারিপাশে যেন রক্ত ছড়িয়ে আছে, কুরুক্ষেত্রের মাঠের মত রক্তাভ! রক্তাভ ধূলিরাশি ক্রমশঃ আকাশে গোধুলির রং ধরাচ্ছে। সেই ধূলির নীচে নগরীর প্রাকার ভেঙে পড়েছে, ভগ্ন প্রাকারের উপর জেগে উঠেছে গ্রীক অশ্বারোহীর শিরস্ত্রাণ! গৈরিকধারী হিন্দু সেনারা একজনের পর একজন ধরাশায়ী হচ্ছে, আহতের আর্তনাদের সঙ্গে মিশছে বিজয়ীর হুঙ্কার! সন্ত্রস্ত শিশু ও নারীরা পালাতে গিয়ে পিছু হটে আসছে, যবনেরা নগরীর চারিপাশ ঘিরে ফেলেছে, পথ নেই!

সহসা ধূলার ভিতর থেকে প্রতিভাত হ'ল রাজপ্রাসাদ,—মথুরার প্রাসাদ। এই প্রাসাদে পুষ্যমিত্র আজন্ম প্রতিপালিত। প্রাসাদের প্রতিটি দ্বার তার কাছে পরিচিত। ওই প্রাসাদের অদূরে শাদা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন কে-ও? মথুরার রাজা? পিতা!

পুষ্যমিত্র চমকে উঠলেন। সহসা মনে হ'ল পিতার কণ্ঠস্বর তাঁর কাণে এসে বাজছে: 'হিন্দু সভ্যতা ধারালো তলোয়ারের নীলাভ ফলার মত তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, জাহ্নবীর মত নির্মল ও প্রাণবান্।' যে প্রাণশক্তি নিয়ে একদিন আমরা ছড়িয়ে পড়েছিলাম জনপদ থেকে জনপদান্তরে, সাগরের এক-বেলাভূমি থেকে আর এক বেলাভূমিতে সে প্রাণশক্তি আজ মুমূর্ষু, আর্যাবর্তের পশ্চিম প্রান্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। যে পথে আর্য ঋষি ও শ্রমণেরা জ্ঞানের দীপ্তি নিয়ে পরিভ্রমণ করতো, সে পথে আজ মৃতের স্তূপের পাশে বাজছে বন্দীদের পায়ের শৃঙ্খল। রক্ত ও চোখের জলে পথ সিক্ত হ'ল তবু তো কই দেবতা জাগলো না! 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'—কিন্তু কই? ভগবান তো এখনও জাগলেন না!

---ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!—তিনি আসছেন!

পুষ্যমিত্র চমকে উঠলেন, সামনে বজ্রাচার্য। মুখে হসি, চোখ দু'টি কিন্তু হিংস্র শ্বাপদের মত ধ্বক্ ধ্বক্ করছে! ওই দৃষ্টির সামনে সম্মোহিত হয়ে তা হ'লে কি তিনি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন! পুষ্যমিত্র অস্বস্তি বোধ করলেন।

বজ্রাচার্যের চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এলো। হাসতে হাসতে তিনি বললেন—ভগবান্ তো নিজে আসেন না. এক একবার এক একজন মানুষের ভিতর দিয়ে তিনি প্রকাশ পান, প্রয়োজনীয় কল্যাণটুকু করিয়ে নেন। কে বলতে পারে এবার হয়তো তিনি তোমার ভিতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করবেন।

পুষ্যমিত্র সহসা কোন কথা বলতে পারলেন না, কিন্তু কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করলেন, পতঞ্জলির মুখের পানে তাকালেন। বজ্রাচার্য বললেন—চলো, তোমাকে কুক্কুটারাম বিহারে নিয়ে যাবার জন্য আমি এসেছি।

বজ্রাচার্যের সঙ্গে যেতে পুষ্যমিত্রের কেমন যেন শঙ্কা হ'ল, যাবেন কি যাবেন না স্থির করতে পারেলন না। পতঞ্জলি তাঁর মনের কথাটা এবার বোধ হয় বুঝতে পারলেন, বললেন,—কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—কর্ম করে যাও, অনিবার্য পরিণতি আপনি ঘটবে!

বজ্রাচার্য নিমন্ত্রণ জানালেন—আপনিও আসুন মহাচার্য! আপনাকে পেলে জনগনের কল্যাণ নিরূপণে আমরা অভ্রান্ত হতে পারবো।

পতঞ্জলি আকাশের প্রান্তে ত্রয়োদশীর চাঁদের পানে একবার তাকালেন, কি যেন ভেবে নিলেন, ধীরে উচ্চারণ করলেন—শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু!

তারপর তিনি নিজে অগ্রসর হলেন কুক্কুটারামের দিকে।

পাঁচ

অশোকারামের রত্নগৃহে উত্তরাপথের ধর্মচক্রের প্রধানেরা সমবেত হয়েছেন। মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকধারী শীর্ণদেহ শ্রমণের দল। নিম্নস্বরে তাঁরা আলাপ করছিলেন। পুষ্যমিত্র ভিতরে আসতেই মহাস্থবির ধর্মরক্ষিত স্বাগতম জানালেন—স্বাগতম! স্বাগতম!! অপর সকলে বাতাসে মাথা দোলালেন শুধু।

পতঞ্জলি আসন গ্রহণ করলেন ধর্মরক্ষিতের পাশে। বজ্রাচার্য পুষ্যমিত্রকে পাশে নিয়ে বসলেন। প্রদীপের স্তিমিত আলোকে পুষ্যমিত্র উপস্থিত সকলের মুখের উপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন, কয়েকটী পরিচিত মুখ তাঁর চোখে পড়লো: তক্ষশিলার মহাসাঙ্ঘিক কীর্তিরক্ষক, জেতবন বিহারের নাগদত্ত, নরেন্দ্র (নালন্দা) বিহারের সুবিজ্ঞ, মূলগন্ধকুটি বিহারের প্রভাকর, অশোকারামের নাগসেন।

কয়েক মুহূর্ত মৌন কক্ষটি স্তিমিত অন্ধকারে থম্ থম্ করতে লাগলো। তার পর অশোকারামের মহাস্থবির ধর্মরক্ষিত কথা বললেন—বহু বিচার ও বিবেচনা করে উত্তরাপথের ধর্মচক্র (বৌদ্ধ মহাসভা) স্থির করেছেন যে সদ্ধর্মের রক্ষা ও জনগনের কল্যাণের জন্য অবিলম্বে এ দেশ থেকে যবন অত্যাচারীদের দূর করা একান্ত প্রয়োজন। এই কার্য সম্পাদনের শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন মগধ-সম্রাট। কিন্তু একান্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদেরকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে সম্রাট বৃহদ্রথের পক্ষে তা সম্ভব নয়, আলস্য ও বিলাসপ্রিয়তা তাঁকে একেবারে অকর্মণ্য করে তুলেছে। সেইজন্য সর্বসাস্ত্রে সুপণ্ডিত, শাস্ত্রবিদ মথুরার রাজকুমার পুষ্যমিত্রকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য আমরা আমন্ত্রণ করছি।

পুষ্যমিত্র এতটা আশা করেন নি। এই দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন কি বর্জন করবেন, সহসা কিছু নিশ্চয় করতে পারলেন না। আচার্য পতঞ্জলির মুখের পানে তাকালেন। পতঞ্জলি তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে তাঁর মনের

কথাটা বুঝতে পারলেন, বললেন—পুষ্যমিত্র, তুমি রাজবংশের লোক, রাজ্য পরিচালনা ও সৈন্য পরিচালনা তোমার সহজাত সংস্কার ?

—কিন্তু এ যে বড় কঠিন কাজ গুরুদেব !

ধর্মরক্ষিত এবার কথা বললেন,—জনগণের কল্যাণ-কামীর কাছে কোন কাজই কঠিন নয়। সম্রাট্ ধর্মাশোকের নির্দেশ নিশ্চয়ই তোমার অবিদিত নয় ?

বজ্রাচার্য দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করলেন। প্রদীপের স্তিমিত শিখায় দেয়ালের গায়ে সাদা অক্ষরগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে :

দেবানাংপিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ : কলাণং দুকরং যে আদি করে কলাণস সো দুকরং করোতি…(দেবগণেরপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক এইরূপ বলিয়াছিলেন :—কল্যাণকর কার্য করা দুষ্কর। যিনি প্রথম কল্যাণ কার্য করেন তিনি দুঃসাধ্য সাধন করেন।)*

কয়েক মিনিট সবাই চুপচাপ।

তারপর বজ্রাচার্য কথা বললেন—এই দুর্দিনে জাতিকে উদ্ধার করতে হবে এবং তুমি সে সম্বন্ধে যোগ্য ব্যক্তি। যবন বিতাড়নের জন্য তুমি যে ভাবে যা করতে চাও তাই তুমি করবে, এবং সর্ববিষয়ে ধর্মচক্র ও ব্রাহ্মণসভা তোমাকে সাহায্য করবে। অর্থের অভাব হবে না, প্রয়োজন মত সৈন্য সংগ্রহেও আমরা সাহায্য করতে পারি।

এবার পুষ্যমিত্র কথা বললেন,—কিন্তু মগধ-সম্রাটের অনুমতি ব্যতিরেকে গ্রীকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে যাওয়া কি যুক্তিযুক্ত হবে ?

বজ্রাচার্য বললেন,—জনগণের কল্যাণের জন্য সম্রাট, প্রজাদের শুভেচ্ছার উপরেই তাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। প্রজাদের দুর্দিনে ঐশ্বর্যের মাঝে বিলাস করা রাজার পক্ষে শোভন নয়। শত শত প্রজার ধনপ্রাণ যখন বিপন্ন তখন অক্ষক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করা কোন প্রজাপালকের পক্ষে শোভন নয়। রাজা অযোগ্য হ'লে প্রজাকেই রাজ্যভার গ্রহণ করতে হবে।

—কিন্তু এ যে রাজদ্রোহ ?

—তুমি বিষয়টাকে উল্টো দিক থেকে দেখছ পুষ্যমিত্র। রাজা যখন প্রজাদের সম্পদ নিয়ে বিলাস করে, প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার পানে দৃষ্টি দেয় না, তখন তাকে বলে প্রজাদ্রোহী। প্রজাদ্রোহী সম্রাটকে সিংহাসন থেকে

---

* অশোকের পঞ্চম গিরিলিপি—গির্ণার পাঠ।

নামিয়ে দেবার অধিকার প্রজাদের আছে। তাকে রাজদ্রোহ বলে না, তাকে বলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

—আপনারা এ বিষয়ে সম্রাটের সঙ্গে কথা বলেছেন?

—সম্রাট দিনরাত অক্ষক্রীড়ায় মগ্ন, কথা বলার মত অবসর তাঁর নেই। তার উপর অতিরিক্ত মধুপান করার ফলে নিভৃতে মন্ত্রগুপ্তি আলোচনা করার মত মনের অবস্থাও তাঁর নয়।

—কিন্তু সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করা আমার পক্ষে কি সম্ভব হবে?

—আমরা তোমাকে তেমন কিছু করতে বলছি না। এমন পথে অগ্রসর হ'তে হবে যাতে যদি আমরা পরাজিত হই, তা'হলে গ্রীক্ সম্রাটের সঙ্গে সন্ধির পথ যেন খোলা থাকে। সম্রাট বৃহদ্রথ যেমন তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করছেন করুন, তোমাকে নামতে হবে দস্যু-সর্দারের ভূমিকায়। যদি জয়ী হও দেশ শত্রুমুক্ত হবে, যদি হেরে যাও ক্ষত্রিয়ের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবে,—কোন ডাকাত-সর্দারের অন্যায়ের জন্য মিনান্দার সম্রাট্ বৃহদ্রথকে দায়ী করতে পারবেন না।

পুষ্যমিত্র বললেন,—বেশ, তাহলে আমি রাজী আছি!

ছয়

খৃষ্ট-জন্মের দেড়শত বছর আগের কথা, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশ তখন ইন্দো-পার্থিয়ান গ্রীক্‌দের অধীনে। কপিশ, কাবুল, পঞ্চনদ ও সিন্ধুদেশে তখন তারা রাজত্ব করছে, দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের এসিয়ার সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেছে কিন্তু শক্তি হারায় নি। আলেকজান্দারের স্বপ্ন চোখে নিয়ে কয়েক বছর আগে গ্রীকেরা নূতন করে ভারত অভিযান সুরু করেছে, কিন্তু কপিশ, কাবুল, পঞ্চনদ ও সিন্ধু অবধি এসেই তারা থেমেছে। কোন বড় বাধা যে তাদের থামিয়েছে তা নয়, তারা থেমেছে ভিতরের অন্তর্বিবাদের জন্য। নিজেদের মধ্যে শক্তি-লাভের দ্বন্দ্ব শেষ হ'তে লেগেছে অর্ধ-শতাব্দী। তারপরেই আবার নব-পর্যায়ে সুরু হল ভারত-জয়ের অভিযান। গ্রীক্ রাজা মিনান্দার শত সহস্র সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন সৌরাষ্ট্রের (কাথিয়াবাড়) দিকে। সৌরাষ্ট্র জয় করে এগিয়ে এলেন মাধ্যমিকায়; সেখান থেকে মথুরা। মথুরা নগরী লুণ্ঠন করে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, সংবাদ

এলো ভরতপুর ও অযোধ্যায় বিপুল মাগধী সেনার সমাবেশ হচ্ছে। মগধের হস্তীবাহিনীর ভয়ে আলেকজান্দার পঞ্চনদ পার হয়ে অগ্রসর হতে সাহস করেন নি। মিনান্দার ভাবিত হলেন। আলেকজান্দারের মত তাঁর যে একেবারে হস্তীবাহিনী ছিল না, তা নয়, কয়েকটি :হস্তী তিনি পঞ্চনদ থেকে সংগ্রহ করে-ছিলেন। কিন্তু মাগধী হস্তীযূথের কাছে তা নগণ্য।

মন্ত্রী আন্তিওকাস ও ডিমিত্রিয়াস বললেন—মগধ-রাজের শক্তি যথাযথ নিরূপণ না করে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না সম্রাট! শেষে হয়তো এমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে যে পঞ্চনদ পর্যন্ত আমাদের হস্তচ্যুত হবে। সেই জন্য আগে আমরা চারিপাশে গুপ্তচর প্রেরণ করি। ইতিমধ্যে মগধ সম্রাটের কাছে এক দূত পাঠানো হোক।

মিনান্দার বললেন,—কিন্তু আমার পক্ষ থেকে দূত গেলে আমারই দুর্বলতা প্রকাশ পাবে না কি?

—আমরা সে কথাও ভেবেছি সম্রাট্! দূত আমাদের পক্ষ থেকে যাবে না। মথুরার বৌদ্ধ-সঙ্ঘ থেকে একজন স্থবির যাবেন, তিনি আমাদের শক্তিমত্তার বিপুলতা ব্যাখ্যা করে বলবেন, দু'শো হাতী, দু'হাজার ঘোড়া, আর দশ লাখ স্বর্ণ মুদ্রা পেলে আমাদের বাহিনী আর অগ্রসর হবে না, বহু নিরীহ জনগণের রক্তপাত নিবারণ হবে। বৌদ্ধদের ধর্মের দিক্ থেকে সেইটাই বিশেষভাবে কাম্য।

—কিন্তু বৌদ্ধ স্থবির আমাদের পক্ষ নিয়ে যাবে কেন?

—সে দায়িত্ব আপনি আমাদের উপর ছেড়ে দিন সম্রাট! দেশের জনগণের কল্যাণ কামনায় বৌদ্ধরা এটুকু করবেন, তাঁদেরকে শুধু প্রতিশ্রুতি দিলেই চলবে যে আমরা চলে যাব।

আন্তিওকাস ও দিমিত্রিয়াস বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। বৌদ্ধ-সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে তাঁদের বিশেষ কষ্ট পেতে হ'ল না, সংগ্রাম, লুণ্ঠন ও ধ্বংস থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা দূতের দায়িত্ব নিতে স্বীকার পেলেন। দ্রুতগামী রথে পাঁচজন বৌদ্ধ স্থবির যাত্রা করলেন পাটলিপুত্রের দিকে।

সাত

মথুরা থেকে ভরতপুর সাত যোজন পথ মাত্র। মথুরার উপকণ্ঠে মিনান্দারের বিরাট বাহিনীর ছাউনি পড়েছে। ভরতপুরের রাজা কুমারসেন বিশেষ ভাবে চিন্তিত। মথুরা লুণ্ঠিত হবার খবর আসা মাত্রই ভরতপুরের নাগরিকেরা পলায়নের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সর্বত্রই একটা আতঙ্কের পরিবেশ। সাত যোজন পথ অতিক্রম করতে এক রাত্রের বেশী লাগবে না, তারপর প্রভাতের ঊষালোকে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে নগরীর বুকে, কে কোথায় ছন্নছড়া হয়ে পড়বে! সেই ভয়ে যার সামান্য সংস্থান আছে সে-ই নগর পরিত্যাগ করে যাচ্ছে। পথে জনকোলাহল বেশী, অনেক বিপণিও খোলে নি। রথ ও গো-যানে পথ সমাকীর্ণ। কুমারসেন নগর-তোরণ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, ঘোষণা করেছেন—যারা যেতে চাও, চলে যাও, কোন বাধা নেই!

নগরীর পথ ক্রমশঃ জনশূন্য হয়ে আসছে। কুমারসেন প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে দেখছেন, আর ভাবছেন। মনে পড়ছে ছেলেবেলাকার কথা। পিতা সৌভাগ্যসেন তখন পঞ্চনদে রাজত্ব করছেন, গ্রীক আক্রমণের ভয়ে তক্ষশিলাও তখন এমনি ভাবেই জনশূন্য হয়। তারপর সম্মুখ সমরে পিতা মৃত্যু বরণ করলেন। রাজ্য গেল, ভাগ্য অন্বেষণে কুমারসেন এসে উঠলেন এই ভরতপুরে। মগধ-সম্রাটের অনুগ্রহে আজ তিনি এই দুর্গের রক্ষক।

সহসা কুমারসেনের চোখে পড়লো কমণ্ডলু হস্তে এক ব্রাহ্মণ প্রাসাদের দিকে আসছেন। কুমারসেন তাড়াতাড়ি অলিন্দ থেকে নেমে এলেন ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

অলিন্দের একপাশে একখানি বৃহৎ কষ্টিপাথরের আসন করা ছিল, কুমারসেন ব্রাহ্মণকে সেখানে নিয়ে এসে বসালেন। ব্রাহ্মণ বললেন,—দীর্ঘদিন পরে আজ তোমাকে আমার প্রয়োজন হয়েছে,—বিশেষ মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজন। ···মহারাজ সৌভাগ্যসেন যখন গ্রীকদের কাছে পরাজিত হয়ে একান্ত সম্বলহীন অবস্থায় একমাত্র পুত্রের হাত ধরে, মথুরায় এসে পৌঁচেছেন; তখন প্রচণ্ড মারীগুটিকার আক্রমণে তোমরা দু'জনেই সহসা অসুস্থ হয়ে পড়লে···সেই দিনের কথা তোমার স্মরণ আছে রাজকুমার?···

—স্মরণ আছে আচার্যদেব! সেই দুর্দিনে আপনি আমাদেরকে আশ্রয় না দিলে আমাদের প্রাণ রক্ষার কোন সম্ভাবনাই থাকতো না।

—উত্তম! তারপর মগধ-সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তোমাদেরকে ভরতপুর রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কথাও নিশ্চয়ই তুমি বিস্মৃত হওনি?

—আপনি আমাকে অপরাধী করছেন কেন আচার্যদেব? আমার সবই স্মরণ আছে। আপনি যা আদেশ করবেন আমি সর্বদাই তা করার জন্য প্রস্তুত আছি।

—এই সব কথা আজ স্মরণ করাবার প্রয়োজন হয়েছে রাজকুমার! সে দিন যে অধিকার আমি তোমাদের দিয়েছিলাম, আজ সেই অধিকার আমি ভিক্ষা চাইছি। সারা ভারতের মুক্তির জন্য আজ ভরতপুরের এই রাজ্যাংশটুকুর প্রয়োজন!

—কি করতে হবে আদেশ করুন।

—বড়ই কঠিন গুরুকাজ, একান্ত মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজন।...মাধ্যমিকার মহানায়ক মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, মাধ্যমিকার পতন ঘটিয়ে এখন সম্রাট্ মিনান্দারকে সে নিয়ে এসেছে মথুরার দ্বারে। মৃত্যুঞ্জয়ের চক্রান্তে মথুরার পতন ঘটেছে, নগর লুণ্ঠিত। এবার মিনান্দার অযোধ্যার পথে পাটলিপুত্রের দিকে অগ্রসর হবে, সত্বর একটা কিছু করার প্রয়োজন। পঞ্চনদ, সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র থেকে মাধ্যমিকা ও মথুরা পর্যন্ত উত্তরাপথের অর্ধাংশ আজ গ্রীকদের কুক্ষিগত। আর বিলম্ব করলে হয়তো পাটলিপুত্রও একদিন যবনের করতলগত হবে এবং যবনাচারে ভারতভূমি প্লাবিত হবে। তার আগেই আমাদেরকে প্রতিবিধান করতে হবে এবং এই কাজে তোমাকে আমার একান্ত প্রয়োজন...

—সম্রাট্ বৃহদ্রথ কিরূপ প্রস্তুত হয়েছেন?

—তিনি অক্ষক্রীড়ায় মত্ত আছেন, বসে বসে অশ্ব, গজ ও বলের চাল দিচ্ছেন; প্রাচুর্যের আলস্য ও নির্বীর্যতা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে। তিনি অশ্ব, ও সুবর্ণ পাঠাচ্ছেন মিনান্দারকে খুসি করার জন্য। সম্রাটের বিশ্বাস এই উপঢৌকনে খুসি হয়ে মিনান্দার কাবুল-কপিশায় ফিরে যাবে। কিন্তু এই উপঢৌকন যে তাদেরকে প্রলুব্ধ করবে তা তিনি বুঝতে চান না। এর আগেও তিনি একবার উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, তা'তে মিনান্দারের শক্তি

বৃদ্ধি করেছে, এবং মথুরা অবধি আক্রমণের উৎসাহ জুগিয়েছে। এবার তাই আমাদেরকে ভিন্ন পথ ধরতে হবে!

—বলুন কি করতে হবে?

—দু'শো হাতী, দু'হাজার ঘোড়া ও দশ লক্ষ স্বর্ণ উপঢৌকন নিয়ে মগধের দূত এই পথে আসবে, পথিমধ্যে সেই উপঢৌকন আটক করে লুঠ করতে হবে।

—কিন্তু সে-তো সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হবে আচার্যদেব!

—দেশের চেয়ে সম্রাট্ বড় নয়। দেশবাসীর শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যই একজনের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করে তাকে সিংহাসনে বসানো হয়। যতক্ষণ তিনি প্রজাগণের স্বার্থ দেখবেন ততক্ষণই তিনি সম্রাটের মর্যাদা পাবেন, প্রজাদের স্বার্থের বিরোধিতা করলেই প্রজাদের কাছে তাঁর আর কোন মূল্য নেই। তবে আমরা যে পন্থা অবলম্বন করেছি আপাতঃদৃষ্টিতে তা রাজদ্রোহিতা বলে মনে হ'লেও পরিণামে মগধের রাজবংশ রক্ষা পাবে।

—যদি তাই হয় তা'হলে আপনার আদেশ শিরোধার্য।

ব্রাহ্মণের মুখে এবার হাসি ফুটলো, বললেন,—তুমিই এ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি, তাই তোমার কাছে এলাম। এখন ইতি-কর্তব্য অবধান কর।

চারিপাশে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণ নিম্নস্বরে কথা বলতে সুরু করলেন।

আট

মথুরা ও বৃন্দাবনের মাঝে যোজনের পর যোজন ব্যেপে যে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর দিগন্তে মিশেছে সেখানে গ্রীক্ বাহিনীর ছাউনি পড়েছে। সেনাপতি দিমিত্রিয়াস ও আস্তিওকাসের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সম্রাট্ মিনান্দার এই স্থানটিই মনোনীত করেছেন। এখানে দু'টি নগরীর যোগাযোগ ছিন্ন করা হয়েছে এবং প্রয়োজন-মত দু'টি নগরীই লুণ্ঠন করে গ্রীক সেনারা খাদ্য ও সম্পদ্ আহরণ করছে। মিনান্দার ঠিক করেছেন এখানেই মগধ-সম্রাটের ভেট না আসা পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম করবেন, এবং সেই অবসরে বৃন্দাবনের শত শত মন্দির থেকে ধন-রত্ন অপহরণ করবেন; তারপর অগ্রসর হবেন মগধের দিকে। মগধের সিংহাসনের উপর তাঁর লোভ বহুদিনের। উত্তরাপথে যত বড় রাজ্যই

থাক না কেন, মগধের সিংহাসনে না বসতে পারলে সত্যিকারের ভারত-সম্রাট্ হওয়া যায় না। সেইজন্য তিনি এবার যতটা প্রয়োজন প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণ করবেন না বলে তিনি যে বিনিময় মূল্য চেয়েছেন সেটা শুধু একটা কূটনীতির চাল মাত্র। মগধ থেকে অশ্ব, হস্তী ও অর্থ এসে পড়লে তাঁর শক্তি বাড়বে, তখন মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণ করা আরো সহজ হবে। সেই ক'দিন একান্তে বিশ্রাম করাই মিনান্দারের উদ্দেশ্য। আলেক্জান্দার যা করতে পারেন নি, মিনান্দার তা-ই করবেন—তিনি হবেন আলেকজান্দারের চেয়েও বড়!

মিনান্দারের এখন নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম!

সেদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন অন্তরঙ্গের সঙ্গে তিনি মগধ জয়ের পরিকল্পনা করছেন। বস্ত্রাবাসের মধ্যে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিয়ে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাত জায়গায় পলিমাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। গ্রীক শিল্পী সেই পলিমাটির উপর উত্তর ভারতের একখানি মানচিত্র এঁকেছেন। মিনান্দার অন্তরঙ্গদের সঙ্গে সেই মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করছেন—কতটা তিনি অধিকার করেছেন আর কতটা অধিকার করতে বাকি আছে এবং কোন্ পথ দিয়ে পাটলিপুত্রে অভিযান করা সহজ হবে, পথে কতগুলি নগরীর সম্পদ লুণ্ঠন করা যাবে,—এই সব নিয়ে চলেছে আলোচনা।

শিল্পী বুদ্ধিমান্, ভারতের মানচিত্র সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল তথ্যই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন; তথাপি সম্রাট্‌কে খুসি করার জন্য মানচিত্রের পানে তাকালেই. দেখা যায় উত্তরাপথের অর্ধেকের উপর গ্রীকেরা অধিকার করেছে। তার উপর গান্ধার, কপিশা ও কাফিরিস্তান তো আছেই। বিজয়-গৌরবে মিনান্দার দৃপ্ত হয়ে উঠলেন, ভারত সাম্রাজ্যের স্বপ্নে মশগুল হয়ে তিনি পাত্রের পর পাত্র মধু পান ক'রে চললেন। তখনকার দিনে সুরা ভারতে প্রস্তুত হ'ত না, মধুই ছিল একমাত্র মাদক পানীয়। মিনান্দার কয়েক পাত্র মধু নিঃশেষ ক'রে কোন এক সময়ে উৎফুল্ল মনে বলে উঠলেন—শীঘ্রই ভারতের মুদ্রায় সম্রাট্ মিনান্দারের মূর্তি মুদ্রিত হবে। কিন্তু সেই চিহ্নকে স্থায়ী করতে হ'লে এ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে হবে, প্রাকৃত ভাষাটা রীতিমত শিখে নিতে হবে। দিমি আর আন্তি (দিমিত্রিয়াস ও আন্তিওকাস), তোমরা দু'জনে আজই আমার জন্য একটা হিন্দু পণ্ডিত যোগাড় করে

দাও, যত শীঘ্র সে আমাকে এদেশী ভাষা শেখাবে তত বড় জায়গীর তাকে আমি বখশিষ দেব।

দিমিত্রিয়াস হাসলেন, বললেন—হিন্দুদের আপনি এখনও সম্যক্‌ভাবে চিনতে পারেন নি সম্রাট্! ভালো পণ্ডিত কেউ আসবে না। যাদেরকে তারা দেশের শত্রু বলে মনে করে, জীবন থাকতে তাদের সঙ্গে তারা সহযোগিতা করবে না।

মিনান্দার বললেন—অর্থ দেব, যত অর্থ সে চাইবে। অর্থ দিয়ে জায়গীর দিয়ে তার মাথা কিনে নেব।

আন্তিওকাস বললেন—হিন্দু পণ্ডিতেরা অর্থের কোন মূল্য দেয় না, সম্রাট্! গাছতলায় বসে তারা অধ্যাপনা করে। দিনে একবার তারা অন্ন-গ্রহণ করে। মানুষের মঙ্গলের চিন্তায় তারা জীবন উৎসর্গ করে। এদের এক পণ্ডিত নাকি নিজের বুকের পাঁজর দিয়ে শত্রুকে মারবার অস্ত্র তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। এদেশের পণ্ডিতেরা প্রত্যেকেই এক-একটি ছোটখাট সক্রেতিস।

গ্রীক্ সম্রাটের মুখে চিন্তার রেখা পড়লো, কিন্তু পরক্ষণেই সেই চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি আর এক পাত্র মধু নিঃশেষ ক'রে ফেললেন।

এমন সময় প্রতিহারী এসে জানালো—একজন হিন্দু সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আন্তিওকাস বললেন—কি দরকার জিজ্ঞাসা কর।

—বললো, সম্রাটের কাছে সে সংবাদ বিক্রয় করতে এসেছে।

—সংবাদ বিক্রয় করতে এসেছে!—আন্তিওকাস সম্রাটের মুখের পানে তাকালেন।

সম্রাট্ আদেশ দিলেন—বেশ, হিন্দুকে নিয়ে এসো।

প্রতিহারী অল্পক্ষণের মধ্যেই যে লোকটাকে সঙ্গে ক'রে বস্ত্রাবাসের ভিতর নিয়ে এলো সে আমাদের পূর্ব-পরিচিত ব্রাহ্মণ, ভরতপুর প্রাসাদে রাজা কুমারসেনের সঙ্গে পরামর্শ করতে তাকে আমরা দেখেছি।

ব্রাহ্মণ দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে গ্রীক্ সম্রাট্‌কে নমস্কার করলো, উচ্চারণ করলো—সম্রাটের জয় হোক!

সম্রাট্ মিনান্দার, আন্তিওকাস ও দিমিত্রিয়াস তীক্ষ্ণ চোখে ব্রাহ্মণের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন, তারপর মিনান্দার বললেন—কি চাই তোমার ?

মিনান্দার যে ভাষায় কথা বললেন তা গ্রীক ভাষা নয়। আলেকজান্দার ভারত অভিযান করার পরে, মগধ রাজ্যের পাশেই গ্রীক রাজ্যের সীমানা এসে পৌঁছায় এবং গ্রীকদের সঙ্গে হিন্দুদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তার ফলে এই দুই জাতির পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার জন্য এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়,—প্রাকৃত এবং গ্রীক ভাষার এক খিচুড়ী। মিনান্দার সেই ভাষাতেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণও সেই ভাষাতেই উত্তর দিলেন—আমি আপনার কাছে সংবাদ বিক্রয় করতে এসেছি।

—কি সংবাদ ?

—প্রয়োজনীয় সংবাদ সম্রাট্। শুনলেই আপনি তার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

—বেশ, বলুন। সংবাদ মূল্যবান্ হ'লে আমি আপনাকে যথোচিত পুরস্কার দেব।

—বিত্ত ও সম্পদে আমার কোন প্রয়োজন নেই সম্রাট্, আমার প্রয়োজন শুধু প্রতিহিংসার। আপনি শুধু প্রতিশ্রুতি দিন আমার সেই প্রার্থনা পূরণ করবেন।

—যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয় আপনার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখবো না।

—আপনার জয় হোক সম্রাট্!

ব্রাহ্মণ অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই এবার আসন গ্রহণ করলেন, তারপর বলতে সুরু করলেন—আমার সংবাদ বলার আগে আমার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এখন আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ মাত্র, কিন্তু পূর্বজীবনে আমি ছিলাম বিদর্ভের রাজকুমার সুমতি সেন। আমাদের রাজা হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। ভগবান্ বুদ্ধ যখন রাজগৃহের এক পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর শত্রু দেবদত্ত মহারাজ অজাতশত্রুকে প্ররোচিত করে শাক্যমুনির প্রাণনাশের চেষ্টা করে। কাছাকাছি এক পাহাড়ের চূড়ায় এক নিক্ষেপণী-যন্ত্র স্থাপনা করে তথাগতের উপর কীলক নিক্ষেপ করে। সেই নিক্ষিপ্ত কীলকে শাক্যমুনির জীবনান্ত ঘটতো, কিন্তু এক ভিক্ষু যথাসময় তা দেখতে পান, এবং

নিজে কীলকের আঘাত গ্রহণ করে শাক্যসিংহের প্রাণরক্ষা করেন। সেই ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ পূর্বজীবনে গৃহী ছিলেন, তাঁর পুত্রকন্যাও ছিল। সম্রাট অশোক যখন রাজা হলেন তখন তিনি সেই ভিক্ষুশ্রেষ্ঠের পুত্র মাধবসেনকে বিদর্ভের শাসন কার্যে নিয়োগ করেন। মাধবসেন থেকে আমি হ'লাম সপ্তম পুরুষ। আমি যখন বিদর্ভের শাসনভার গ্রহণ করি তখন আমার বয়স ছিল অল্প, রাজকাজে সম্যক্ জ্ঞান ছিল না। সেই সুযোগে সেনাপতি বীরসিংহ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমার ভাই কুমারসেনকে হত্যা করে। আমি কোন রকমে পালিয়ে আসি। আমার বোন মালবিকাকে সে ভরতপুরের দুর্গে বন্দী করে রেখেছে। আপনার সাহায্যে আমি বোনের বন্ধন মোচন করতে চাই।

দিমিত্রিয়াস এবার কথা বললেন—অর্থাৎ, তোমার জন্য আমরা এখন ভরতপুর আক্রমণ করবো, এই তোমার অভিপ্রেত? কিন্তু তোমার হয়তো জানা নেই যে মগধ-সম্রাটের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়ে গেছে, গ্রীক সেনা আর অগ্রসর হবে না। মগধ-সম্রাট আমাদেরকে ফিরে যাবার খরচ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই টাকাটা এসে পড়লেই আমরা এখান থেকে বস্ত্রাবাস তুলে নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করবো!

—সে খবর আমার অজ্ঞাত নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় খবরটা হয়তো আপনাদের জানা নেই। পাটলিপুত্র থেকে যে অশ্ব, হস্তী ও সুবর্ণ আসছে তা আপনাদেরকে খুসি করবার জন্য আসছে না, আসছে আপনাদেরকে কিছুদিন শান্ত রাখার জন্য। এই অবসরে মাগধী সেনা প্রস্তুত হচ্ছে। ওই উপঢৌকনের পিছনে আসছে দশ হাজার হস্তী ও আড়াই লাখ মাগধী সেনা। আপনারা উপঢৌকন নিয়ে যেই ফেরার পথে পা বাড়াবেন, অমনি পিছন থেকে আপনাদেরকে মাগধী সেনা আক্রমণ করবে।

—মগধে দশ হাজার রণহস্তী আছে?—মিনান্দার বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

আন্তিওকাস বললেন—তোমার কথার সত্য-মিথ্যা প্রমাণ কি?

সুমতিসেন বললেন—গূঢ়পুরুষেরা (চর) যে সব সংবাদ আনে সে সম্পর্কে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন তোলা রাজধর্ম নয়, সেই সম্পর্কে যথা বিহিত ব্যবস্থা করাই হ'ল রাজকর্তব্য। তথাপি প্রমাণ স্বরূপ আমি বলতে পারি যে ভরতপুরের কোন খবর রাখলে আপনারা এ কথা তুলতেন না। মগধ-সম্রাটের নির্দেশে

ভরতপুর দুর্গের সাধারণ বাসিন্দাদেরকে বিতাড়িত করে সেখানে সৈন্য সমাবেশ করা হচ্ছে, প্রতিদিন সেখানে নূতন সৈন্য আসছে। এইটিই হবে একটি আক্রমণ-কেন্দ্র।

—আমি যদি বলি মগধ-সম্রাট্ আমাদের অগ্রগতিকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করছেন।

—তাও বলতে পারেন। আমি কোন বিতর্ক করবো না, আমি শুধু আপনাকে এইটুকু বলতে চাই যে অবিলম্বে ভরতপুর দখল না করলে আপনার উত্তরাপথ জয়ের স্বপ্ন কল্পনার বিলাস মাত্র হবে!

—উত্তরাপথ জয়ের স্বপ্ন !—মিনান্দারের চোখ দুটি কুঁচকে উঠলো।

সুমতিসেন কিন্তু এতটুকু ভয় পেলেন না, বললেন—যদি পাটলিপুত্র জয় করতে না পারলেন তা হ'লে সুদূর কপিশা থেকে মথুরা অবধি আপনার আসার কি প্রয়োজন ছিল সম্রাট্? আলেকজান্দার পঞ্চনদ থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, ব্যাকত্রিও-আন্তিওকাস কুরুক্ষেত্রের উষরতা অতিক্রম করতে ভয় পেয়েছিলেন, আর আপনি ভরতপুর পর্যন্ত এসে যদি ফিরে যান তা হ'লে যারা গ্রীক জাতিকে দিগ্বিজয়ী বলে মনে করে তারাই বলবে গ্রীকেরা ভীরু, সত্যিকারের বড় শক্তির সামনে দাঁড়াবার মত সাহস তারা রাখে না।

সুমতিসেন চুপ করলেন। মিনান্দার, দিমিত্রিয়াস ও আন্তিওকাস কিছুক্ষণ কেউ কোন কথাই বললেন না। সমস্ত বস্ত্রাবাস থম্ থম্ করতে লাগলো। সুমতিসেন শুধু দেখতে লাগলেন তাঁর বক্তৃতা গ্রীক সম্রাটের মনের উপর কি প্রতিক্রিয়া করছে।

কয়েক পল পরে মিনান্দার নিজেই কথা বললেন,—তুমি চাও আমি ভরতপুর জয় করি এবং পাটলিপুত্র আক্রমণ করি? কিন্তু তা'তে তোমার লাভ?

সুমতিসেন হাসলেন, বললেন,—আমার লাভের কথা তো আপনাকে বলেছি সম্রাট্। আমি চাই প্রতিহিংসা। বীরসিংহের দু'টী চোখ উপড়ে নিয়ে পথে ছেড়ে দেব, অন্ধ ভিক্ষুকের মত সে ভিক্ষা করবে, সেইদিন আমার ভ্রাতৃহত্যার তর্পণ হবে। আপনি ভরতপুর জয় করলে সেইটাই হবে আমার লাভ। আর পাটলিপুত্রের ব্যাপারে সম্রাট বৃহদ্রথের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে যে, যখন তাঁর দরবারে বীরসিংহের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃহত্যার অভিযোগ

করেছিলাম, তিনি প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থাই করেন নি। যিনি প্রজাপুঞ্জের উপর সুবিচার করতে পারেন না, সেই সম্রাট্ থাকা না-থাকায় আমাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। মিনান্দার বোধ হয় সব ব্যাপারটা নিজের মনের মাঝে তোলাপাড়া করে নিলেন; তারপর বললেন,—তুমি ভরতপুর দুর্গ জয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও?

—সাহায্য নয় সম্রাট্, আমি দুর্গ জয় করে দেব। সামান্য দশ হাজার মাত্র সৈন্য পেলেই চলবে। শুধু বীরসিংহকে আমি জীবন্ত ধরতে চাই।

—মাত্র দশ হাজার সৈন্য? বেশ। কবে তুমি আক্রমণ করতে চাও?

—আপনার সৈন্য ও সেনানায়ক প্রস্তুত থাকলে আজ এখনই যাত্রা করতে পারি। শুভস্য শীঘ্রম্। ভালো কাজে অযথা বিলম্ব করা আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ।

—দিমিত্রিয়াস, সেনানায়ক লিওনিদাসকে এখনই দশ হাজার সৈন্য সহ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশ কর গে! আর আন্তিওকাস, তুমি এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে যাবে। যদি ব্রাহ্মণ কোন রকম বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করবে।

দু' দণ্ডের মধ্যে সম্রাট্ মিনান্দারের আদেশ পালিত হ'ল। রাত্রির অন্ধকারে সুমতিসেনের নেতৃত্বে দশ হাজার গ্রীক্ সেনা ভরতপুরের পথে যাত্রা করলো।

নয়

ভরতপুরের দুর্গ-প্রাকারের পাশে প্রায় পাঁচ হাজার আয়ুধী ও ধানুকী সমবেত হয়েছেন। চাঁদ তখনও ওঠে নি, কালো ছায়ায় মানুষগুলি একটি জমাট কালো পাথরের মত। সেই কালো পাথরের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে এক কণ্ঠস্বর, দুর্গাধিপ রাজা কুমারসেন তাদের মধ্যে বক্তৃতা করছেন: অতর্কিতে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হ'বে, সবার আগে আমরা আয়ত্তে আনবো রণহস্তীগুলিকে, তা হলেই রথ ও অশ্বদলকে আয়ত্তে আনতে আমাদের মোটেই কষ্ট হবে না। ওই বিরাট রণসম্পদ আমাদের হাতে এলে মিনান্দারকে চরম আঘাত হানতে আমরা পারবো, যবনবাহিনীকে উত্তরাপথের

সীমা পার করে দিয়ে আসতে পারবো। আজকের এই মহাযাত্রা সেই বিরাট সম্ভাবনার সূত্রপাত মাত্র। এর মধ্যে পরাজয়ের কোন স্থান নেই, ফিরে যাবার কোন পথ নেই, শুধু সামনের পানে এগিয়ে চলতে হবে। হয় জয়, নাহয় মৃত্যু। জয়ের চেয়ে এখন মৃত্যুর সম্ভাবনাই বেশী, সেইজন্যই যারা মরতে চাও তারাই আজ আমার সহগামী হও—আমি থাকবো তোমাদের সবার আগে!

পিছন থেকে কে একজন সাড়া তুললো—জয় রাজা কু……

—হিস্‌স্‌ –সবাই তাকে থামিয়ে দিল।

কুমারসেন বললেন—সাড়া তুলে সবাইকে আজ জানাবার কিছু নেই। জয়ধ্বনি তুলবে সেইদিন যেদিন আমরা যবনবাহিনীকে ভারতভূমি পার করে দিয়ে আসতে পারবো।

রাজা অগ্রসর হলেন। কালো পাথরও এগিয়ে চললো তাঁর পিছনে।

কিছুদূর গিয়ে কুমারসেন এক অশথ গাছের নীচে এসে থামলেন। পার্শ্ব-রক্ষী একটা মশাল জ্বাললো। পাশে একখানি পাথর পড়েছিল। বড় পাথর, কতজন কত সময় সেখানে এসে বসেছে। চারজন জোয়ান সেই পাথরখানি ঠেলে একপাশে সরালো। নীচে দেখা গেল সুঁড়িপথের সিঁড়ি নেমে গেছে। মশালধারী আগে নামলো, তারপর কুমারসেন, ও তাঁর পিছনে একে একে অপর সকলে অগ্রসর হ'ল।

পাথরের পথ। স্যাঁতসেঁতে ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। অনেক দিন সে পথে মানুষ চলে নি, পা ফেললেই তা বোঝা যায়। কোন সময় একা কেউ সে পথে নামলে, বারেক হয়তো থমকে দাঁড়াতো, ক্ষণেকের জন্য হয়তো অনুভূতিকে সবল করে নেবার চেষ্টা করতো। আজ শত সহস্রের পদধ্বনি সুঁড়িপথকেই প্রতিধ্বনিত করছে, সুঁড়িপথটা যেন দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠে হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করছে।

প্রায় আড়াই দণ্ড পরে কুমারসেন আবার আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালেন পাহাড়ের পাদদেশে। দুর্গের প্রাকার তখন অনেক পিছনে, মাথার উপর মশাল নিভিয়ে ফেলা হ'ল, সোজা মাঠের উপর দিয়ে কুমারসেন অগ্রসর হলেন। দলটি যেমন ভাবে সুঁড়িপথ দিয়ে নেমে এসেছিল, তেমনি দীর্ঘ সরীসৃপের মত দুর্গেশের অনুসরণ করে চললো।

দলের শেষে একজন চলছিল একা, সহসা তার পায়ে কিসের যেন একটা আঘাত লাগলো, দু'পা খুঁড়িয়ে এসেই সে একটা গাছের আড়ালে বসে পড়লো। অন্ধকারে কেউ তাকে লক্ষ্যই করলো না। দলটা যখন বেশ কিছুদূর চলে গেছে বলে মনে হ'ল তখন সে উঠে দাঁড়ালো, চারিপাশে নিরীক্ষণ করে নিয়ে যে পথে এসেছিল দ্রুতপদে সেই পথেই ফিরে গেল। দুর্গ-প্রাকারকে বাঁয়ে রেখে লোকটা দ্রুত পদক্ষেপে মাঠ পার হয়ে দুর্গদ্বারের নীচে এসে দাঁড়ালো। তখন রাত তৃতীয় প্রহরের শিয়াল ডাকছে।

এক গাছের নীচে একটা ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়ালো, মৃদুস্বরে ডাকলো—বিক্রম!

দলত্যাগী তার কাছেই এলো, বললো—দ্বিতীয় প্রহরে রাজা সসৈন্যে দুর্গ ছেড়ে চলে গেছেন।

—উত্তম।

—আমার পুরস্কার?

—এখন নয়, দুর্গে প্রবেশ করার পর তোমার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

বিক্রম ছায়ামূর্তির অনুসরণ করলো।

অদূরে একটি ঘোড়া চরছিল, ছায়ামূর্তি সেই ঘোড়ার উপর উঠে বসলো, বললো—বিক্রম, তুমি দুর্গদ্বারে অপেক্ষা কর গে, আমি প্রভাতের আগেই আসছি!

বিক্রম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ছায়ামূর্তি অন্ধকারে অদৃশ্য হ'ল। ঘোড়ার পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

ছায়ামূর্তিটা আমাদের পূর্বপরিচিত সন্ন্যাসীর। দুর্গ থেকে প্রায় যোজন খানেক দূরে গ্রীক বাহিনীকে অপেক্ষা করতে বলে তিনি এসেছিলেন সংবাদ সংগ্রহের জন্য।

দশ

প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী দুর্গদ্বারে উপনীত হলেন, পিছনে লিওনিদাস ও গ্রীক বাহিনী। দুর্গের প্রধান তোরণ বিশেষ কারণ না থাকলে উন্মুক্ত করা হ'ত না, প্রভাতে ফটকের একটা গবাক্ষ খুলে দেওয়া হ'ত মাত্র,

সেই পথেই দু'চার জন লোক যাতায়াত করতো। পিছনে সৈন্যবাহিনী দেখে দ্বাররক্ষী সেই গবাক্ষও রুদ্ধ করে দিল। সন্ন্যাসী দ্বারে করাঘাত করে উচ্চকণ্ঠে বললেন—আমি শত্রু নই, রাজগুরু! গ্রীক দূতকে আমি সঙ্গে এনেছি। এই দেখ রাজা কুমারসেনের নামাঙ্কিত সর্পমুদ্রা!

এবার গবাক্ষ-দ্বার ঈষৎ খুললো, রক্ষী চোখ দু'টী বের করে বললো—দেখি রাজার মুদ্রা?

সন্ন্যাসী হাতখানি এগিয়ে ধরলেন, অঙ্গুরীয়ে সর্পমুদ্রা অঙ্কিত একখানি নীলা রক্ষীর সামনে দীপ্যমান হয়ে উঠলো! রক্ষী জিজ্ঞাসা করলো—ক'জন যাবে?

—গ্রীক দূত আর তার চারজন অনুচর।

—দূতের সঙ্গে অত সৈন্য কেন?

—আমিও এই কথা ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এটা ওদের আচার। দূতের সঙ্গে সৈন্য পাঠিয়ে ওরা শত্রুদেরকে নিজেদের জৌলুষ দেখায়।

—উত্তম, আপনারা ভিতরে আসুন।

সন্ন্যাসী ইঙ্গিত করলেন। লিওনিদাস চারজন পার্শ্বরক্ষী নিয়ে এগিয়ে এলেন। গবাক্ষ খুলে গেল, ছ'জন ভিতরে প্রবেশ করলো। দ্বাররক্ষী ছিল মাত্র চারজন। ভিতরে প্রবেশ করেই গ্রীক সৈন্য তাদেরকে আক্রমণ করলো। অতর্কিত আঘাতে চারজনই ধরাশায়ী হ'ল। সাধারণ নাগরিক যারা কাছাকাছি ছিল তারা প্রাণভয়ে দৌড় দিল। লিওনিদাস লৌহফটক উন্মুক্ত করে দিল। গ্রীক বাহিনী হুড়মুড় করে এসে ঢুকলো দুর্গের মধ্যে।

প্রভাতী রোদ তখনও ঘাসের উপর শিশিরের বুকে চিক্ চিক্ করছে, দুর্গনগরীর তখনও রীতিমত তন্দ্রা ভাঙ্গে নি, রাত্রিশেষের আবেশ দুর্গবাসীদের তখনও আবিষ্ট করে রেখেছে। হঠাৎ বৈদেশিকদের সোরগোলে তারা চমকে উঠলো। কিন্তু অবস্থা ভালোমত বুঝবার আগেই, দুর্গের সমস্ত পথে-ঘাটে গ্রীক বাহিনী ছড়িয়ে পড়লো, মহোল্লাসে বিপণি লুণ্ঠণ করতে সুরু করলো। প্রভাতের শান্তি বীভৎস হয়ে উঠলো।

দুর্গকেন্দ্রে দুর্গেশের প্রাসাদ।

সবার আগে সন্ন্যাসী সেই প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলো। সুমতিসেন স্নান সেরে মন্দিরে পূজায় বসেছিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যে বাহিরে যে এত ব্যাপার ঘটে গেছে তা তিনি টের পান নি। হঠাৎ মন্দির-দ্বারে বহুকণ্ঠের

সোরগোল শুনে তাঁর ধ্যান ভাঙলো, ফিরে দেখেন গ্রীক বাহিনী। তাদের মুখপাত্র হিসাবে সন্ন্যাসী এগিয়ে এলেন, বললেন—গ্রীক সম্রাট্ মিনান্দারের নামে আমি তোমাকে বন্দী করলাম।

—আপনি, গুরুদেব ?

—আমি গুরুদেব !—হাহাঃ করে সন্ন্যাসী হেসে উঠলেন, সজোরে নিজের দাড়ী ধরে টানলেন। দাড়ী-গোঁপ উপড়ে এলো। সুমতিসেন চমকে উঠলেন, বলে উঠলেন—বীরসিংহ !

—হ্যাঁ, এত দিনে অপমানের প্রতিশোধ নিলাম !

এক'শো আট বেলপাতা দিয়ে আজ আর ভৈরবের পূজা সম্পন্ন করা হ'ল না, সুমতিসেনকে গ্রীক-বাহিনী শৃঙ্খলাবদ্ধ করলো।

অন্তঃপুরে কিন্তু গ্রীক বাহিনী এত সহজে প্রবেশ লাভ করতে পারলো না। সুমতিসেনকে বন্দী করে প্রাসাদে প্রবেশ করতে গিয়ে তারা দেখলো উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে মেয়েরা সব দ্বার রক্ষা করছে। তাদের অগ্রবর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাজভগিনী কুমারী মালবিকা।

বীরসিংহকে দেখেই মালবিকা চিনতে পারলেন, চোখে-মুখে ঘৃণা ফুটে উঠলো, বললেন—চমৎকার বীরসিংহ, এতদিনে তুমি সত্যিকারের জাতির সেবা করলে !

বীরসিংহ সে কথার উত্তরে হাতের অঙ্গুরীয়টি খুলে মালবিকার কাছে ছুঁড়ে দিলে, বললো—এই আংটিটা দেখলেই বুঝতে পারবে আমি তোমাদের বন্ধু কি শত্রু !

পার্শ্বরক্ষিণী একটি মেয়ে আংটি কুড়িয়ে মালবিকার হাতে দিল, আংটির উপর সর্পমুদ্রাটি দেখে মালবিকা বিস্মিত হ'ল।

বীরসিংহ বললো—রাজা কুমারসেনের নির্দেশনামা সর্পমুদ্রাঙ্কিত আংটি দেখলে ? রাজপ্রদত্ত অধিকার-বলে আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, অস্ত্র পরিত্যাগ কর, অনাবশ্যক রক্তপাত করার কোন প্রয়োজন নেই। এতেই তোমাদের কল্যাণ হবে, সমগ্র আর্যাবর্তের কল্যাণ হবে। রাজা কুমারসেন বহু পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সংগ্রাম এখন নিষ্প্রয়োজন, সেই জন্যই গত রাত্রে তিনি বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে দুর্গ ত্যাগ করে গেছেন।

কুমারসেনের দুর্গত্যাগের কথা গোপন ছিল, তা'ও যখন বীরসিংহ জানে

তখন রাজার আদেশে আর সন্দেহ করার মত কিছু রইল না। মালবিকা অস্ত্র ত্যাগ করলেন। পরক্ষণেই গ্রীকেরা মালবিকাকে বন্দী করলো। হেসে বীরসিংহ বললেন—মালবিকা, কুমারসেন একদিন আমাকে সভার মাঝে অপমান করেছিল, আজ তার প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হ'ল। এবার দেখবো তোমাদের বংশগৌরব কোথায় থাকে!

মালবিকা এবার চক্রান্তটা বুঝলেন, কিন্তু তখন তো আর হাতে অস্ত্র নেই!

এগারো

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঠিক যেখান থেকে দুর্ভেদ্য বন শুরু হয়েছে সেখানে এক গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ভিক্ষু নাগসেন বসেছিলেন। এমন নীরব, নিথর হয়ে তিনি পাহাড়ের পানে তাকিয়েছিলেন যে নিস্পন্দ সেই মানুষটিকে বনপ্রান্তের আরেকটি গাছ বলে ভুল হতে পারে। এই মাত্র সূর্য উঠলো, সোনালী রোদ পাহাড়ের মাথায় ভরতপুরের দুর্গের গায়ে এসে আছড়ে পড়েছে, নীচের বনভূমিতে সে রোদ এখনও নামেনি। রৌদ্ররেখার সেই তির্যক গতির পানে তাকিয়ে নাগসেন কত কি ভাবছিলেন। কোন এক সময়ে টিয়াপাখীর একটি ঝাঁক এসে নামলো তাঁর সামনে, তাদের ডানার ঝাপটায় নাগসেনের ধ্যান ভাঙলো, ধীরে ধীরে তিনি উচ্চারণ করলেন—ওঁ শ্রীমণিপদ্মে হুঁ, ওম্!

পাখীর দল কলরব তুলে ঘাসের বীজ সংগ্রহ করছিল। নাগসেনের কি যেন মনে হ'ল, ভিক্ষাপাত্রটি টেনে নিলেন পাশ থেকে। পাত্রে কিছু চিপিটক ছিল সেগুলি মুঠো মুঠো ক'রে ছড়িয়ে দিলেন পাখীগুলির সামনে। পাখীরা প্রথমে খানিক ভয় পেয়েছিল, তারপর কলরব করে ঝাঁপিয়ে পড়লো চিঁড়ে খেতে। নাগসেনের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, তিনি ধীরে ধীরে আবার উচ্চারণ করলেন—ওঁ শ্রী মণিপদ্মে হুঁ, ওম্!

[illegible] পাশের বনভূমিতে কিসের যেন একটা শব্দ শুনে নাগসেন মুখ [illegible] চোখে পড়লো এক নরমূর্তি পাহাড়ের গা বেয়ে বনানীর আড়াল [illegible] আসছে। মানুষটি তাঁরই দিকে আসছে।

[illegible] হয়ে চারিপাশে একবার ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মানুষটি কাছে

এলো। এক কিশোর বালক। কম্পিতকণ্ঠে সে নাগসেনকে বললো,—স্থের ওরা রাজবাড়ী দখল করেছে, নগর লুঠ করছে……

—কারা?

—যবন,—যবনেরা! হিমালয়ের ওদিকে যাদের বাড়ী। বীরসিংহ তাদেরকে ডেকে এনেছে। কাল সন্ধ্যাবেলা তারা চুপি চুপি এসে দুর্গ দখল করেছে। আমি এক গাছের উপর উঠে লুকিয়ে ছিলাম, মাঝরাতে চুপি চুপি দুর্গপ্রাকার পার হয়ে পালিয়ে এসেছি।

বালকের বয়স বছর চৌদ্দের বেশী হবে না, পথশ্রমের ক্লান্তিতে সে থর থর করে কাঁপছিল, হাঁপাচ্ছিল। নাগসেন তার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বললেন,—বসো, তুমি বড্ড শ্রান্ত হয়ে পড়েছ।

ছেলেটী বসে পড়লো, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো,—বেশীক্ষণ বসলে তো চলবে না থের, আপনি এখনই একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। মহারাজ নগরের বাহিরে কোথায় যেন গেছেন, রাজার ভাই আর রাজার বোনকে ওরা হাতে-পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধেছে, আজই হয়তো তাদেরকে মেরে ফেলবে। নগরের কত লোককে কাল রাত্রেই খুন করেছে। আপনি একটা কিছু করুন। ওরা যবন, ওরা ভয়ানক পাজী, ছেলেবুড়ো সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে দেয়, আমার মা-বাবা ভাই-বোনকেও ওরা নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে।*

নাগসেন ধীরে ধীরে তাকে শান্ত করলেন, কয়েকটি প্রশ্ন করে জেনে নিলেন রাত্রির ঘটনা, তারপর বললেন,—চল, আমিই যাই।

বালকের চোখে দু'টি বড় বড় হ'য়ে উঠলো, বললো,—আপনি একা গিয়ে কি করবেন? আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, আপনার ঢাল-তরোয়াল কই? ওদের কত সৈন্য, ঢাল, তরোয়াল, বর্শা! আপনি খালি হাতে কি করবেন তাদের সঙ্গে?

নাগসেন হেসে বললেন,—বীরসিংহ আমার খুব জানা-চেনা লোক, আমি তাকে গিয়ে বললেই হয়তো কাজ হবে।

*সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা লুপ্ত হয়। অবশ্য এ প্রথা ব্যাপক ভাবে এদেশে কোনদিন ছিল কিনা সন্দেহ।

বালকের চোখে সন্দেহ দেখা দিল। নাগসেন তার মনের কথা বুঝলেন, হেসে বললেন,—ভগবান্ বুদ্ধদেব কি বলেছিলেন জান তো ?—

ন হি বেরেণ বেরাণী সম্মন্তীধ কুদাচনম্।
অবেরেণ চ সম্মন্তি এসো ধম্মো সনন্তনো॥

[শত্রুতা দিয়ে কখনও শত্রুকে জয় করা যায় না, সম্প্রীতি দিয়ে শত্রুর মাঝে মিত্রভাব জাগাতে হয়—ইহাই মানবধর্ম !—ধর্মপদ]

তবু বালক বললো,—মহারাজকে একবার খবর দিলে হ'ত না ?

—তোমাদের মহারাজ কোথায় গেছেন, তা তো জানি না ভাই।

নাগসেন উঠে দাঁড়ালেন, শান্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন,—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

বালক অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাগসেনের সঙ্গী হ'ল। বনভূমি পার হয়ে দুর্গে যাবার সদর পথ ধরে তাঁরা পাহাড়ে উঠতে সুরু করলেন।

বারো

তখনকার দিনে প্রাচীর ঘেরা নগরীর দ্বার সন্ধ্যা থেকে সকাল অবধি বন্ধ রাখাই রীতি ছিল। সূর্যাস্তের পর নগরে প্রবেশ করা বা নগর থেকে বাহির হওয়া নেহাৎ সহজ ছিল না। তবে সূর্যোদয়ের পূর্বেই নগর-তোরণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হ'ত এবং নাগরিকেরা যদৃচ্ছ যাতায়াত করতে পারতেন। কিন্তু আজ ভরতপুরে এর ব্যতিক্রম ঘটলো, গ্রীক সেনারা ফটক বন্ধ রেখে, গবাক্ষে গবাক্ষে পাহারা দিচ্ছিল। বালকের হাত ধরে গবাক্ষের সামনে এসে যখন নাগসেন উপস্থিত হলেন, তখন নগরে প্রবেশ করতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হ'ল। গ্রীক সেনারা তাঁদের কোন কথাই বুঝলো না, তাদের দু'জনকে পাকড়াও করে তারা নিয়ে গেল অধিনায়কের কাছে। নায়ক দু'চারটে মাগধী কথা বুঝতেন, নাগসেনের মুখে রাজা ও সেনাপতি কথাটা বার বার শুনে, নায়ক তাঁদের দু'জনকে নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামালেন না, বরাবর পাঠিয়ে দিলেন সেনাপতি লিওনিদাসের কাছে।

লিওনিদাসের সঙ্গে বীরসিংহও ছিলেন, নাগসেনকে দূর থেকেই তিনি আসতে দেখেছিলেন। এগিয়ে এসে পদধূলি গ্রহণ করলেন, বললেন,—ভালই হয়েছে, আজ এখানে আপনি এসে পড়েছেন। এই দুর্গ কাল আমরা

জয় করেছি। একদিন সেন বংশের সামন্তেরা এখান থেকে আমাদের বিতাড়িত করেছিল, আজ তাদের বিতাড়িত করে আমি আমার বংশগৌরব পুনরুদ্ধার করলাম। আপনি আমার রাজ্যাভিষেকের হোতা হবেন।

নাগসেনের কাছ থেকে হাঁ না একটা কিছু উত্তর শোনার জন্য বারেক তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন, কিন্তু সেদিক্ থেকে যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন বললেন—সেন বংশের উপর অবিচার করার তেমন ইচ্ছা আমার নেই, মালবিকাকে বিয়ে করে আমি অগ্র-মহিষীর অধিকার দেব, সম্ভবতঃ তা হলেই সেনেদের সঙ্গে আমাদের বংশগত বিরোধ আর থাকবে না।

এবার নাগসেন কথা বললেন,—মালবিকা কি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে ?

—তাকে এখনও এ কথা জিজ্ঞাসা করি নি।

—জিজ্ঞাসা করলে সে কিছুতেই রাজী হতে পারবে না। বিদেশী শত্রুকে যে নিজের ঘরে ডেকে আনে, তাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করা কোন ভারতীয়ার পক্ষে সম্ভব নয়।

লিওনিদাস সব শুনছিলেন, এ দেশে দীর্ঘদিন থাকার জন্য কিছু কিছু মাগধী তিনি শিখেছিলেন, এবার তিনি প্রশ্ন করলেন—বিবাহ কার ?

বীরসিংহ বললেন,—কাল এখানে যে রাজকুমারীকে আমরা বন্দী করেছি তাকে আমি বিয়ে করবো ?

—সম্রাটের অনুমতি পেয়েছেন ?

—এ বিবাহে সম্রাটের অনুমতি চাই কেন ? এ তো কোন যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপার নয়।

—কিন্তু আমি ও মেয়েটিকে সম্রাটের কাছে পাঠাবো বলে স্থির করেছি।

—সম্রাটের কাছে পাঠাবেন।

—হ্যাঁ। রাজবংশের কাউকে বন্দী করলে সম্রাটের কাছে পাঠানোই রীতি। ভাই বোন দু'জনকেই আমি পাঠাবো। ইচ্ছা করলে আপনিও যেতে পারেন ওদের সঙ্গে। সম্রাট্ যদি অনুমতি দেন একেবারে বিবাহ করে ফিরে আসবেন।

বীরসিংহ বিচলিত হলেন, বললেন,—এতে সম্রাট্ কোন আপত্তি করবেন না বলেই আমার মনে হয়।

—না করলে ভালই।

—এক সময় মালবিকার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হয়েছিল। আমি বলি কি, বিবাহ করেই না হয় সম্রাটের কাছে যাই ?

—সে অবসর পাচ্ছেন কোথা? আজই তো ওরা যাত্রা করবে।

বীরসিংহ বুঝলেন কূটনীতিতে লিওনিদাসের কাছে তিনি হেরে গেলেন; তাঁর মুখখানি কালো হয়ে উঠলো। লিওনিদাস বাঁকা হাসি হেসে বললেন,—আপনার শঙ্কার কোন কারণ নেই। এত বড় দুর্জয় দুর্গ আপনি বিনা রক্তপাতে জয় করে দিয়েছেন,—আমাদের রাজ্যবিস্তারে সাহায্য করছেন, কাজেই সম্রাট্ আপনাকে নিশ্চয়ই খুসি করবেন। এ দেশ জয় করতে হ'লে আপনাদের মত লোককে হাতে রাখা প্রয়োজন তো!

বীরসিংহ সহসা কোন কথা বলতে পারলেন না।

নাগসেন এবার কথা বললেন,—আমার একটা নিবেদন আছে সেনাপতি, আপনার সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের, এদের সঙ্গে আমিও তাঁর কাছে যেতে চাই। আপনি আপত্তি করবেন না।

—আপনার পরিচয় জানতে পারি কি ?

—আমি একজন ভিখারী মাত্র, অবসর সময় ধর্মসূত্র নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করে থাকি। আমাকে ভয় করার মত কিছু নেই।

লিওনিদাস এবার সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিলেন। এই ধরণের মানুষগুলিকে ইতিপূর্বে তিনি বহুবার দেখেছেন। বললেন,—বেশ, আপনি ইচ্ছা করলে এদের সঙ্গে যেতে পারেন, আর একটু পরেই এঁরা যাত্রা করবেন।

—আমি এখনই প্রস্তুত!

দ্বিতীয় প্রহরে সহস্র অশ্বারোহী গ্রীক-সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে একখানি পাল্কী ভরতপুরের নগর-তোরণ অতিক্রম করলো। পাল্কীতে ছিলেন মালবিকা। পাল্কীর পিছনে এক ঘোড়ার পিঠে বাঁধা ছিলেন রাজভ্রাতা সুমতিসেন, আগে আগে যাচ্ছিলেন বীরসিংহ ও নাগসেন। ধূলা উড়িয়ে, পার্বত্যভূমিতে প্রতিধ্বনি তুলে বন্দীদের ঘিরে সৈনিকেরা অগ্রসর হ'ল।

স্তব্ধ নাগরিকেরা তাকিয়ে রইলেন নির্বাক্ হয়ে। দ্রুত উপত্যকার আড়ালে বনানীর প্রান্তে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

পথের শেষে বনানীর আড়ালে একজন যুবক এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, পাহাড়ের উপর পথ ধূলিসমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে দেখে সে তাড়াতাড়ি একটি গাছে উঠে পড়লো। গ্রীক বাহিনী তার পাশ দিয়ে চলে গেল, পাতার আড়াল থেকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব পর্যবেক্ষণ করলো, তারপর গাছ থেকে নেমে অদৃশ্য হ'ল নিবিড় বনের মাঝে।

তেরো

সম্রাট্ বৃহদ্রথের উপঢৌকন চলেছে মগধ থেকে মাধ্যমিকায়। সবলের কাছে দুর্বলের উপঢৌকন, অর্থাৎ ঘুষ। যুদ্ধভীত বৃহদ্রথ দুর্দান্ত রণকুশলী মিনান্দারকে ঘুষ পাঠাচ্ছেন, যেন সে মগধ সাম্রাজ্য আর আক্রমণ না করে। উত্তর ভারতে সে তো বহুদূর এসেছে, আর যেন না আসে। যা গেছে তার জন্য মগধ সম্রাটের দুঃখ নেই, ছেলেবেলায় তিনি নীতিশাস্ত্রে পড়েছেন —'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতাঃ।' সেই জন্যই কিছুদিন পূর্বে একবার তিনি ভেট পাঠিয়েছিলেন। তা তেমন কার্যকরী হয় নি তবু তিনি আবার ভেট পাঠাচ্ছেন—এখনও তিনি আশা রাখেন।

নন্দরাজারা কলিঙ্গের শ্রীক্ষেত্র থেকে যে দীর্ঘ পথ রচনা করেছিলেন, পুরুষপুর পার হয়ে হিন্দুকুশ পর্বতমালাকে পাশ কাটিয়ে পারদ রাজ্যের সীমান্ত অবধি, সেই পথে চলেছে রণহস্তী নিয়ে যূথপাল, যুদ্ধাশ্ব নিয়ে অশ্বপাল, শত সুবর্ণবাহী অশ্ব-শকট, আর তাদের তত্ত্বাবধায়ক পশুকল্যাণ-সচিব, উপবলাধ্যক্ষ, সান্ত্রী, ভাণ্ডারিক, সরণি-মাণ্ডলিক, পশু-চিকিৎসক, আরো আনুসঙ্গিক কত কি! দীর্ঘ আধ ক্রোশব্যাপী মিছিল চলেছে। কত জনপদের কত কৌতূহলী জনতা ভীড় করেছে পথের পাশে, কত বৃদ্ধ ও নারী শঙ্কিত হয়েছে ভাবী যুদ্ধের শঙ্কায়। তাদেরই সামনে দিয়ে তাদেরই রাজস্বে পুষ্ট ও প্রতিপালিত পশুদল চলেছে শত্রুর শিবিরে।

পুরাণো আর্যাবর্ত্ত। দু'হাজার বছর আগের মধ্যভারত। শ্রীহীন বালুকণার উষরতা তখনও মরুভূমির সৃষ্টি করে নি। ওয়াহিন্দা নদী বহু শাখা-প্রশাখা নিয়ে তখন রাজপুতনার ভিতর দিয়ে প্রবাহমানা। নদীর

স্বচ্ছ তোয় ধারাল তলোয়ালের মতই স্বচ্ছ। বর্ষার দিনে দু'পাশের পার্বত্য উপত্যকা থেকে জলস্রোত নেমে এসে ওয়াহিন্দা নদীর বুকে ঢল জাগায়। সেই নদীর তট ধরে প্রশস্ত পথ সুকেত থেকে গান্ধার অবধি চলে গেছে। সম্রাট্ প্রিয়দর্শীর মঙ্গল-সচিবদের রোপিত বড় বড় গাছ নদীতটে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পথচারীদের শ্রমশান্তির ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে। শ্যামলিমার স্নিগ্ধতা তখনও রাজপুতনার মরুভূমির মধ্যে লুপ্ত হয় নি।

যুগ থেকে যুগান্তর। শত থেকে সহস্র বর্ষ। কপিশ, কারুষ, কান্দাহারের পথে শক, হূন, পারদ এসেছে এই নদীতটে। আক্রমণ, সংগ্রাম ও লুণ্ঠনে বিদেশী ও বিধর্মীরা সমাজ-জীবনকে বার বার বিপর্যস্ত করেছে। জনপদ পরিত্যক্ত হয়েছে। বিপন্ন জনগণ পাহাড়ের অন্তরালে আত্মরক্ষা করেছে। বংশপরম্পরা ক্রমে তারা জংলী বনে গেছে। যারা তা পারে নি, বিদেশীর অন্তরঙ্গতা তারা মেনে নিয়েছে। দুই জাতি এসে মিশেছে। বসুমিত্র, বজ্রপাণি, সুমতিসেন, হর্ষবর্ধন হয়েছে সুন্দর সিং, ভকত সিং, পরতাপ সিং। কালস্রোত ধীরে ধীরে মাটির রূপ আর তার মানুষকে রূপান্তরিত করেছে। শ্যামলিমা যতই ধূসর হয়েছে মানুষের মনও তত কঠোর হয়েছে। জীবন-যাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য দেহকেও তিলে তিলে কঠিন করেছে।

কিন্তু আমাদের এ কাহিনী তার পূর্ব যুগের। মগধ সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপ যখন ক্ষীয়মাণ, বিলাসের আকাঙ্খা যখন রাজবীর্যকে ম্লান করেছে। সেই সুযোগে এই ওয়াহিন্দার তট ধরেই মিনান্দার এগিয়ে এসেছে। সেই পথেই চলেছে মগধ-সম্রাটের উপঢৌকন—মগধ থেকে মাধ্যমিকা। সঙ্গে আছেন পুষ্যমিত্র ও বজ্রাচার্য।

চৌদ্দ

জঙ্গল-সমাকীর্ণ পাহাড়ের বুকে বনবাসীদের কয়েকটি কুটীর।

পল্লীর শেষ প্রান্তে ঢালু পাহাড়টি যেখানে উঁচু হয়ে উঠেছে সেখানে একক একখানি ঘর। চালার মাথায় একটি ত্রিশূল ইঙ্গিত করছে সেটি একটি দেবস্থান। সাধারণতঃ এমন মেটে ঘরে কেউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে না, তবে দরিদ্র বন-বাসীদের মধ্যে এটা কিছু অসম্ভব নয়।

মন্দিরের মধ্যে ছোট একটি কালীমূর্তি। সামনে উপবিষ্ট গৌরকান্তি

এক ব্রাহ্মণ। পূজার উপকরণে কোন নৈবেদ্যের আড়ম্বর নেই, একটি কোশাকুশিতে জল আর কয়েকটী জবাফুল মাত্র। ব্রাহ্মণ তদ্গতচিত্তে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন আর এক-একটি জবাফুল মায়ের চরণে অর্পণ করছেন :

"ন বালা ন চ ত্বং বয়স্থা ন বৃদ্ধা,
ন চ স্ত্রী ন ষণ্ড পুমাম্নৈব ত ত্বম্।
সুরো নাসুরো নো নরো বা ন নারী,
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা!"

পার্বত্য অশ্বারোহণে এক যুবক এসে নামলো মন্দিরের সামনে, পূজারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো. কিন্তু ব্রাহ্মণ তখন এতই তন্ময় যে বাহিরের বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর কোন চেতনাই ছিল না। আগন্তুক কপালের ঘাম মুছে ঘোড়াটিকে একটী গাছের সঙ্গে বাঁধলো, শেষে মন্দির-দ্বারের বাইরে এসে আসন গ্রহণ করলো। পূজারী তখন উচ্চারণ করছিলেন—

"মহাঘোর-কালানল-জ্বালজালা—"

যুবক তাঁর সঙ্গে সুর ধরলেন—

"মহাঘোর-কালানল-জ্বালজালা
হিতাত্যন্তবাসা মহাট্টাট্টহাসা।
জটাভারকালা মহামুণ্ডমালা
বিশালা ত্বমীদৃগভিঃ্যাঃ সেহস্ব॥"

এবার ব্রাহ্মণের একাগ্রতা ভাঙলো। পিছন ফিরে তিনি তাকালেন, যুবককে দেখে হেসে বললেন—জয়স্তু!

যুবক বললো—প্রভু, দু'শো ধানুকী অবিলম্বে প্রয়োজন, এই দণ্ডে। ভরতপুর দুর্গ যবনেরা অধিকার করেছে, দুর্গেশ মণ্ডলেশ্বর সুমতিসেনকে নিহত করে, মাধবসেন ও মালবিকাকে গ্রীকেরা বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি স্বচক্ষে এই পথ দিয়ে তাদের যেতে দেখলাম। এই মুহূর্তে তাদের বন্ধন মোচনের চেষ্টা করতে হবে, বিলম্বে আমরা ব্যর্থ হব।

পূজারী হেসে বললেন—'কর্ম্মনি অধিকারস্তে মা ফলেসু কদাচনঃ!'

তারপর ভিতর থেকে একটি শঙ্খ এনে তা'তে ফুঁ দিলেন। শঙ্খের আকার ছোট হ'লেও তার ধ্বনি তীক্ষ্ণ। পূজারীর বয়স হ'লেও তাঁর কণ্ঠ শুষ্ক হয় নি; ধারাল শঙ্খধ্বনিকে প্রতিবারেই তিনি তীক্ষ্ণতর ক'রে

ফুলনেন। পাখীর কাকলি মুখরিত প্রভাতী শান্তি প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো।

বার কয়েক শঙ্খধ্বনি হবার পরেই বনপথে পদশব্দ জাগলো। চারিপাশ থেকে বনবাসীর দল সমবেত হ'ল। কৃষ্ণকায়, বলিষ্ঠ, সুঠাম চেহারা, কোমরে তুণ, হাতে ধনুক। সকলেরই চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। পূজারী হেসে বললেন —পারবি, যবন শিকার করতে ?

—পরখ্ করুন।

—সবাইকে পরখ্ করতে পারবো না, এখন আমার মাত্র দু'শো জনের প্রয়োজন—ব'লে পূজারী একে একে দু'শো জন তরুণকে নির্বাচন করলেন। যারা বাদ গেল, তাদের মুখ দেখে বোঝা গেল তারা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। পূজারী বললেন—তোমরা ক্ষুণ্ণ হয়ো না, শীঘ্র তোমাদেরকেও প্রয়োজন হবে, তোমরা তার জন্য প্রস্তুত থেকো। সে কাজ আজকের চেয়েও গুরুতর। আজকের কাজ নেহাৎ ছেলেমানুষের কাজ।

পূজারীর দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠলো। নির্বাচিতদের উদ্দেশে তিনি বললেন —ইনি হনুমানগড়ের মণ্ডলেশ্বর পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র। এই মুহূর্তে তোমাদের যাত্রা করতে হবে। ইনিই হবেন তোমাদের অধিনায়ক।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অগ্নিমিত্র সেই দু'শো বনবাসী অনুচর নিয়ে বনপথে যাত্রা করলেন। যাবার বেলা পূজারী মায়ের চরণ থেকে একটী জবা তুলে নিয়ে অগ্নিমিত্রের উষ্ণীষে গুঁজে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, বললেন—রাজপুরুষদের হত্যা করবে না, বন্দী করার চেষ্টা করবে।

পনেরো

অগ্নিমিত্রের কিছু বিলম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। অর্বুদ পাহাড়ের প্রান্তে যখন তারা গিয়ে পৌঁছালো তার পূর্বেই মালবিকাকে নিয়ে গ্রীকেরা মথুরার গ্রীক সেনা-কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছিল। মাত্র দু'শো অনুচর নিয়ে মিনান্দারকে আক্রমণ করা বাতুলতা, অগ্নিমিত্রের পথশ্রমটাই পণ্ডশ্রম হ'ল।

অগ্নিমিত্র যুবক, অনেক আশা করে তিনি ছুটে এসেছিলেন, বিষণ্ণ মনে পাহাড়ের কোলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করাই মনস্থ করলেন।

দুপুরের রোদ চারিপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। দূরের পাহাড়গুলি ধূমেল সাগর-

তরঙ্গের মত দেখাচ্ছে। মাথার উপর নির্মেঘ আকাশের শূন্যতা, নীচে শ্যামল বনানীর ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য। প্রকৃতি দেবীর পরস্পরবিরোধী খেলা। নরম মাটি কোথাও হয়েছে কঠিন পাষাণ, সমতল ভূমি কোথাও-বা আকাশের গায়ে ঠেলে উঠেছে পাহাড়ের রূপে। রুক্ষ রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র, আবার তাকেই আড়াল করে রেখেছে মহীরুহের অসংখ্য পত্রাবলী। হরিণকে দিয়েছেন দ্রুত পলায়নক্ষম পদ, বাঘকে দিয়েছেন তাকে বধ করবার জন্য তীক্ষ্ণ ধারালো নখদন্ত। শাস্ত্রপাণি মানুষকে বিধান দিয়েছেন দয়া, ক্ষমা, সেবা ও ভালবাসা, আর শস্ত্রপাণি মানুষের অন্তরে দিয়েছেন জিঘাংসা, প্রতিহিংসা, পরস্বলোভ। একদিকে দিয়েছেন জীবনের আনন্দ উপভোগ করার অজস্র উপকরণ, আর একদিকে জানিয়েছেন সব ছেড়ে চলে যাবার আহ্বান—মৃত্যু।

অগ্নিমিত্র বসে বসে চিন্তা করেন।

সহসা কে তাঁর কাঁধে হাত রাখলো, অগ্নিমিত্র চমকে উঠলেন।

আগন্তুক বললেন—তুমিই কি বনবাসীদের নায়ক ?

অগ্নিমিত্র সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলেন—আপনি ?

—আমি ভরতপুরের দুর্গাধিপ সুমতিসেন। যবনের কবল থেকে দুর্গ উদ্ধার করার জন্য আমি তোমার সাহায্য চাই।

কথাটা বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু সুমতিসেনের মুখের পানে তাকিয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করতেও পারেন না। কথায় কথায় আলোচনা সুরু হয়।

ষোল

সেদিন প্রভাত থেকেই ভরতপুরের দুর্গ-নগরী লুঠ করতে করতে গ্রীক বাহিনী উল্লাসে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। রাত্রে যখন তারা দিব্য আরামে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন তখন বনপ্রান্তে সকলের অলক্ষিতে গোপন সুড়ঙ্গপথে অগ্নিমিত্র, সুমতিসেন ও তাঁদের অল্পসংখ্যক অনুচর সন্তর্পণে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করলেন।

লুণ্ঠিত নগরী অন্ধকারে বিষণ্ণ, স্তব্ধ। কোন গৃহে আলো নেই, মানুষের সাড়া নেই। মনে হয় গাছের পাতাটি মাটিতে পড়লেও যেন শব্দ শোনা যায়। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন শব্দ-মুখর হয়ে উঠছে, প্রতিধ্বনি তুলছে। ঐ শব্দে এখনি হয়তো গ্রীক সেনাদের তন্দ্রা টুটে যাবে, তারা প্রস্তুত হয়ে শত শত মশাল নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। কৃষ্ণবর্ণ বনবাসীরা সন্তর্পণে গ্রীক সেনানিবাসের দিকে অগ্রসর হয়।

কিন্তু সেনাপতি লিওনিদাস ভারতের প্রাণশক্তিকে ভুল বুঝেছিলেন। জগতের সবচেয়ে প্রাচীন জাতিকে তিনি দেশের ব্যাপ্তিতে বিচ্ছিন্নরূপে খণ্ড খণ্ড করে দেখেছিলেন। এই জাতি উপনিষদ্‌ই লেখে নি, সিংহল থেকে জাপান অবধি জয় করে আমেরিকাতেও উপনিবেশ স্থাপনা করেছিল। * গ্রীকেরা ভেবেছিল দুর্গের প্রবেশপথ যখন রুদ্ধ, দুর্গপ্রাকারের তোরণে তোরণে যখন পাহারা আছে, তখন নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রামের সুখটুকু ভোগ করায় বাধা কি। বিজয়ী মিনান্দারকে প্রতিরোধ করতে পারে এ দেশে এমন মানুষ কোথায়? মগধের সম্রাট যাকে উপঢৌকন পাঠিয়ে সন্তুষ্ট করতে চান তাকে প্রতিহত করার শক্তি আছে কার?

সান্ত্রীরা অন্যমনস্ক ছিল। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। ছুটোপাটির শব্দে গ্রীকদের তন্দ্রা টুটলো। অন্ধকারে শয্যায় উঠে বসে ভালো করে কিছু বোঝার আগেই তাদের ছিন্ন শির মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েক শত গ্রীক-সেনা নির্মূল হয়ে গেল। সুমতিসেন বললেন—শত্রুর শেষ রাখতে নেই। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে জিইয়ে রেখেছিলেন বলেই আজ সেই পথে মিনান্দারের আগমন সম্ভব হয়েছে। আজ যে যবনটিকে জীবিত রাখবে কাল সেই হবে তোমার প্রধান শত্রু। কৃতজ্ঞতা বলে কোন কিছু তুমি ম্লেচ্ছের কাছ থেকে আশা করতে পার না।

কিন্তু লিওনিদাসকে তারা হত্যা করলো না। সুমতিসেন বললেন,—এই সেনাপতিকে বিনিময় করে মালবিকার মুক্তি আদায় করতে হবে!

রাত্রের গোলযোগ শুনেও সন্ত্রস্ত নাগরিকেরা কেউ গৃহের বাহির হয় নি। ঊষাকালে গবাক্ষ খুলে যখন তারা দেখলো শত শত গ্রীক সেনার শব দুর্গের বাহিরে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন তাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। দ্বার খুলে তারা পথে এসে নামলো। চোখে পড়লো দুর্গশীর্ষে উড়ছে মগধের গৈরিক লাঞ্ছন। নাগরিকেরা উল্লসিত হয়ে উঠলো, সমবেত হ'ল প্রাসাদের সামনে। অলিন্দে সুমতিসেনকে দেখে তারা সাড়া তুললো—জয়, মহারাজ সুমতিসেনের জয়!

* আমেরিকার প্রাচীন 'মায়া সভ্যতার' মধ্যে ভারতীয় প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন।

সতেরো

লিওনিদাসের উপহার পেয়ে সম্রাট্ মিনান্দার খুসি হলেন, সভার মাঝে স্বর্ণমুদ্রা ভরা থলিগুলি যখন নামানো হ'ল তখন তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলেন—কত আছে ?

শস্ত্রপাণি উপনায়ক বললেন—আড়াই মণ। ভরতপুরের নবলব্ধ প্রজাদের গৃহ থেকে সম্রাটের প্রণামী স্বরূপ আহরণ করা হয়েছে !

—মাত্র আড়াই মণ! ভরতপুরের নাগরিকেরা তো তা হ'লে বড়ই দরিদ্র !

—আমাদের সৈন্যেরা আরো কিছু সংগ্রহ করেছিল। যুদ্ধ জয়ের পুরস্কার হিসাবে তাদের মাঝেও কিছু কিছু বণ্টনকরে দিতে হয়েছে।

—উপযুক্ত কাজই হয়েছে, লিওনিদাস যোগ্য ব্যক্তি।

মালবিকা, বীরসিংহ ও নাগসেন সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, উপনায়ক পরিচয় দিলেন—ইনি ভরতপুরের রাজভগিনী।

মালবিকা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন, বললেন—আমার নাম শ্রীমতী মালবিকা। বহুদিন ধরে গ্রীক সম্রাট্‌কে দেখবার আকাঙ্খা ছিল, আজ তা পূর্ণ হ'ল।

—বেশ, বেশ। তুমি গীতবাদ্য কিছু জান ?

—সঙ্গীতে হিন্দু নারীর জন্মগত অধিকার সম্রাট্, আপনি ইচ্ছা করলেই আমি সাধ্যমত আপনার কর্ণের তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করতে পারি।

সম্রাট্ তখনই আদেশ করতে যাচ্ছিলেন, মন্ত্রী তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—রাজকুমারী, তুমি আমাদের দেশীয় সঙ্গীত কিছু জানো—গ্রীক সঙ্গীত ?

—না।

—তুমি কিছুদিন অন্তঃপুরে থেকে সেই সঙ্গীত শিক্ষা কর, তা হ'লে শুধু সম্রাট্ নয়, সমবেত আমাদের সকলকে তুমি আনন্দ দান করতে পারবে।

মন্ত্রী ইঙ্গিত করলেন, দৌবারিক মালবিকাকে বাহিরে নিয়ে গেল।

মন্ত্রীর ব্যবহারে সম্রাট ক্ষুন্ন হলেন, মন্ত্রী তা বুঝতে পারলেন, হেসে বললেন—ক্ষুণ্ণ হবেন না সম্রাট্, এই বন্দিনীর আচরণ আমার ভাল লাগে নি। শত্রুপক্ষের শিবিরে বন্দিনী হয়ে এসে, কোন মেয়ে অমন হাসিমুখে কথা বলতে

পারে না। মনের ভাব গোপন করার অসাধারণ ক্ষমতা ওর আছে। আমার সন্দেহ হয় ওর মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে। সেইজন্যই কিছুদিন ওকে অন্তঃপুরে রাখার ব্যবস্থা করলাম।

সম্রাট্ সে কথার কোন উত্তর দিলেন না।

উপনায়ক বীরসিংহকে সামনে আনলেন, বললেন—এঁকেও সেনাপতি লিওনিদাস বন্দী করে পাঠিয়েছেন।

—আমি পুরস্কার প্রত্যাশা করেছিলাম সম্রাট, সেইজন্য সেনাপতি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

—বলুন, আপনার কি আকাঙ্খা?

—কিছুদিন আগে এক রাজকুমারীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা ছিল। তারপর গ্রীক আক্রমণ ও নানা দুর্যোগের মধ্যে সব বিপর্যস্ত হয়ে যায়। দীর্ঘ-দিন পরে আবার আমি সেই রাজকুমারীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, এখন আপনি অনুমতি দিলেই আমি তাঁকে বিয়ে করতে পারি।

—সেই রাজকুমারী কে?

—শ্রীমতী মালবিকা, যাকে এই মাত্র আপনি আপনার অন্তঃপুরে স্থান দিলেন।

—মিনান্দার বীরসিংহের মুখের পানে তাকালেন, বললেন—আপনি কি জানেন না—সম্রাটের জিনিষে লোভ করিতে নেই?

—লোভের কথা নয়, সম্রাট! এ আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা মাত্র।

—রাজকুমারীকে আমি সভা-নর্তকী করবো বলে স্থির করেছি।

—সম্রাট্, আমি আপনাকে উত্তর ভারতের অনেক স্থান জয় করার কাজে বিশেষ সহায়তা করেছি। আমার একটি আশা পূরণ করা,—সামান্য একটি ভিক্ষা দেওয়া কি আপনার পক্ষে সমীচীন নয়?

—সমীচীন?—সম্রাটের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো—আমার পক্ষে কি সমীচীন আর কি সমীচীন নয়, তা আমিই ভালমত বিচার করতে জানি বীরসিংহ! তুমি এখন বিশ্রাম কর গে—

বীরসিংহ বুঝতে পারলেন কথাটা বলা তাঁর পক্ষে ঠিক সময়োপযোগী হয় নি। এবং তার সঙ্গে এও বুঝলেন যে মালবিকাকে গ্রীক সম্রাটের কবল থেকে মুক্ত করা নেহাৎ সহজ হবে না।

প্রণাম জানিয়ে বীরসিংহ ধীর পদে বাহির হয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সম্রাট্ তাঁকে ডেকে বললেন—বীরসিংহ, মালবিকাকে বিবাহ করার আশা আপনি ত্যাগ করুন এবং আমার অনুমতি ছাড়া আপনি সেনাবাস ত্যাগ করতে পারবেন না।

—তা হ'লে কি আমি নিজেকে বন্দী বলে গণ্য করবো সম্রাট্?

—বন্দী?—না, ঠিক বন্দী নয়। যে দেশে আপনি জন্মেছেন, যে দেশে আপনি প্রতিপালিত হয়েছেন সেই পিতৃভূমিকে আপনি বিদেশীর হাতে তুলে দিতে মোটেই ইতস্ততঃ করেন নি। একদিন নিজের শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য আপনি আমাকে ডেকে এনেছিলেন, আজ আবার নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার জন্য আপনি আমাকে বিপন্ন করে তুলতে পারেন। সেইজন্যই আপনাকে আমি চোখের আড়াল করতে চাই না।

সম্রাট্ হাসলেন; বীরসিংহকে সে হাসি তীরের ফলার মত বিঁধলো; গ্রীক সম্রাটের মুখের উপর কথা বলার পরিণাম তিনি অনেকবার দেখেছেন। ঘাড় হেঁট করে তিনি বাহির হয়ে গেলেন।

সম্রাট্ এবার নাগসেনের পানে ফিরলেন, উপনায়ককে জিজ্ঞাসা করলেন, —ইনি?

—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

—আপনার কি প্রয়োজন সন্ন্যাসী?

—আমার প্রয়োজন কিছুই নেই সম্রাট্, আমি আপনার নাম শুনেছি, আপনি আর্যাবর্তের অর্ধেক অধীশ্বর, আপনার নাম শুনলে রাজা-প্রজা সকলেরই মুখ শুকিয়ে যায়, তাই আপনাকে একবার দেখতে এলাম।

—আমি যদি আপনাকে মগধের গুপ্তচর বলে মনে করি?

—আমি কোন প্রতিবাদ করবো না। জানবো এই আমার কর্মফল।

—আপনার জীবনের উপর আপনার কোনও মমতা নেই?

—মমতা করেও তো এই জীবনকে ধরে রাখতে পারবো না সম্রাট। একদিন তো চলে যেতেই হবে, যেটুকু কাজ করতে এসেছি সেটুকু সম্পূর্ণ হলেই চলে যেতে হবে,—যাওয়াই যখন শেষ কথা তখন সেজন্য অনুশোচনা করি কেন?

—আপনার নাম কি সন্ন্যাসী?

—নাগসেন।

—উত্তরাপথের মহাভিক্ষু নাগসেন ?

নাগসেন মাথা নাড়লেন।

—তাঁকে তো প্রবীণ থের (স্থবির) বলে শুনেছি, কিন্তু আপনি তো যুবক !

—তথাগতের আশীর্বাদ সম্রাট্।

—আপনাকে এখানে কেউ চেনে ?

—তাতো জানিনা সম্রাট্।

—তাহ'লে তো আপনাকে আমি বন্দী করতে বাধ্য হব।

—আমি তো সেজন্য কোন প্রতিবাদ করবো না সম্রাট !

—উত্তম, আপনি আমার অনুমতি ছাড়া এই সেনানিবাস অতিক্রম করতে পারবেন না।

নাগসেন স্মিতহাস্যে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন—আপনার জয় হোক্ সম্রাট্ !

আঠারো

মিনান্দার উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, কিছুক্ষণ আগে গুপ্তচরের-মুখে তিনি সংবাদ পেয়েছেন, মগধ সম্রাটের রণহস্তী ও যুদ্ধাশ্বের উপঢৌকন আসছে, তারা অযোধ্যা অতিক্রম করেছে। ওটি হস্তগত হ'লে পাটলিপুত্রে অবাধ অভিযান চালানো সহজ হবে। আলেকজান্দার যা করতে পারেন নি মিনান্দার তা করবেন।

মন্ত্রী ও সেনানায়কদের সঙ্গে সম্রাট্ পাটলিপুত্র জয়ের পরিকল্পনা করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছেন, এমন সময় চর এসে আর এক সংবাদ শুনিয়ে গেল—লিওনিদাস বন্দী হয়েছে, ভরতপুর থেকে সমস্ত গ্রীক সেনা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, রাত্রির অন্ধকারে হিন্দুরা গুপ্তপথে আক্রমণ চালিয়েছিল।

সম্রাট্ চরকে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করলেন, চর যা জানতো সবই বললো। চর বললো—এমন নিঃশেষে আর কখনও হিন্দুদের কাছে গ্রীকেরা পরাজিত হয় নি। হিন্দুরা প্রস্তুত হয়েছে, এবার সম্ভবতঃ তারা ব্যাপক আক্রমণ চালাবে।

সম্রাটের মুখ কালো হয়ে উঠলো। দূতকে বিদায় দিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতে বসলেন।

মধ্যাহ্নে দেখা গেল গ্রীকবাহিনী মথুরার পথে পশ্চাদপসরণ করছে।

উনিশ

সারাটি সন্ধ্যা যুদ্ধের যথাবিহিত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা ক'রে গ্রীক সম্রাট মিনান্দার বস্ত্রাবাসের বাহিরে পদচারণা করছিলেন, এমন সময়ে সঙ্গীতের মধুর স্বর ভেসে এলো বাতাসে। সম্রাট কান পেতে শুনলেন—দেশী গান। এ কণ্ঠ তো তিনি এর আগে শোনেন নি! এ কার কণ্ঠ? সম্রাট করতালি দিয়ে প্রতিহারীকে ডাকলেন, আদেশ দিলেন—যিনি গান গাইছেন, তাঁকে নিয়ে এসো।

গান গাইছিলেন রাজকুমারী মালবিকা, দৌবারিক তাঁকে নিয়ে এলো সম্রাটের বস্ত্রাবাসে।

মিনান্দার প্রশ্ন করলেন—এত রাত্রে তুমি গান গাইছিলে?

মালবিকা প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন, বললেন—বন্দীজীবনের দুঃখের মাঝে সহসা আনন্দের সমারোহ-জাগলো, তাই সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের স্তুতি করছিলাম।

—আনন্দের সমারোহ জাগলো এত রাত্রে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সম্রাট! একটু আগেই সংবাদ পেলাম - যারা আমার দেশের শত্রু, যারা আমার জাতির শত্রু, তারা মাগধী সেনার ভয়ে মথুরায় পশ্চাদপসরণ করছে। মনটা খুসি হ'ল।

মিনান্দারের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো, কিন্তু স্বরে তা প্রকাশ পেল না, বললেন—কিন্তু তুমি যে সেই শত্রু-শিবিরে বন্দিনী, একথা তোমার মনে হয়নি?

—সেকথা সব সময়েই মনে আছে সম্রাট, কিন্তু সমগ্র দেশের মঙ্গল-অমঙ্গলের মাঝে আমি কতটুকু? নিজের শুভ-অশুভ দিয়ে সারা দেশের কথা তো বিচার করা চলে না সম্রাট! হিন্দুশাস্ত্র আমাদের তা শেখায় না।

—তোমার বাক্‌পটুতার প্রশংসা করি।

—আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন সম্রাট!

সম্রাট কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—

স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাজনীতি চর্চা করতে নেই। তোমার কণ্ঠস্বর সুন্দর, তুমি বরং আমাকে একটা গান শোনাও।

—যথাজ্ঞা!—বলে মালবিকা গান ধরলেন—

আমি হব রূপকথার এক রাজার মেয়ে,
আমার সুরে ছন্দে গানে ভুবন যাবে ছেয়ে।
যতেক দেশের ছেলে-মেয়ে
গান শুনে মোর আসবে ধেয়ে,
নতুন দিনের সুর জাগাব ঘুম-ভাঙা গান গেয়ে।
দৈত্য এলো, মানুষ খেলো,
রাজা প্রজা প্রাণ হারালো;
মানুষ যত পাষাণ হ'ল,
ধার হারালো অসি ধারালো;
চোখের জলে দিন কাটালো
বন্দিনী এক রাজার মেয়ে—
পক্ষিরাজে আসলো উড়ে কোন সে দেশের রাজার ছেলে,
দৈত্য যত করলো হত অসির ঘায়ে, অবহেলে,
পাষাণপুরীর ঘুম ভাঙালো,
রাজকন্যার চোখ মুছালো,
জীবনের জোয়ার এলো—
আনন্দে দেশ গেল ছেয়ে—
আমি হব রূপকথার সেই রাজার মেয়ে।

সঙ্গীত শেষ হ'ল, মিনান্দার বললেন—রাজকন্যা, তোমার কণ্ঠ সুন্দর, কিন্তু উত্তর ভারতের সম্রাটকে মুখোমুখি দৈত্য বলে গালি দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। রমণীকে কোন রকম দৈহিক শাস্তি দেওয়া আমি পছন্দ করি না, না হ'লে তোমার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করতাম।

—আপনাকে কোন রকম গালি দেবার মত স্পর্ধা আমার নেই সম্রাট। যে গান মনে এসেছে তাই গেয়েছি! আপনি সঙ্গীতকে সঙ্গীত হিসাবেই গ্রহণ করুন সম্রাট!

—আমি নির্বোধ নই, রাজকুমারী।

—আপনি আমায় ক্ষমা করুন সম্রাট্!

—তোমার রাজপুত্র পক্ষিরাজে চড়ে যখন আসবে তার সঙ্গে দেখা করতে আমি প্রস্তুত থাকবো, রাজকুমারী!

—আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন সম্রাট!

—চুপ কর। প্রতিহারী, একে মহারাণীর কাছে নিয়ে যাও। আজ থেকে একে আমি মহারাণীর পরিচারিকা নিযুক্ত করলাম।

মালবিকার মুখভাবের কোন পরিবর্তন হ'ল না, সম্রাটকে প্রণাম জানিয়ে প্রতিহারীর সঙ্গে তিনি বাহির হয়ে গেলেন।

কুড়ি

মগধ-সম্রাটের উপঢৌকন চলেছে গ্রীক সম্রাটের উদ্দেশে। যুদ্ধাশ্ব, রণহস্তী, স্বর্ণ। সান্ত্রী-পরিবেষ্টিত দ্রব্যসম্ভার সন্ধ্যা সমাগমে পাহাড়তলির প্রান্তরে এসে ছাউনি ফেললো।

সান্ত্রীদের অধিনায়ক বীরভদ্র বস্ত্রাবাসের বাহিরে এক কাষ্ঠাসনে বসে তাকিয়ে ছিলেন তারকা-খচিত অন্ধকার আকাশের পানে। কয়েকদিনের পথ-শ্রমে তাঁর দেহে ক্লান্তি জমেছে; এভাবে পথ চলার অভ্যাস তাঁর নেই। দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে তিনি সৈনিকের কাজ করছেন কিন্তু আজ অবধি একবারও তাঁকে কোন যুদ্ধে লড়তে হয়নি। সে দিক্ থেকে তাঁর অদৃষ্ট ভালই বলতে হবে। এখন কোন রকমে গ্রীক সম্রাটের কাছে উপঢৌকনটা পৌঁছে দিয়ে আবার কবে পাটলিপুত্রের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফিরে যাবেন তাই তিনি ভাবছেন।

সহসা একটি মানুষের ছায়া এগিয়ে আসছে বলে মনে হ'ল, বীরভদ্র সজাগ হয়ে উঠলেন।

পুষ্যমিত্র সামনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—সর্বাধিনায়কের জয় হোক!

—স্বাগতম্! আসন গ্রহণ করুন।

করতালি দিয়ে এক সান্ত্রীকে ডেকে বীরভদ্র একখানি কাষ্ঠাসন আনিয়ে দিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—আপনার কি সংবাদ বলুন তো?

আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ের আলোচনা করতে এলাম। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে সম্প্রতি ভরতপুর দুর্গে গ্রীক বাহিনীর ভাগ্যে এক বিপর্যয় ঘটে গেছে। মুষ্টিমেয় বনবাসী সেনার কাছে ভরতপুরের গ্রীকবাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছে,

সেনানায়ক অবধি নিহত হয়েছে। পুনরায় অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কায় গ্রীক সম্রাট মথুরা পর্যন্ত পিছিয়ে গেছেন। গ্রীকবাহিনী অপরাজেয় বলে আমাদের যে একটা ধারণা জন্মেছিল, সে ধারণা তারা বদলে দিয়েছে। তাই আমি বলি কি, এই সময়ে গ্রীক সম্রাটের কাছে আমাদের এই রণসম্ভার পৌঁছে দিলে তাদের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের পক্ষে তা ক্ষতিকর হবে। আপনিও নিশ্চয়ই আমার মত সমর্থন করবেন ?

—অর্থাৎ, আপনি কি বলতে চান ?—বীরভদ্রের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো।

—আমি বলি কি, আমরা কিছুদিন এখন ভরতপুরে আশ্রয় নিই। ইতিমধ্যে দ্রুতগামী বার্তাবহ দিয়ে সম্রাটের কাছে খবর পাঠাই। তিনি আরও সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, গ্রীকদের সঙ্গে আমরা এইখানেই এক বোঝাপড়া করে ফেলি।

লড়াই করার কোন ইচ্ছা বীরভদ্রের ছিল না, তিনি বললেন—কিন্তু অযথা বিলম্ব করার জন্য যদি হিতে বিপরীত হয় ?

—সে দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন।

—সম্রাট যে কর্তব্যভার আমার উপর ন্যস্ত করেছেন সে ভার আমি হস্তান্তরিত করতে পারি না, তাহ'লে সম্রাটের আদেশ অমান্য করা হবে। তা ছাড়া অকারণ এক শক্তিমান্ রাষ্ট্রের সঙ্গে সংগ্রাম বাধিয়ে বহু লোকক্ষয় করা যুক্তিযুক্ত হবে কি না, সেও একটা কথা। জানেন তো 'উপায়ম্ চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞস্তথাপায়মপি চিন্তয়েৎ'।

—আমরা অনেক চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

—'আমরা' মানে ?

—আমি ও বজ্রাচার্য !

—যুদ্ধ সম্পর্কে আপনারা দু'জনেই অনভিজ্ঞ, সে সম্পর্কে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনার কোন সার্থকতা দেখি না। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র কি আপনাদের নীতি সমর্থন করে ? বজ্রাচার্য বৌদ্ধ সঙ্ঘের আচার্য, ভগবান্ বুদ্ধ কি অকারণ লোকক্ষয়ের হেতু নিবারণ করার কথা বলেননি ?

—শত সহস্রের দুঃখ নিবারণের জন্য, স্বদেশকে যবনের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য যে সংগ্রাম, তা হ'ল মানুষের সহজাত সংগ্রাম, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি—সব নীতিই একে স্বীকার করে।

—আপনি তা হ'লে আমাকে সম্রাটের আদেশের অবাধ্য হতে বলছেন ?

—সেকথা পরে বিবেচনা করা যাবে। জাতীয় সম্পত্তি বিজাতীয় শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া যায় কিনা তাই এখন আমাদের বিচার করে দেখতে হবে।

—কিন্তু সম্রাটের আদেশের সমালোচনা করা বা লঙ্ঘন করার অধিকার তো আমার নেই—আপনাদেরও নেই ।

—সে কৈফিয়ৎ আমরা পরে দেব। এখন আপনি আমাদের কথামত কাজ করতে পারেন কিনা, তাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

—সম্রাটের আদেশ আমি অমান্য করতে পারিনা, আপনাদের যা করার পরে করবেন।

—এই ধনসম্পদ্ হস্তান্তরিত করার পরে আমাদের করার কি থাকবে ?

—বেশ, তাহ'লে সম্রাটের আদেশ-পত্র সংগ্রহ করে আমুন।

—দু'একদিনের মধ্যে সম্রাটের আদেশ-পত্র সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য আমরা বলছি, আপনি কয়েক দিন অপেক্ষা করুন।

—ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করেননি কেন ?

—ভরতপুরের বিপর্যয় ঘটেছে পরশু শেষরাত্রে মাত্র। সেই ঘটনাকে ভিত্তি করেই আমরা মনস্থির করেছি।

—কিন্তু সম্রাটের আজ্ঞা ছাড়া আমি একদিনও অপেক্ষা করবো না।

—কিন্তু আমরা তা হ'লে আপনাকে দেশ ও জাতির শত্রু বলে গণ্য করবো।

—সে আপনার যা খুসি ভাবতে পারেন।

—তা'তে আপনার বিপদের সম্ভবনা আছে।

বীরভদ্র এবার একটু শঙ্কিত হলেন। জীবনে এতদিন সেনানায়কের বেতন নিচ্ছেন কিন্তু আজ অবধি একবারও শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হয়ে জীবন বিপন্ন করতে হয়নি। বেশ নিরাপদেই দিন কাটছিল, এখন কিনা সামান্য একটা উপঢৌকন দিতে এসে নিজের দেশবাসীর হাতে দুর্ভোগ ভুগতে হবে! একটা কৌশল তাঁর মনে এলো, একটু চিন্তিতভাবে তিনি বললেন—আচ্ছা, আমাকে ভেবে দেখার মত একটু সময় দিন। সহকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি, তাদেরও তো একটা মতামত আছে ?

—আপনার সহকারী যাঁরা সঙ্গে এসেছেন তাঁদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি আপনাকে বুদ্ধি দিতে পারেন। সেইজন্যই আমরা অহেতুক সময়ক্ষেপ করতে পারবো না। এখন আমাদের দেশের মহাদুর্দিন; প্রতিটি মুহূর্ত বিশেষ মূল্যবান্; একটি বেলা নষ্ট করা মানে শত্রুপক্ষকে প্রস্তুত হবার অধিকতর সুযোগ দেওয়া। আপনার যা কিছু করার তা এখনই করুন।

ইতিপূর্বে মগধ-সম্রাট, মহামাত্য, ন্যায়াধীশ ও মহাবলাধ্যক্ষ ছাড়া এমন ভাবে বীরভদ্রের উপর কথা বলতে কেউ সাহস করেনি, বীরভদ্র ক্রুদ্ধ অসন্তোষে ফোঁস করে উঠলেন—আপনি কি আমার বস্ত্রাবাসে বসে আমাকেই চোখ রাঙাতে চান? আপনি অতিথি ও আচার্য। কিন্তু তথাপি স্মরণ রাখবেন ধৃষ্টতা সকল সময় মার্জনীয় হয় না।

—আপনার কথা শুনে মনে হয় আপনি আমাদের অনুরোধ গ্রহণ করবেন না। তাহ'লে অবিলম্বে আমরা আপনার দেহ রক্ষার ভার গ্রহণ করবো।

—অর্থাৎ আপনারা আমাকে বন্দী করতে চান?

—আপনি যদি তার তেমন অর্থ করেন তাহ'লে তাই।

—আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আপনি অনধিকার চর্চা করছেন।

—আমি জাতির প্রতিনিধি হয়ে আমার দেশের স্বার্থের জন্য মগধ-সম্রাটের এই যূথবল, অশ্ববল ও সুবর্ণের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে চাই, আপনি এখন থেকে কর্মচ্যুত হলেন। তবে আপনি ইচ্ছা করলে পাটলিপুত্রে ফিরে যেতে পারেন।

—আমি তার পূর্বেই তোমাকে বিদ্রোহী হিসাবে বন্দী করবো—বলে উত্তেজিতভাবে আসন ত্যাগ করে বীরভদ্র করতালি দেবার উপক্রম করলেন, কিন্তু করতালি দেবার আগেই পুষ্যমিত্র বজ্রমুষ্টিতে তাঁর ডান হাতখানা চেপে ধরে বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে একখানি ছুরিকা বাহির করে তাঁর বুকের উপর তুলে ধরলেন, বললেন—একটি শব্দ উচ্চারণ করলে প্রাণ যাবে, সাবধান!

ঠিক সেই সময়ে বীরভদ্রের পাশে আর একজনের ছায়া পড়লো। সোনানায়ক মুখ ফিরিয়ে দেখলেন তিনি বজ্রাচার্য, মুখে তাঁর কঠিন হাসি।

একুশ

গূঢ় পুরুষ সংবাদ সংগ্রহ করে আনলো—মগধের উপঢৌকন ভরতপুরের দুর্গে সমবেত হয়েছে।

মিনান্দার বললেন—বেশ, আমি এবার মগধ-সম্রাটের সঙ্গে রীতিমত শক্তি পরীক্ষায় প্রস্তুত।

তখনই গ্রীক-সম্রাট সেনানায়কদের আহ্বান করলেন, পরামর্শ-সভা বসলো। বীরসিংহ কোথায় ছিল, ছুটে এল, বললো—সম্রাটের জয় হোক!

মিনান্দার বিরক্ত হলেন, বললেন—কি চাই?

—আমার একটা নিবেদন আছে সম্রাট।

—এখন নয়, অন্য সময় ব'ল।

—কথাটা আপনার এখনই জানা প্রয়োজন প্রভু।

—বল!

—আমাকে যদি আপনি অন্ততঃ দু-তিন দিন সময় দেন আমি ভরতপুর দুর্গের সমস্ত অন্ধিসন্ধি জ্ঞাত হয়ে এসে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

—তার বিনিময়ে তুমি কি আশা কর?

—রাজকুমারী মালবিকাকে আমার হাতে সমর্পণ করবেন।

সম্রাট বারেক কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—তোমার কর্মের সফলতার উপর তোমার পুরস্কার-প্রাপ্তি নির্ভর করছে।

—আমাকে তাহ'লে সাত দিন সময় দিন সম্রাট! আজ হ'তে অষ্টম দিনে আমি আপনার কাছে সমুদয় ব্যাপার নিবেদন করবো।

মিনান্দার সম্মত হলেন।

দু'দণ্ড পরে সাধারণ একজন নাগরিকের বেশে বীরসিংহ গ্রীক সেনাবাস থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'ল।

বাইশ

সেনাধিনায়ককে বন্দী করতে যখন তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তখন বস্ত্রাবাসের অন্তরালে একজন যুবক সব কিছু লক্ষ্য করছিল। অন্ধকারে তাকে

কেউ দেখতে পায়নি, বস্ত্রাবাসের কোন্ ফাঁক দিয়ে কোথায় দু'টি চোখ উঁকি মারছে, তখনকার সেই ব্যস্ততার মধ্যে তা লক্ষ্য করা সম্ভবও ছিল না।

সেনানায়ককে বেঁধে সেই বস্ত্রাবাসের মধ্যে রেখেই পুষ্যমিত্র ও বজ্রাচার্য যখন বাইরে গিয়ে রণহস্তী ও যুদ্ধাশ্বগুলি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সেই অবসরে বস্ত্রাবাসের পিছন দিকের একটা ফাঁক দিয়ে কোন রকমে সেই লোকটা এসে ভিতরে ঢুকলো, সেনানায়কের কাছে এসে তাঁর মুখের বাঁধন খুলে দিল, ফিস্ ফিস্ করে বললো—আমি আপনাকে মুক্তি দিতে পারি, কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে,—আমি যা বলবো তাই আপনাকে করতে হবে।

—করবো। প্রতিশ্রুতি দিলাম।

—বেশ!—ব'লে আগন্তুক সেনানায়কের বাঁধন খুলে দিল, তারপর তার হাত ধরে তাঁবুর পশ্চাদ্দিকের যে পথ দিয়ে সে ভিতরে এসেছিল সেই পথ দিয়ে বাহির হয়ে গেল।

তেইশ

মালবিকার পরিচয় পেয়ে গ্রীক সম্রাজ্ঞী আগাথোক্লি খুসী হলেন। ইতিপূর্বে সম্রাট্ মিনান্দার অনেক রাজ্য জয় করেছেন বটে, কিন্তু কোন রাজকন্যাকে সম্রাজ্ঞীর পরিচারিকা করতে পারেননি। এই প্রথম একজন হিন্দু রাজার মেয়ে এল পরিচারিকা হয়ে। সম্রাজ্ঞীর কৌতূহল হ'ল, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি মালবিকার সমস্ত পরিচয় জেনে নিলেন। মালবিকা একটী কথা বিশেষভাবে জানিয়ে দিল যে, নৃত্যগীতে সে পারদর্শিনী। সম্রাজ্ঞী তখনই আদেশ দিলেন গান শোনাবার জন্ম, নাচ দেখাবার জন্ম। মালবিকা এজন্য প্রস্তুত ছিল, সে জানতো যে, মানুষকে সহজে খুসী করতে হলে সংগীতের চেয়ে শক্তিমান্ অস্ত্র আর কিছু নেই। সম্রাজ্ঞীকে খুসী করার জন্ম সে সচেষ্ট হ'ল: মালবিকা গান ধরলো—

'হে সম্রাজ্ঞী, সম্রাট মিনান্দারের দিগ্বিজয়ী সৈন্যেরা হউক জয়যুক্ত,
মগধ হউক গ্রীক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।
হে সম্রাজ্ঞী, আমি তোমাকে বরণ করি—
মগধের সিংহাসনে আমি তোমাকে বরণ করি।

হীরা জহরৎ মণিমুক্তা তোমার চরণের শোভা করুক বর্ধন,
ভারতের রাজারা শ্রদ্ধার্ঘে ভূষিত করুক তোমার চরণ,
তোমার চরণের স্পর্শে বিকসিত হউক স্থলকমল,
ঊষর মরুতে জাগুক পুষ্পকুঞ্জ, জাগুক নবদূর্বাদল।
তোমার চারিপাশে বহুক বসন্তের সুবাস সম্ভার,
তুমি কেন্দ্র হও হিন্দুর আন্তরিক শ্রদ্ধার।
হে গ্রীক সম্রাজ্ঞী আগাথোক্লি, হে যবন সুন্দরী,
তোমাকে আমি মগধের সিংহাসনে বরণ করি।

গ্রীক সম্রাজ্ঞী পুরোপুরি না বুঝলেও, কিছু কিছু এদেশী ভাষা বুঝতেন। গানের বাণী যেটুকু তিনি বুঝলেন, তাতেই অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। বললেন—সুন্দর তোমার কণ্ঠ !

মালবিকা বললো—যদি অনুমতি করেন তো আর একখানি গান আপনাকে শোনাই।

আগাথোক্লি সম্মতি জানালেন, মালবিকা সুর ধরলো—

সম্রাট-সহধর্মিণী তুমি, গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠা রূপবতী,
সম্রাট আমাদের দেবতা, তুমি দেবী মূর্তিমতী !
তোমাদের জুনো ও ভেনাস, আমাদের লক্ষ্মী সরস্বতী,
তুমি তাঁদের অংশসম্ভূতা, গ্রহণ কর প্রণতি !

সম্রাজ্ঞীর মুখ উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি গলা থেকে হার খুলে নিয়ে মালবিকার হাতে দিলেন, বললেন—অত্যন্ত প্রসন্ন হলাম, এই নাও তোমার পুরস্কার।

মালবিকা বললো—দেবী, আমি ধন্য। তবে আমি আপনার কাছ থেকে একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করি।

—কি বল ?

—সারাদিন বস্ত্রাবাসে বন্দিনী হ'য়ে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। রাজার মেয়ে আমি; প্রশস্ত প্রাসাদে আবাল্য লালিত হয়েছি, আপনি আমাকে সামনের প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত বায়ু সেবনের অনুমতি দিন !

—সম্রাট কি তোমাকে বস্ত্রাবাসের বাহির হ'তে নিষেধ করেছেন ?

—না, তিনি শুধু আমাকে আপনার সেবা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

—তা হ'লে, তুমি স্বচ্ছন্দে সামনের প্রাঙ্গণে মুক্ত বায়ু উপভোগ করতে পার।

—মহাদেবীর জয় হোক।

চব্বিশ

একটু আগে সূর্যোদয় হয়েছে। গ্রীক সম্রাট এখনও সভায় আসেন নি। পাত্রমিত্র, সভাসদে প্রশস্ত বস্ত্রাবাসটি গম্‌গম্ করছে। বীরসিংহ বীরভদ্রকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুর মধ্যে আর প্রবেশ করলো না, তাঁবুর বাহিরে পথে পদচারণা করতে লাগলো।

অল্পক্ষণ পরেই দু'জন দেহরক্ষীসহ সম্রাটকে দেখা গেল। বীরসিংহ তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে গিয়ে দু'হাত মাথার উপর তুলে গ্রীক কায়দায় অভিবাদন জানালো, বললো—সম্রাটের জয় হোক্!

সম্রাট তার আপাদমস্তক একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন,—এস!

—আপনার সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে প্রভু, সভার মাঝে তা সম্ভব নয়; আমার সঙ্গে মগধের সেনাধিনায়ক বীরভদ্র এসেছেন।

—মগধের সেনাধিনায়ক!—সম্রাটের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

বীরসিংহ বীরভদ্রকে এগিয়ে আসার জন্য ইঙ্গিত করলো, বীরভদ্র এগিয়ে এসে সম্রাটকে অভিবাদন জানালো। বীরসিংহ পরিচয় দিল—ইনিই মগধরাজের উপঢৌকন নিয়ে আসছিলেন, ভরতপুরের কাছে পুষ্যমিত্র তা লুঠ করেছে। এঁকে উদ্ধার করে এনেছি। ইনি মগধ-সম্রাটের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আপনাকে জানাতে পারবেন।

—উত্তম। তোমরা আমার সঙ্গে এস।—সম্রাট যে পথ দিয়ে আসছিলেন সেই পথেই আবার ফিরলেন; প্রতিহারীকে বললেন—ওদের বল গে, আজ আমি গুরুতর রাজকার্যে ব্যস্ত, আজ আর সভায় যাব না। মন্ত্রী আন্তিওকাসকে এখনই আসতে বল।

পঁচিশ

বীরসিংহের মুখ থেকে সব সংবাদ সংগ্রহ করে সেই রাত্রেই গ্রীক সম্রাট তাঁর সমস্ত বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ভারতীয় বাহিনীর কাছে কোনদিন

তাঁকে পরাজয় মানতে হয়নি, এবারই প্রথম তিনি পশ্চাৎ অপসরণ করেন; সেজন্য তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল, এবার তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন,—মগধের যুদ্ধাশ্ব ও রণহস্তীগুলি করায়ত্ত করবেন আর সেই সঙ্গে ভরতপুরের দম্ভও চূর্ণ করবেন। ভরতপুর দখল করার পর রাজগৃহ ও পাটলিপুত্রের দিকে অভিযান চালানো খুব কঠিন হবে না।

সমগ্র গ্রীক্ অশ্বারোহী-বাহিনী দু'দণ্ডের মধ্যে প্রস্তুত হ'ল, সম্রাট স্বয়ং চললেন তাদের পশ্চাতে।

অশ্বের ক্ষুরে কাপড় জড়ান হ'ল, যেন অশ্বপদশব্দ শোনা না যায়; মশাল জ্বালতে দেওয়া হ'ল না, শত্রুরা যেন আলোকরশ্মি দেখে সন্দেহের অবকাশ না পায়। রাত্রির অন্ধকারে গ্রীক বাহিনী ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হ'ল। সম্রাট ঘোষণা করেছিলেন—অন্ধকার পথ, সাবধানে অগ্রসর হবে। রাত্রি-শেষে ভরতপুরের দ্বারে গিয়ে পৌঁছলেই চলবে। পথ সামান্য, এইটুকু পথ অতিক্রম করতে যে অশ্বারোহী কোন দুর্ঘটনা ঘটাবে বা ঘোড়া থেকে পড়ে যাবে তার সৈনিকের পোষাক কেড়ে নিয়ে তাকে সাধারণের ভৃত্য করা হবে।

সেইকথা স্মরণ করে অশ্বারোহী-বাহিনী ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হচ্ছিল।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে ওঠাই হিন্দুরীতি। সাধকেরা শেষরাত্রে স্নান শেষ করে পূজা-আহ্নিক করতে বসেন। সেদিনও যথারীতি বজ্রাচার্য স্নান করতে যাচ্ছেন, আকাশের পূর্বদিকে তখনও আলোর আমেজ আসেনি। সহসা বজ্রাচার্যের কেমন যেন মনে হ'ল, দূরে কেমন যেন খরখর সরসর শব্দ হচ্ছে, সমস্ত বনভূমি যেন কাঁপছে! ঝড় না হ'লে তো এমন হয় না! বজ্রাচার্য থমকে দাঁড়ালেন! একখণ্ড উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি সামনের পানে দৃষ্টি ছেড়ে দিলেন; ঘন অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা যায় না। বজ্রাচার্য চোখ বুঁজে ধীরে ধীরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে সুরু করলেন। তন্ত্রসিদ্ধ সাধক চোখ আর খুললেন না, মন্ত্রবলে সামনের সমস্ত প্রান্তর ও বনানী তাঁর মুদিত চোখের সামনে উদ্‌ভাসিত হ'ল। বজ্রাচার্য প্রত্যক্ষ করলেন অন্ধকার বনপথে শত শত অশ্বারোহীর অভিযান।

বজ্রাচার্যের আর স্নানে যাওয়া হ'ল না, তিনি আর সময় নষ্ট করতে পারলেন না, দ্রুতপদে পুষ্যমিত্রের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, বললেন—

পুষ্যমিত্র, যুদ্ধাশ্ব ও রণহস্তীগুলিকে এখনই পিছনে সরিয়ে দাও, গ্রীক বাহিনী আক্রমণ করতে আসছে।

সব শুনে পুষ্যমিত্র বললেন—আমরা ভরতপুরে গিয়ে আশ্রয় নিইগে।

—না। ওরা সম্ভবতঃ আর দু'-তিন দণ্ডের মধ্যে দুর্গ অবরোধ করবে। এতগুলি হস্তী ও অশ্বের খাদ্য যদি দুর্গমধ্যে সঞ্চিত না থাকে তাহ'লে ক'দিনের মধ্যেই দুর্গটিকে আত্মসমর্পণ করতে হবে,—অধিকন্তু বিপদ ডেকে আনা হবে। ভরতপুরের পতন হ'লে পাটলিপুত্রের পথ অনেকটা সুগম হবে। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। কিন্তু পিছনের বনান্তরালে কয়েকদিন আত্মগোপন করে থাকতে পারলে এই যুদ্ধাশ্ব ও রণহস্তীগুলিকে আমরা কাজে লাগাতে পারবো, তার ফলে গ্রীকদের ভরতপুর জয় করা কোনদিনই সম্ভব হবে না।

বজ্রাচার্যের যুক্তিই সমীচীন বলে মনে হ'ল। পুষ্যমিত্র অশ্বপাল ও হস্তীপালকে ডেকে নির্দেশ দিলেন প্রভাত হবার আগেই দ্রুতগতিতে পিছনের বনান্তরালে অদৃশ্য হবার জন্য।

উষালোকে গ্রীক সেনারা দেখলো, অশ্ব, হস্তী বা বস্ত্রাবাসের কোন চিহ্ন নেই সামনের প্রান্তরে। সম্রাট মিনান্দার তখনই বীরসিংহ ও বীরভদ্রকে ডেকে পাঠালেন, জিজ্ঞাসা করলেন—কই, কোথায় তোমাদের যুদ্ধাশ্ব ও রণহস্তী?

—আমার মনে হয় তারা ভরতপুর দুর্গমধ্যে আশ্রয় নিয়েছে সম্রাট, আপনি দুর্গ অবরোধ করুন।

সম্রাটের মুখখানি থম্‌থম্ করছিল; গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন—যুদ্ধ সম্পর্কে তোমার কোন উপদেশ আমি চাইনি; তুমি শুধু স্মরণ রেখো আমার যদি কোন ক্ষতি হয় তা হ'লে তোমারও মঙ্গল নেই। তোমরা এখন যেতে পার।

বীরসিংহ বাইরে এসে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

বীরভদ্র ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললো—শুধু তোমার জন্য আমার এই লাঞ্ছনা। এর চেয়ে পুষ্যমিত্রের হাতে মৃত্যুও ভালো ছিল। তোমার দুষ্টবুদ্ধিতে আমি নিজের সর্বনাশ করেছি।

বীরসিংহ তিক্তকণ্ঠে উত্তর দিল—তুমি ইচ্ছা করলে এখনও মরতে পার, যদি চাও তো আমি একখানি ছুরিকা সংগ্রহ করে দিই।

বীরভদ্র আর কিছু বললো না।

ছাব্বিশ

পাটলিপুত্র-প্রাসাদে সম্রাট বৃহদ্রথ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এই মাত্র বজ্রাচার্য এসে সংবাদ দিয়েছেন যে সেনাধিনায়ক বীরভদ্রকে বন্দী করে বনবাসীরা যুদ্ধাশ্ব ও রণহস্তীগুলি লুণ্ঠন করেছে। গ্রীক্ সম্রাট ভরতপুর দুর্গ দখল করেছিলেন, কিন্তু হনুমানগড়ের মণ্ডলেশ্বর অগ্নিমিত্রের সহায়তায় সুমতিসেন আবার দুর্গ পুনরুদ্ধার করেছেন, গ্রীক্ সেনাপতি লিওনিদাস তাঁর হস্তে নিহত হয়েছেন। মিনান্দার সমগ্র গ্রীক্ বাহিনী নিয়ে ভরতপুর অবরোধ করেছেন। অবিলম্বে যদি মগধ-সম্রাট ভরতপুরে সাহায্য না পাঠান তা হ'লে দুর্গের পতন অনিবার্য এবং একবার ভরতপুর দুর্গ যদি গ্রীক্‌দের কারায়ত্ত হয় তা হ'লে পাটলিপুত্রের পথ তাদের কাছে সরল হয়ে যাবে। সেই সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ না করতে পারলে মগধ-সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে।

বৃহদ্রথ বললেন—কিন্তু ভরতপুরে সৈন্য পাঠানো মানে গ্রীক্‌দের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া!

—গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ আপনাকে করতেই হবে সম্রাট! না হ'লে মগধ-সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাবে না।

যুদ্ধভীত বৃহদ্রথের কপালে চিন্তার রেখা পড়লো, তিনি বললেন—আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।

—কিন্তু একটা কথা সম্রাট,—বজ্রাচার্য বললেন—সাহায্য করলে অবিলম্বেই সাহায্য করা প্রয়োজন, বিলম্ব করলে গ্রীক্ সম্রাট সমগ্র উত্তরপথে যে সব গ্রীক সৈন্য ছড়িয়ে আছে তাদের পুনরায় সংগঠন করে বিশেষ শক্তিমান্ হয়ে উঠবে, আঘাত করলে তার আগেই আঘাত করা প্রয়োজন।

বৃহদ্রথ মাথাটা একটু হেলিয়ে বললেন—উত্তম, আমি একটু ভেবে দেখি। কাল সন্ধ্যাতেই আমার সিদ্ধান্ত আপনি জানতে পারবেন।

সাতাশ

মগধ-সম্রাট বৃহদ্রথ আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন। প্রাসাদ-অলিন্দে সমস্ত সন্ধ্যাটি তিনি পদচারণা করেই কাটিয়ে দিলেন। মগধের অনেক সম্রাটকে বৃদ্ধ বয়সেও যুদ্ধযাত্রা করতে হয়েছে, সমরক্ষেত্রে প্রাণও দিয়েছেন অনেকে।

বৃহদ্রথকে কোন দিন সংগ্রাম করতে হয় নি, আঘাত ও মৃত্যুকে তাঁর বড় ভয়। সেইজন্য গ্রীকেরা ধীরে ধীরে শাকেত অবধি অগ্রসর হয়ে এসেছে তবু তিনি তাদেরকে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন নি, উপঢৌকন দিয়ে তাদের সন্তোষ বিধান করতে চেয়েছেন। কিন্তু তথাপি আজ আবার সেই সংগ্রামের আহ্বানই দ্বারে এসে পৌঁচেছে। একে অদৃষ্ট ছাড়া আর কি বলবেন! বৃহদ্রথ আপন মনেই বলে ওঠেন—আমার রাজা হয়ে না জন্মালেই বোধ হয় ভাল ছিল। জীবনের এই দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগ ভুগতে হ'ত না। রাজ্য, প্রজা ও প্রাণ—এই তিন রক্ষা করতেই আমার প্রাণান্ত! আমার চেয়ে একজন সামান্য চাষীও অনেক বেশী সুখী, অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। আমার সারা জীবনই তো যুদ্ধবিগ্রহ! জ্ঞান হবার পর থেকে তো দুশ্চিন্তা থেকে একদিনও রেহাই পাই নি!

অলিন্দের চারিপাশে পুষ্পাধার। ফুলগাছগুলি রঙীন সুগন্ধি ফুলে সমৃদ্ধ। তারই মাঝে কালো পাথরের একটা বেদী। সম্রাট সেই বেদীর উপর বসলেন। কাউকে ডেকে কথা বলতে তাঁর ইচ্ছা করছে না। একটু আগে মন্ত্রীকে ডেকেছিলেন, মন্ত্রী বললেন,—'এই তো সুবর্ণ সুযোগ প্রভু. গ্রীকদের সঙ্গে একটা মুখোমুখি নিষ্পত্তি করে ফেলাই ভালো, ওঁরা বড় বেশী বেড়ে উঠেছে!' মন্ত্রী তো আর লড়বেন না, উপদেশ দিয়েই তাঁর ছুটী! যুদ্ধের সমস্ত ভীষণতা বহে যাবে সম্রাটের মাথার উপর দিয়েই! লড়বেন তিনি, জীবন বিপন্ন করবেন তিনি, আর মন্ত্রী উপদেশ দেবেন, দাড়ীতে গোলাপ জল মাখবেন। এতদিন তিনি যাদের নিয়ে কাজ চালিয়েছেন তারা সবাই অপদার্থ, কাজের অনুপযুক্ত। না হ'লে বীরভদ্র শেষে কিনা বনবাসীদের হাতে সমস্ত উপঢৌকন-সম্ভার তুলে দিল! বিশ্বাসঘাতক! সব ষড়যন্ত্র!

সম্রাট উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।

কোন এক সময়ে রাণী এলেন, বললেন—সম্রাট, রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত-প্রায়! আপনার আহারের সময় চলে যায়!

—আমার ক্ষুধা নেই।

—সম্রাট্ কি অসুস্থ? রাজবৈদ্যকে খবর দেব?

—প্রয়োজন নেই!

—আপনি সহসা এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন কেন সম্রাট্, রাজকার্যে কোন অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে?

—শুধু রাজকাজ আর রাজকাজ, আমাকে পাগল করে তুললো! রাত্রির চতুর্থ প্রহর থেকে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অবধি। আজ অবধি একটি দিন পুরোপুরি বিশ্রাম করার অবসর পাই নি। রাজকাজ আমি আর করবো না মহারাণী, আমি পালাবো,—সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমি পালাবো,—আজই পালাবো!

মহারাণী একথা আরো দু'-একবার শুনেছেন। তাঁর বিবাহ নেহাৎ অল্প দিন হয় নি, সম্রাটকে তিনি বহুদিন ধরেই দেখছেন। আজকে সম্রাটের উত্তেজনার হেতুও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। রাণী বললেন—আপনি মগধের সম্রাট, মৌর্য বংশে আপনার জন্ম। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বহু সংগ্রাম করে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; রাজর্ষি অশোক কলিঙ্গে বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহে আপনারই বা এত ভয় কেন? রাজা দেশরক্ষক ও লোকপালক। রাজ্যের কল্যাণের জন্য, প্রজাপুঞ্জের রক্ষার জন্য সম্রাটের জীবন উৎসর্গীকৃত। মন্দিরের সেবাদাসীর মত রাজা গণদেবতার দাস মাত্র।

—তুমি বুঝবে না রাণী, তুমি বুঝবে না। মরতে আমি ভয় করি না, কিন্তু আঘাতকে আমি বেজায় ভয় করি। চোখে এসে একটি তীর বিঁধলো, কি হাতখানা অসির আঘাতে কাটা পড়লো, সারা জীবনের মত কানা কি নুলো হয়ে গেলাম, সে কী কষ্ট বল দেখি! এক কোপে যদি মাথাটা উড়ে যায় আমি ভাবি না, কিন্তু দগ্ধে দগ্ধে মরতে আমি পারবো না। এই বয়সে হাত-পা খুইয়ে মরা কি মর্মান্তিক বল দেখি!

—গ্রীকদের সম্পর্কে আপনি তা হলে কি করতে চান?

—কি করবো তাইত ভাবছি! বল দেখি আমাদের কি করা উচিত?

মহিষী মৃদু হেসে বললেন—কেন, পলায়ন! সমতট কি বিন্ধ্যগিরির পার্বত্য অঞ্চলে—

—ঠিক কথা মহিষী, ঠিক বলেছ! যথা সময়ে সকলের অলক্ষ্যে আমি পালিয়ে যাব। তুমি প্রস্তুত থেকো মহিষী, আজ মধ্যরাত্রেই আমরা এখান থেকে পলায়ন করবো।

—অতি উত্তম প্রস্তাব মহারাজ, কিন্তু আমি আপনার অনুগামী হতে পারবো না। আমি বিদিশার রাজকন্যা। গ্রীকেরা আমার পিতৃরাজ্য ধ্বংস করেছে, আমার স্বামীর রাজ্যও আজ তারা ধ্বংস করতে আসছে; আমি একবার তাদের সঙ্গে ভালোমত বোঝাপড়া করে নিতে চাই।

—কিন্তু ব্যাপারটার গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারছ না রাণী। সাম্রাজ্য কার জন্য? কার জন্য লড়াই করে আমি জীবন দেব? আমার পুত্র-কন্যা নেই, বয়সও হয়েছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করার মত শক্তি নেই, ইচ্ছাও নেই। এখন পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে আমার বনে যাবার সময়। সেই জন্যই নিরুপদ্রবে শান্তিতে জীবনের শেষ দিনগুলো আমি কাটিয়ে দিতে চাই।

—কিন্তু বহুজনের কল্যাণের দায়িত্ব যাঁর স্কন্ধের উপর, ব্যক্তিগত আশা-আনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ তাঁকে ত্যাগ করতে হয় সম্রাট।

—কিন্তু…

—আমি মগধের মহারাণী, আমার যা কিছু সম্পদ ও সম্মান সবই প্রজাপুঞ্জের দান। আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু তাদের অর্থে পুষ্ট। তাদের প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।

—তুমি ভুল বুঝছ রাণী, বড্ড ভুল বুঝছ।

—আমি পিতৃশত্রুর সঙ্গে একবার চরম নিষ্পত্তি করতে চাই সম্রাট। ভারতভূমিতে দু'জন সম্রাটের স্থান হবে না—হয় হিন্দু না হয় গ্রীক। হিন্দুর তলোয়ারে যতদিন ধার থাকবে ততদিন গ্রীকদের স্বস্তি নেই।

সম্রাট আর কিছু বললেন না, চুপ করে রাণীর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন।

আটাশ

সম্রাট মিনান্দার দু'মুখো অভিযান করলেন। একদল এসে অবরোধ করলো ভরতপুর দুর্গ, আর একদল ঘিরে ফেললো পার্বত্যভূমি, যার বনানীর অন্তরালে পুষ্যমিত্রের যুদ্ধাশ্ব ও রণহস্তী আত্মগোপন করেছিল। ঘন সন্নিবিষ্ট জঙ্গলের মধ্যে অভিযান চালানোয় বিপদ বেশী বলে তিনি গ্রীক সেনাদের জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন।

ভরতপুরের দুর্গদ্বার বন্ধ হ'ল। কিন্তু দুর্গমধ্যে পর্যাপ্ত খাদ্য ছিল না,

ক'দিন আগে লিওনিদাসের সৈন্যরা দুর্গ লুণ্ঠন করে প্রচুর খাদ্য অপহরণ করেছিল। যা ছিল তা একবেলা খেলেও তিন-চার দিনের বেশী চলবে না। ইতিমধ্যে বাহির থেকে যে কোন সাহায্য আসবে তারও সম্ভাবনা নেই। মগধ-সম্রাট গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না এ কথা সুমতিসেনের অজানা ছিল না। সুমতিসেন অগ্নিমিত্রের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন।

অনাহারে হীনতা স্বীকার করার চেয়ে যুদ্ধ করে মরাই ভালো। সাধারণের মনোভাব বোঝবার জন্য সেই সন্ধ্যায় সুমতিসেন দুর্গবাসীদের এক সভা আহ্বান করলেন। অগ্নিমিত্র তাদের বললেন,—আমি উত্তর ভারতের এক উপরাজার বংশধর। মগধ-সম্রাটের আমরা রাজিক। গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমার পরিবারের সকলেই নিহত হয়েছেন আমি একা আছি নিঃস্ব, সর্বহারা। গ্রীকদের রাজ্যজয়ের রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। গ্রীকেরা যে অঞ্চল একবার জয় করে সেখানকার আচার-ব্যবহার বদলে দেয়, নরনারীকে স্বধর্মে দীক্ষা দেয়। যারা বিরোধী হয় তাদের হত্যা করে। যারা ধর্ম ত্যাগ করে বাঁচে, তাদেরকেও আমরা মৃত বলে ধরতে পারি, কারণ তারা আর হিন্দু থাকে না। কাম্বোজ, গান্ধার ও পঞ্চনদের মানুষেরা আজ আর ভারতবাসী নয়, তারা যবনের দাস মাত্র। তাদের মুক্তির জন্য এবং হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য গ্রীকদের প্রতিরোধ করা প্রত্যেক হিন্দুরই কর্তব্য। যবনেরা উত্তরাপথের প্রায় অর্ধেক জয় করেছে, বাকী অর্ধেকও তারা গ্রাস করতে চায়। মগধের সিংহাসনই তাদের লক্ষ্য। তারা একবার মগধের সিংহাসনে বসলে, তখন তাদের হটিয়ে দেওয়া সহজ হবে না। আমাদের ধর্ম নষ্ট হবে, আমাদের সন্তান-সন্ততিরা চিরদিন আমাদের ধিক্কার দেবে—বলবে 'কাপুরুষ'। কিন্তু আমরা তা ঘটতে দেব না। তার আগেই আমরা গ্রীকদের গতি রোধ করবো। আমরা সংখ্যায় কম, কিন্তু তা বলে শত্রুকে আঘাত করার শক্তি আমাদের কম নয়। আমরা এক একজন যদি এক একটি গ্রীককে নিহত করতে পারি, তা হ'লেও গ্রীকেরা সংখ্যায় কিছু কমবে। এ ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন পথ নেই। লড়াই করার ইচ্ছা থাক বা না থাক, আজকের এই সংগ্রাম থেকে আমাদের কারও মুক্তি নেই। সংগ্রাম না করলে এই দুর্গমধ্যে আমাদের অনাহারে মরতে হবে। এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলে ওদের হাতে আমরা নিহত হবো। ভীরুর মত, কাপুরুষের মত পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত বহন করার চেয়ে

সম্মুখযুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে মরাই কি ভাল নয়? আমরা সংখ্যায় কম হতে পারি, কিন্তু আমরা ভীরু নই। মুষ্টিমেয় লোক আমরা, লাখ লাখ শত্রুর মাঝে আমরা হারিয়ে যাব সত্য, কিন্তু শত্রুকে এমন করে আঘাত হানবো যা যবনেরা জীবনে বিস্মৃত হবে না। তোমরা প্রস্তুত হও!

তখনকার হিন্দুরা ভীরু ছিল না। তারা দেশ ও ধর্মের জন্য সম্মুখ-সংগ্রামে জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

শেষরাত্রে ভরতপুরের দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হ'ল। হিন্দুরা তন্দ্রাচ্ছন্ন গ্রীক শিবিরগুলি আক্রমণ করলো। যে সব সান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছিল, তারা আক্রান্ত হবার কল্পনা করে নি। কয়েকজন অতর্কিতে প্রাণ হারালো, যারা পিছনে ছিল তারা সোরগোল তুললো। ভেরী নিনাদে গ্রীকেরা শয্যা ছেড়ে নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে বাহির হয়ে পড়লো। সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল।

অন্ধকারে কে যে কাকে মারছে ঠিক রইল না, অনেক গ্রীক নিজেদের অস্ত্রাঘাতেই নিহত হ'ল।

দিনের আলো যখন ফুটলো, অগ্নিমিত্র দেখলেন, সামান্য কয়েকজন অনুচর ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু অগ্নিমিত্র জীবন পণ করে বাহির হয়েছিলেন। তাঁর ঘোড়া ছুটে চললো শত্রুসেনার ভিতর দিয়ে, তলোয়ারও আঘাত করতে লাগলো দু'পাশের অগণিত গ্রীকদের উপর। কিন্তু অগণিত শত্রুর মাঝে একাকী কতক্ষণ যুঝবেন? সহসা কোথা থেকে এক বল্লম এসে বিদ্ধ করলো তাঁর ঘোড়াকে। ঘোড়া ধরাশায়ী হ'ল, অগ্নিমিত্র বন্দী হ'লেন।

পিছনে দুর্গপ্রাকারে উঠে মেয়েরা সংগ্রাম দেখছিল। এবার তারা দুর্গমধ্যে ঘরে ঘরে আগুন দিল। বিধর্মী বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করাই তাদের কাম্য।

তোরণ ভেঙে দুর্বার বেগে যখন গ্রীক সেনা ভরতপুরে প্রবেশ করলো তখন ভস্মাচ্ছাদিত দুর্গে জীবন্ত মানুষের সাড়া নেই।

বন্দী অগ্নিমিত্রকে মিনান্দারের সামনে উপস্থিত করা হ'ল। রক্তাপ্লুত তার দেহ, সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে।

নাগসেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বললেন,—সম্রাট, আপনার কাছ থেকে আমি একটি ভিক্ষা চাই!

—কি বলুন?

—এই আহত বন্দীকে সেবা করার অধিকার আমাকে দিন।

—সেবা? বন্দীকে আমি জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করবো।

—সেটা খুব বিচক্ষণতার পরিচয় হবে না সম্রাট্! দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সেকেন্দার পুরুরাজকে ক্ষমা করে যে বন্ধুত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর ফিরে যাবার সময় তা যথেষ্ট মূল্যবান হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইনি মগধের একজন রাজিক, এঁকে জীবিত রাখলে হয়তো ভবিষ্যতে একদিন এঁকে দিয়েই আপনার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

—আপনার কি ধারণা মগধের দ্বার থেকে সেকেন্দারের মত আমাকে ফিরে যেতে হবে?

—ভাগ্য কার ভবিষ্যৎ কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে কেউ কি তা নিশ্চিত করে বলতে পারে সম্রাট্? তবে ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করে রাখাই বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

—কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ আমিই নিয়ন্ত্রণ করবো মহাস্থবির, সমগ্র মগধ সাম্রাজ্যের আমিই হব ভাগ্যবিধাতা।

—ক্ষমতা মানুষকে অহঙ্কারী করে তোলে সম্রাট্! মানুষ ভুলে যায় সর্বনিয়ন্তাকে, তখনই বাহিরের আঘাত এসে তাকে সচেতন করে দেয়—'আমি আছি!' যাতে মানুষের জীবনের ধারা যায় বদলে।

—হিন্দুধর্মের ওই সব আধ্যাত্মিক কথা গাছতলায় বসে ভাবাই ভালো, রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ওসবের কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না।

—সত্য চিরন্তন সম্রাট, তার ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিচার চলে না। অবস্থা ভেদে বা কালক্ষেপে সত্যের রূপ একটুও বদলায় না।

—ও সব বড় কথা এখন থাক, মহাস্থবির। আপনি বলতে চান, বন্দী আপনার স্বদেশীয়, তাকে জল্লাদের হাতে সমর্পণ করা আপনি পছন্দ করেন না, তাই তো?

—আমার কাছে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বলে কিছুই নেই সম্রাট, আহতের সেবা করাই আমার ধর্ম।

—কিন্তু আপনার ধর্ম আর আমার ধর্ম তো এক নয়। আপনি হিন্দু, আমি গ্রীক, আপনি সন্ন্যাসী, আমি সম্রাট।

—মানবধর্ম সবার কাছেই এক সম্রাট!

—উত্তম, আমি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করলাম।

—জয়স্তু!

উনত্রিশ

সন্ধ্যার অন্ধকারে বজ্রাচার্য গঙ্গার তীরে বসেছিলেন। পাশেই শ্মশান। একটী চিতা জ্বলছিল। সেই লেলিহান অগ্নিশিখার পানে তাকিয়ে তিনি কত কি ভাবছিলেন। সান্ধ্য সমীরণ তাঁর ভালো লাগছিল। মর্মর-মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে তিনি বসেছিলেন।

কোথা দিয়ে যেন প্রহর খানেক সময় কেটে গেল। আকাশের চাঁদ গঙ্গার ঢেউয়ের মাথায় মাথায় টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লো। সহসা বজ্রাচার্যের ধ্যান ভাঙলো। ইতিমধ্যে পাশের চিতাগ্নি কখন্ নিভে গেছে, আত্মীয়-পরিজনেরা দাহ-কার্য শেষ করে কখন্ ফিরে গেছে। নিস্তব্ধ জনশূন্য শ্মশানভূমি। বজ্রাচার্যের কি যেন মনে হ'ল, উঠে এসে শ্মশান থেকে এক টুকরো অঙ্গার তুলে নিয়ে গঙ্গার জলে ফেললেন। তারপর কয়েকটা কি মন্ত্র উচ্চারণ করে আচমন করলেন সেই জল নিয়ে। সহসা চক্রাকারে খানিকটা জল স্বচ্ছ হয়ে উঠলো। চাঁদের আলোয় সেই স্বচ্ছ জলের উপর ভেসে উঠলো একটী চিত্র,—গ্রীক সেনারা একটী পার্বত্য জঙ্গল বেষ্টন করে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বজ্রাচার্য কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে দেখেই সেই জঙ্গলটী চিনতে পারলেন, তার মধ্যে পুষ্যমিত্র আশ্রয় নিয়েছিলেন। পুষ্যমিত্রের সম্বন্ধে বজ্রাচার্যের মনে উৎকণ্ঠা জাগলো। কিছুক্ষণ কি যেন তিনি ভাবলেন, তারপর নিকটস্থ বটগাছের একটী ডাল ভেঙে নিয়ে তার উপর উঠে বসলেন। ডালটির গায়ে কয়েক বার হাত বুলোলেন, ডালটি আকাশে উড়তে সুরু করলো।

ত্রিশ

ভরতপুর জয় করে সম্রাট্ মিনান্দার উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, আদেশ দিলেন —যে বনে মগধের যুদ্ধাশ্ব ও রণহস্তীগুলি আত্মগোপন করেছে সেই বনভূমি ঘেরাও করে আগুন জ্বালাও!

দেখতে দেখতে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি অগ্নিময় হয়ে উঠলো। চক্রাকারে

ঘন ধূমে চারিপাশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো, পুষ্যমিত্র চিন্তায় পড়িলেন। কয়েক দণ্ডের মধ্যেই ধূম্রজাল নিকটবর্তী হবে, তখন হাতী-ঘোড়াগুলিকে সামনে রাখা মুস্কিল হয়ে উঠবে। তার পূর্বেই এই বনভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া প্রয়োজন।

পুষ্যমিত্র মনস্থির করে ফেললেন। মধ্য রাত্রে হাতীগুলিকে সামনে রেখে পুষ্যমিত্র ত্রিকোণাকারে সূচীব্যূহ গঠন করলেন। তারপর পশ্চাতে, যে দিকে অগ্নিশিখা কিছুটা কম বলে মনে হ'ল সেই দিক্ থেকে আচম্বিতে শত্রুবাহিনীর সামনে গিয়ে পড়লেন। সূচীব্যূহের দুর্বার বেগ প্রতিরোধ করা সহজ ছিল না, গ্রীকেরা বাধা দিল বটে কিন্তু পুষ্যমিত্র শত্রুবাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে স্বচ্ছন্দে তাদের অতিক্রম করে গেলেন।

মিনান্দার ক্ষুব্ধ হলেন, আদেশ দিলেন—ওদের অনুসরণ কর! ওরা যতদূর যাবে, যে সব গ্রামে অবস্থান করবে, তোমরা সেই সব গ্রাম লুণ্ঠন করবে, ভস্মীভূত করবে! যেন ভারতের হিন্দুরা গ্রীক বাহিনীর নামে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, সুখ ও শান্তির জন্য বশ্যতা স্বীকার করতে উন্মুখ হয়।

গ্রীকেরা একটির পর একটি গ্রাম লুণ্ঠন করে, অগ্নিদগ্ধ করে, পুষ্যমিত্রের অনুসরণ করলো; নরনারী ও শিশুর রক্তে তাদের পথ পিচ্ছিল হয়ে উঠলো।

একত্রিশ

গ্রীক সম্রাজ্ঞী সেদিন মালবিকাকে বললেন—অবিরাম নৃত্যগীত আর ভালো লাগে না, আজ একটা গল্প শোনাও—তোমার দেশের কাহিনী।

মালবিকা গল্প বলতে সুরু করলো :

অনেক—অনেক দিন আগের কথা। কিরাত, বনবাসী ও যবনদের আক্রমণে ভারতভূমি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। লুণ্ঠন ও অরাজকতা দেশের বুকে বিস্তৃতি লাভ করছে, মগধের শাসন-রীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রজাগণের সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হয়েছে, সমৃদ্ধি হচ্ছে লুণ্ঠিত। শান্তি নেই, ধর্ম নেই, শুধু প্রাণভয়। নরেন্দ্র বিহারে (নালন্দা) বৌদ্ধ স্থবির-মহাস্থবিরদের মহাসভা বসেছে,—ভগবান্ তথাগত মানবজীবনে যে মহাশান্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বুঝি ব্যর্থ হ'ল! সারা দেশের বুকে দুর্ভিক্ষ ঘনিয়ে আসছে, পূর্বাহ্ণেই এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা না করলে কি হবে!

বিহার-অধ্যক্ষ মহাস্থবির শ্রীসব্ হভদ্র বললেন—ভগবান তথাগত শ্রাবস্তি-

পুরের দুর্ভিক্ষ নিরসনের জন্য যথাসাধ্য করেছিলেন। সেবার চেয়ে বড় ধর্ম নেই, সদ্ধর্মের প্রধান কীর্তিই হচ্ছে সেবাধর্ম। আজকের এই দুর্দিনে সেই সেবাধর্মই আবার নূতন করে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সেবার আরেকটা দিক্ও আছে; বুভুক্ষু নরনারীরা যার সেবা গ্রহণ করে তাকে সহজে বিস্মৃত হয় না। ভগবান্ তথাগতের বাণী প্রচারের দিক্ থেকে—সদ্ধর্ম প্রসারের দিক্ থেকে এই সেবাধর্ম বিশেষ কার্যকরী হবে। সদ্ধর্মের প্রসারতা যাঁরা চান, এই বুভুক্ষু নরনারীদের ভার তাঁদেরকেই গ্রহণ করতে হবে।

মহাস্থবির থামলেন; উপস্থিত ভিক্ষুকগণ প্রশ্ন তুললেন—কি ভাবে তা সম্ভব হবে?

শ্রীসব্ হভদ্র বললেন—সম্ভব হবে একমাত্র উপায়ে। অন্ন আজ দুর্মূল্য, সেই অন্ন ক্রয়ের সামর্থ্য আজ জনগণের নেই। সেই অন্ন ক্রয়ের অর্থ যাতে আমাদের হয়, সর্বত্র থেকে যাতে আমরা অন্ন ক্রয় করে দরিদ্র জনগণের মাঝে বিতরণ করিতে পারি, সেইজন্য অর্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই অর্থ সংগ্রহ করা সহজ কাজ নয়, যাদের অর্থ নেই তারা অর্থ দেবে কোত্থেকে? সে জন্য আমাদের অন্য পন্থা গ্রহণ করতে হবে। পূর্ব সমুদ্রের মাঝে সুবর্ণদ্বীপে এক রস-শাস্ত্র (কেমিষ্ট্রী)-বিশারদ সাধু থাকেন, তিনি অন্যান্য ধাতুকে সুবর্ণে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া জানেন। তাঁর কাছ থেকে জনসেবার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যাকে আয়ত্ত করে আনতে হবে। আপনাদের মধ্যে একজনকে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। জ্যোতিষী ভবিষ্যৎবাণী করেছে, এই দুর্ভিক্ষ মহামারীর রূপ পরিগ্রহ করবে আর দু'পক্ষ পরে। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে যিনি এই কাজে অগ্রসর হবেন তাঁকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এই বিদ্যা আয়ত্ত করে ফিরে আসতে হবে। এর বেশী সময় অতিবাহিত করা চলবে না!

মাত্র তিন সপ্তাহ! সকলের মুখেই যাবার জন্য আগ্রহ জেগেছিল, কিন্তু মাত্র তিন সপ্তাহের কথা শুনে সকলেই স্তব্ধ হয়ে রইল। সহসা সেই ভিক্ষু-সঙ্ঘের মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালেন এক যুবক, বললেন—থের, সাত বৎসর বয়সে মৃত্যুর সীমারেখা থেকে আপনি আমার জীবন রক্ষা করেন, সেই থেকে আমি রসায়ন চর্চাতেই আত্মনিয়োগ করেছি। আপনার অনুমতি পেলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। যদি ব্যর্থ হই, এ মুখ দেখাবার জন্য আপনাদের কাছে আর ফিরবো না।

ধন্য ধন্য রব উঠলো, মহাস্থবির যুবককে আশীর্বাদ করলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে এক সম্মোহিত বৃক্ষের দুইটি পাতা একত্র করে যুবক তার উপর দুই পদ রক্ষা করলেন, তারপর কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, পত্র-পাদুকা যুবককে শূন্যপথে বহন করে অদৃশ্য হ'ল।

এই যুবক তিন সপ্তাহ মধ্যে স্বর্ণপ্রস্তুত প্রক্রিয়া শিক্ষা করে নরেন্দ্র বিহারে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা প্রভূত স্বর্ণ প্রস্তুত করে ভারতের দূর-দূরান্তরের জনপদ থেকে অন্ন ক্রয় করে দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের অন্নকষ্ট দূর করেন। আর্যাবর্তের ইতিহাসে এঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ইনি ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহাস্থবির নাগার্জুন। ভারতভূমিতে কত রাজ্য ও রাজার উত্থান-পতন ঘটেছে, সিংহাসনের লোভে কত সম্রাট্ লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মৃত্যুর কোলে তুলে দিয়েছেন, রুধির-পিচ্ছিল পথে কত সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে; কিন্তু মহাকালের আবর্তনে তাঁদের নাম অবলুপ্ত হয়ে গেছে। জনগণের মনে শুধু জেগে আছে মহা-সেবক নাগার্জুনের নাম মহাকাল তাঁকে অবলুপ্ত করতে পারেনি। সেবা ধর্ম কাল জয় করেছে।*

—সেবা-ধর্ম! সেবা-ধর্ম!—গ্রীক সম্রাজ্ঞী আপন মনে কথাটা বার কয়েক পুনরাবৃত্তি করলেন, তারপর বললেন—তোমাদের তথাগত বলেছিলেন 'সেবাই পরম ধর্ম'। কিন্তু তাঁর সময়েও তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত বন্ধ করতে পারেন নি, শুনেছি তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে রাজায় রাজায় লড়াই বেধে গিয়েছিল। সেবার চেয়ে মানুষের লোভ বড়। স্বার্থে আঘাত লাগলে প্রেমের কথা মানুষের আর মনে থাকে না।

সম্রাজ্ঞী চুপ করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে থেকে মালবিকা বললো—আপনি মনে যেন কোন আঘাত পেয়েছেন বলে মনে হয়।

সম্রাজ্ঞী বললেন—আমার এক ভাই ছিল, সহোদর কনিষ্ঠ ভাই। সম্রাটের অধীনে সে ছিল সেনানায়ক। যুদ্ধকে কিন্তু সে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারে নি, রক্তারক্তি তার ভাল লাগেনি। সব ছেড়ে দিয়ে সে সন্ন্যাসী হয়ে গেল। কিন্তু দেশবাসী সেজন্য তাকে ক্ষমা করলো না, তাকে হত্যা করলো। আমরা যখন

* ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, এম্, এ, এফ, সি, এস্, পি, এইচ্, ডি লিখিত 'বৈজ্ঞানিক জীবনী' থেকে।

খবর পেলাম তখন আর করার কিছু নেই। আজও তার মুখখানি আমার মনে পড়ে, বুকের মাঝে কেমন যেন কর কর করে ওঠে! মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যদি সম্রাজ্ঞী না হয়ে একজন সাধারণ চাষী হ'তাম, আমার ভাইকে কাছে কাছে রাখতাম, তা হ'লে বোধ হয় এমন ভাবে তাকে হারাতে হ'ত না!

গ্রীক সম্রাজ্ঞীর চোখ সজল হয়ে উঠলো।

মালবিকা ঠিক এমনই এক মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিল, এ সুযোগ তার কাছে অপ্রত্যাশিত। ধীরে ধীরে সে বললো—আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে মহারাণী!

—বল ?

—ভরতপুরের দুর্গ জয় করে সম্রাট্ যাঁকে বন্দী করে এনেছেন তিনি আমার ভাই, আমি তাঁর সেবা করতে চাই। শুনেছি সে মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে, হয়তো বাঁচবে না। তার শেষ সময়টুকু আমি তার কাছে থাকতে চাই।

—উত্তম, আমি অনুমতি দিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যায় মালবিকা অগ্নিমিত্রের বস্ত্রাবাসে এলো।

সান্ত্রীরা প্রথমে বাধা দিয়েছিল কিন্তু সম্রাজ্ঞীর নামাঙ্কিত অঙ্গুরী ছিল মালবিকার কাছে, তা দেখা মাত্রই সান্ত্রীরা তার পথ ছেড়ে দিল। একজন সঙ্গে করে এনে পৌছে দিল বন্দীর শিবিরে।

মালবিকা প্রথমে বস্ত্রাবাসের জানালা দিয়ে উঁকী মারলো। ভিতরে অগ্নিমিত্র একটি খাটিয়ায় শুয়ে ছিল, নাগসেন বসেছিলেন তার পাশে, দেহের স্থানে স্থানে তিলবাটা মধু ও ঘৃতের প্রলেপ* দিচ্ছিলেন। দু'জনে কথা হচ্ছিল, মালবিকা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনলো:

অগ্নিমিত্র—মহাথের আপনি আমাকে সুস্থ করার জন্য কেন চেষ্টা করছেন? আমি সুস্থ সবল হয়ে উঠলেই তো ওরা শাস্তিবিধান করবে।

নাগসেন—কে কখন কি করবে তা বলা বড়ই কঠিন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা কখন কি রূপ গ্রহণ করে তা বলা যায় না।

—কিন্তু ভবিষ্যৎটা যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মহাথের, আপনি যতই আশা দিন, আমি তো বুঝতে পারছি!

* চরক-সুশ্রুত নির্দেশিত প্রাচীন ভারতের ক্ষত ও বেদনা নিরাময়ের প্রলেপ।

—ভুল বুঝছো কুমার। কখনও কোন বিষয়ের বর্তমানটুকু দেখেই তার পরিণতির বিচার করা চলে না, যেটা আপাতঃ দৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারই প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী।

—আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যবনদের কবল থেকে হিন্দুস্থানকে রক্ষা করা। তা তো পারলাম না, আর যে পারবো তার সম্ভাবনাও নেই!

—কার মধ্যে কি সম্ভবনা থাকে তা মানুষ জানে না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত অবধি মানুষ তার ভবিষ্যৎ বুঝতে পারে না, সেইজন্যই মানুষের বেঁচে থাকার মূল্যটাই সবচেয়ে বেশী এবং বর্তমানে যা করা যায় ফলাফল না ভেবে সেইটুকু করাই তার কর্তব্য। কে জানে, আজ যে বন্দী, কাল সে সিংহাসনে বসতে পারে! আজ যে রাজা কাল সে হতে পারে রাজ্যহীন পলাতক!

অগ্নিমিত্র কি যেন প্রশ্ন করতে গেল, কিন্তু নাগসেনের মুখের পানে চোখ পড়তেই সে থেমে গেল। মহাস্থবিরের দৃষ্টি তার মুখের পানে নেই, বস্ত্রাবাসের উন্মুক্ত দ্বারপথ দিয়ে সে দৃষ্টি ভেসে গেছে আকাশের পানে, সুদূর দিগন্তে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম রেখায় মহাস্থবির কি যেন দেখে নেবার চেষ্টা করছেন।

—আমি ভিতরে আসতে পারি?—দ্বারপথে মালবিকাকে দেখা গেল।

নাগসেন বললেন—স্বাগতম্!

—প্রণাম গ্রহণ করুন মহাস্থবির! নমস্তে আর্য! মালবিকা ভিতরে প্রবেশ করলো।

—আসন গ্রহণ কর মা!

মালবিকা অগ্নিমিত্রের শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো, বললো—আমি আপনাদের দেখতে এলাম। প্রসঙ্গতঃ আমার পরিচয় দেবার প্রয়োজন বোধ করি ·

নাগসেন তার মুখের পানে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—আমি তোমায় চিনি মা, তুমি ভরতপুরের মণ্ডলাধ্যক্ষ কুমারসেনের বোন।

—বর্তমানে আমি গ্রীক সম্রাটের বন্দিনী। নৃত্য-গীতে গ্রীক সম্রাজ্ঞীর মনোরঞ্জন করে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি পেয়েছি। শুনলাম দাদাকে বন্দী করে আনা হয়েছে, তিনি এখন কোথায় আছেন?

—কুমারসেন? তাঁকে এরা বন্দী করতে পারে নি, তিনি জীবিত কি মৃত তাও জানা নেই। ইনি ছিলেন সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে, এঁকেই বন্দী করে

আনা হয়েছে। ইনি তোমার দাদার বন্ধু, হনুমানগড়ের মহামাণ্ডলিক পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র।

মালবিকা ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হয়ে পরলো, তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো—আপনি এখন কেমন আছেন আর্য?

অগ্নিমিত্র বললো—বন্দীর পক্ষে ভালো থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না দেবী! তাদের জীবনের গতি এক লক্ষ্যে গিয়ে পৌছায়, তা হচ্ছে মৃত্যু। শত্রুপক্ষের জল্লাদের হাতে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ যাওয়াই আমার কাম্য ছিল রাজকুমারী!

নাগসেন বললেন—সবই তথাগতের ইচ্ছা।

মালবিকা নাগসেনের পানে ফিরে প্রশ্ন করলো—আপনার রোগী কতদিনে শয্যাত্যাগ করতে পারবেন বলে আপনার মনে হয়?

নাগসেন বললেন—শয্যাত্যাগ করা এখনও কঠিন নয়। বাহুতে আঘাত লেগেছিল, তাতে উত্থানশক্তি ও চলচ্ছক্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা নয়। তবে অত্যধিক রক্ত ক্ষরণে দেহ দুর্বল হয়ে গেছে, সেইজন্য আমি ওকে উঠতে নিষেধ করেছি। নিয়মিত মগুপান করে আরো কয়েকটী দিন একান্তে বিশ্রাম করলে আবার পূর্বশক্তি ফিরে পাবে।

মালবিকা বারেক কি যেন চিন্তা করলো, তারপর অন্যান্য দু' একটী কথা বলে বিদায় গ্রহণ করলো।

বত্রিশ

অমাবস্যার রাত। এক আকাশ অন্ধকার মালবিকার চোখের উপর জমাট বেঁধেছে। চোখে ঘুম নেই। বস্ত্রাবাসের জানালা দিয়ে সে তারাগুলির পানে তাকিয়ে আছে। এই বন্দীবাস থেকে তার মুক্তি চাই। এবং তার মুক্তির সাথী হবে ওই অগ্নিমিত্র। একজন পুরুষকে সঙ্গে না নিলে এই বন্ধুর পথে শত্রু-রাজ্যে পথ চলা কঠিন হবে। সম্রাজ্ঞীর নামাঙ্কিত অঙ্গুরী হবে সেই যাত্রাপথের সহায়। কিন্তু পথ কই? সময় কই?

উষার পূর্বাভাসে পূব দিকে সবে মাত্র শুভ্রতা জাগিয়েছে, এমন সময় মালবিকা শয্যত্যাগ করলো। নিজের আরেকটী পরিচ্ছদ নিয়ে সে বস্ত্রাবাস থেকে বাহির হল। রাণীর অঙ্গুরী দেখিয়ে সে প্রবেশ করলো অগ্নিমিত্রের

বস্ত্রাবাসে। অগ্নিমিত্র তখনও শয্যাত্যাগ করে নি, মালবিকাকে দেখে সে বিস্মিত হ'ল, প্রশ্ন করলো—এমন সময়ে কি সংবাদ রাজকুমারী ?

—খবর আছে আর্য, মহাস্থবির নাগসেন কোথায় ?

—তিনি স্নানাহ্নিক করতে গেছেন।

—উত্তম। আপনাকে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।

—বলুন ?

—এখনি আপনাকে এখান থেকে বাহির হতে হবে, এবং সুস্থচিত্তে কয়েক যোজন পথ অতিক্রম করতে হবে।

—অর্থাৎ পলায়ন ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু সান্ত্রীরা পথ ছেড়ে দেবে তো ?

—আমি তার ব্যবস্থা করবো। আপনি প্রস্তুত কিনা তাই বলুন ?

—আমি সদাই প্রস্তুত।

—তা হ'লে এই মুহূর্তেই বাহির হয়ে আসুন, সূর্যোদয়ের পূর্বে অন্ততঃ আমাদের এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে হবে।

—মহাস্থবির নাগসেনের কাছ থেকে একবার বিদায় নিয়ে যাব না ?

—শুভস্য শীঘ্রম্, অনাবশ্যক কালক্ষেপ করা অনুচিত।

—উত্তম, আমি প্রস্তুত।

—মালবিকা ও অগ্নিমিত্র বস্ত্রাবাস ছেড়ে বাহির হয়ে পড়লো।

পথে তিন জায়গায় সান্ত্রীরা তাদের পথ রোধ করলো। কিন্তু সম্রাজ্ঞীর নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখে তারা পথ ছেড়ে দিল। দ্রুত পদক্ষেপে তারা গ্রীক সেনাবাস অতিক্রম করে বনভূমির পথ ধরলো। সূর্যোদয়ের তখনও বিলম্ব ছিল।

দ্বিপ্রহরে সম্রাট্ মিনান্দার সংবাদ পেলেন—বন্দী ও বন্দিনী পলায়ন করেছে।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সম্রাট্ বললেন—এ সব সেই মহাস্থবিরের ষড়যন্ত্র, সেবা করার নামে সে তাদের পলায়নের সুযোগ করে দিয়েছে।

—তাকে আমরা রজ্জুবদ্ধ করে রেখেছি।

—উত্তম, তাকে এক শুষ্ক কূপের মধ্যে নিক্ষেপ কর গে। আর মথুরা থেকে কাফিরিস্থান পর্যন্ত যত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আছে সকলকে কারারুদ্ধ করার জন্য রাজাজ্ঞা পাঠিয়ে দাও। মগধ জয় করার পর অভিষেক উৎসবের দিনে ওদের সকলকে আমি জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করবো।

তখনই সম্রাটের আদেশ পালন করার জন্য রাজপুরুষেরা তৎপর হয়ে উঠলো।

তেত্রিশ

প্রয়োগের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। গঙ্গার তীরে নিরিবিলিতে এক গাছতলায় বসে পুষ্যমিত্র কত কি ভাবছিলেন। চারিপাশে চতুর্দশীর অন্ধকার, মাথার উপর এক আকাশ ঝিক্‌মিকে তারা। গঙ্গার কুলু কলু শব্দ ভেসে আসছে। সেই অন্ধকারের পানে তাকিয়ে ভারতের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথাই তিনি ভাবছিলেন। অনেক আশা করে তিনি প্রয়াগে এসেছিলেন, আজ মধ্যাহ্নে দুর্গাধিপের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছিলেন, কিন্তু দুর্গাধিপ বলেছেন—'মগধ-সম্রাট গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না, মগধের সাহায্য না পেলে আমরা বিরাট গ্রীক বাহিনীর সঙ্গে ক'দিন যুদ্ধ চালাতে পারব? কাল প্রত্যূষেই আপনি প্রয়োগ ত্যাগ করুন, না হ'লে গ্রীক সম্রাটের রোষবহ্নি থেকে প্রয়াগ রক্ষা করা যাবে না। মগধ-সম্রাটের আদেশ ব্যতিরেকে আমি কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে পারি না, অকারণে প্রজাদের উপর দুর্যোগ ঘনিয়ে তুলতে পারি না।' এর পর আর কথা চলে না, প্রত্যূষেই তাঁকে প্রয়াগ ত্যাগ করতে হবে। গ্রীকেরা বিরাট বাহিনী নিয়ে পিছনে আসছে, তাদের প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থাই হবে না। গ্রীক বাহিনী বিনা বাধায় প্রয়াগ অধিকার করবে। তারপর এখান থেকে পাটলিপুত্র আর কতদূর! গ্রীক বাহিনীর গতি হবে স্বচ্ছন্দ, অপ্রতিহত। এতদিন ধরে গ্রীক্ বিতাড়নের যে সাধনা তিনি করেছেন তা ব্যর্থ হ'ল; এতগুলি রণহস্তী ও যুদ্ধাশ্ব লুণ্ঠন করে কোন কাজেই লাগানো গেল না। পাটলিপুত্রে গেলে মগধ-সম্রাটের যে কোন সমর্থন পাওয়া যাবে তাও তো মনে হয় না!

সহসা কে যেন তাঁকে নিম্নস্বরে ডাকলো—আচার্য পুষ্যমিত্র!

পুষ্যমিত্র পিছনে অন্ধকারের পানে তাকালেন, কিন্তু গাছপালার মধ্যে কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না। মুহূর্ত কয় পরে মনে হ'ল গাছের ছায়ায় কি যেন একটা নড়ছে। পুষ্যমিত্র কোমরবন্ধর তলোয়ারে হাত দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—কে আপনি?

মনুষ্যমূর্তি কাছে এলো। পুষ্যমিত্র উঠে দাঁড়ালেন। মূর্তি ক্রমশঃ সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো, বললো—অন্ধকারে আমাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে, না?

এবার পুষ্যমিত্র চিনতে পারলেন, আগন্তুক বজ্রাচার্য।

বজ্রাচার্য বললেন—আমি পাটলিপুত্র থেকে বরাবর আপনার কাছে এলাম, অনেক কথা আছে, বসুন।

বজ্রাচার্য ও পুষ্যমিত্র আসন গ্রহণ করলেন। কথাবার্তা সুরু হ'ল।

চৌত্রিশ

মগধের মহাবলাধ্যক্ষ বসে বসে সতরঞ্চি খেলছেন। একাই খেলছিলেন। সম্রাটের সঙ্গে খেলতে খেলতে একটা চাল ভুল হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যায়, তার ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই মাৎ হয়ে গেছেন। চালটা তাঁর মনে আছে, রাত্রে আহারাদির পর ছকের উপর রাজা মন্ত্রী সাজিয়ে তিনি সেই চালটা ঠিক করে দেবার চেষ্টা করছেন, দু'পক্ষের খেলাই তিনি খেলছেন একা একা। সবে প্রতিপক্ষকে মাৎ করার চালটা স্থির করেছেন এমন সময়ে দৌবারিক এসে সংবাদ দিল—সম্রাজ্ঞী আপনাকে আহ্বান করেছেন।

—কে, সম্রাট্? এত রাত্রে!

—সম্রাট্ নন্, সম্রাজ্ঞী।

—সম্রাজ্ঞী এত রাত্রে আমাকে আহ্বান করেছেন! ব্যাপার কি বল ত'?

—আপনার জন্য তিনি মন্ত্রণা-কক্ষে অপেক্ষা করছেন।

মহাবলাধ্যক্ষ কিস্তির চাল দিতে ভুলে গেলেন, বারেক দৌবারিকের মুখের পানে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা, তুমি যাও, আমি এখনি যাচ্ছি।

দৌবারিক প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল, মহাবলাধ্যক্ষ কয়েক লহমা স্থাণুর মত বসে রইলেন। ত্রিশ বৎসর ধরে তিনি মহাবলাধ্যক্ষের পদে আছেন, আজ অবধি একটীও যুদ্ধবিগ্রহের সম্মুখীন হ'তে হয় নি। পিতা ছিলেন

মহাবলাধ্যক্ষ, সেই সূত্রে উত্তরাধিকারের গৌরবে তিনি এই পদ পেয়েছেন। কিন্তু ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনও তো রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাঁর আহ্বান আসে নি! আজ নিশ্চয়ই কোন অচিন্তনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এত রাত্রে যখন আহ্বান এসেছে তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সহজসাধ্য সাধারণ কিছু নয়! তাড়াতাড়ি হাঁটুতে একটা প্রকাণ্ড পট্টি বেঁধে তিনি চারপাইয়ায় গিয়ে উঠলেন। চারজন বরকন্দাজ তাঁকে বহন করে নিয়ে এল প্রাসাদে। কোন রকমে একজন দৌবারিকের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি রাণীমার সামনে উপস্থিত হলেন।

সম্রাজ্ঞী বললেন—আপনার কি হ'ল?

—আর বলেন কোন, সোপানে পদস্খলনের ফলে বড় আঘাত পেয়েছি, ভালোভাবে চলতে পারছি না। কয়েকটা দিন একান্ত বিশ্রামের প্রয়োজন; কিন্তু আপনার আহ্বান তো অবহেলা করতে পারি না, তাই বাড়ী থেকে বেরুতে হল।

—বসুন।

—হাঁটু ভেঙে বসতে পারবো না, মহাদেবী।

মহারাণী কিছুক্ষণ সেনাপতির মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন—যে জন্য আপনাকে প্রয়োজন হয়েছিল তা আর সম্ভব নয়, আপনি গৃহে গিয়ে বিশ্রাম করুন গে।

মুখখানি যন্ত্রণাকাতর করে সেনাপতি দৌবারিকের কাঁধে ভর দিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, এমন সময়ে মন্ত্রণা-কক্ষের দ্বারপথে বজ্রাচার্যকে দেখে গেল।

—শুভমস্তু মহারাণী! মহাবলাধ্যক্ষ এখানে এসেছেন শুনে বরাবর আমি ভিতরে চলে এলাম, ক্ষমা করবেন। তারপর মহাবলাধ্যক্ষ, আপনার হাঁটুতে কি হ'ল?

মহাবলাধ্যক্ষ কোন উত্তর দিলেন না, হাঁটুতে একবার হাত বুলিয়ে 'উঃ' বলে যন্ত্রণাসূচক একটা শব্দ করলেন শুধু।

বজ্রাচার্য মৃদু হেসে বললেন—আপনার হাঁটুতে আঘাত লেগেছে বুঝি? বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন বুঝি? আহাঃ! আচ্ছা আসুন, আমি সারিয়ে দিচ্ছি—

মহাবলাধ্যক্ষের সামনে নত হয়ে পায়ের পট্টিতে তিনি হাত দিলেন, সেনাপতি বলে উঠলেন—আহা-হা; করেন কি? করেন কি?

—দেখুন না, আপনাকে এখুনি আমি নিরাময় করে দিচ্ছে,—বলে ক্ষিপ্রহস্তে তিনি পায়ের পট্টিটা সব খুলে দিলেন; তারপর হাঁটুতে মৃদু একটা করাঘাত করে বললেন—মহাবলাধ্যক্ষ, ত্রিশ বছর আপনি মগধের রাজস্ব থেকে বেতন নিচ্ছেন, সে কি মগধের দুর্দিনে মিথ্যাচরণ করার জন্য। আপনি হাঁটুতে মোটেই আঘাত পান নি, শুধু কর্মে অনিচ্ছার জন্যই মিথ্যা ভাণ করেছেন।

—কি বলছেন আপনি, আমি···

—চুপ করুন, মিথ্যা কথা বললে আপনার ওই হাঁটু সারা জীবনের মত আমি অক্ষম করে দেব। যান—

মহাবলাধ্যক্ষ দৌবারিকের কাঁধে হাত দিয়ে এক পা অগ্রসর হলেন, বজ্রাচার্য বললেন—আবার দৌবারিকের কাঁধে হাত কেন? সোজা হেঁটে চলে যান—

মহাবলাধ্যক্ষ মাথা নত করে সহজ ভাবে হেঁটে চলে গেলেন।

বজ্রাচার্য বললেন—এই মিথ্যাচারী অকর্মণ্য লোকগুলোই আজ মগধ সাম্রাজ্যকে ধ্বংসোন্মুখ করেছে।

সম্রাজ্ঞী এবার কথা বললেন, বললেন—উনি আজ সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন।

—মিথ্যা কথা, কাজের ভয়ে আহতের ভাণ করেছে। আপনাকে বোঝানো সহজ কিন্তু আমার দৃষ্টিকে ফাঁকী দেওয়া তত সহজ নয় মহাদেবী! যাক্, ওসব অকর্মণ্য কর্মভীত কর্মচারীর কথা ছেড়ে দিন, আমরা এখনকার কর্মপদ্ধতি নির্ধরণ করি। গ্রীক বাহিনী প্রয়াগের উপকণ্ঠ এসে পড়েছে। তাদের প্রতিরোধ করার জন্য অবিলম্বে সৈন্য বাহিনীর প্রয়োজন। অবিলম্বে নতুন সেনানায়ক নিযুক্ত করে তাকে প্রয়াগে পাঠাতে হবে। প্রয়াগ দুর্গের পতন হ'লে পাটলিপুত্রের সমূহ বিপদ।

—কিন্তু সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে কে?

—উত্তরাপথের ধর্মচক্র বিশ্বস্ত পাত্র নির্বাচন করে দিয়েছেন। আপনি যদি তার উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেন, তা হ'লে আমরা সুখী হব।

—কে তিনি ?

—হনুমানগড়ের মহামণ্ডলেশ্বর, তক্ষশীলার রণনীতির অধ্যাপক আচার্য পুষ্যমিত্র।

—হনুমানগড় তো বহুদিন যবনের করতলগত হয়েছে।

—আচার্য জীবিত আছেন, ধর্মচক্রের মহাস্থবিরেরা তাঁকে আমার সঙ্গে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

—উত্তম, তাঁকে আপনি ভিতরে আহ্বান করুন।

—আপনিই কি নিয়োগ করবেন ?

—হ্যাঁ! সম্রাট্‌ সন্ধ্যা থেকেই মাথার যন্ত্রণায় শয্যা গ্রহণ করেছেন, তাঁর সুস্থ হবার জন্য অপেক্ষা করতে হ'লে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হবে। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান্‌!

বজ্রাচার্য আর কিছু বললেন না, পুষ্যমিত্র বাহিরে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁকে ভিতরে ডেকে আনলেন। মহারাণী পুষ্যমিত্রের আপাদ-মস্তক একবার দেখে নিলেন, তারপর বললেন—মগধের সেনাবাহিনী পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে আপনি প্রস্তুত আছেন ?

—আমি প্রস্তুত।

—কিন্তু তৎপূর্বে দেশের নামে ও ধর্মের নামে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে গ্রীকদের পরাজিত না করে আপনি ফিরে আসবেন না।

—গ্রীকদের বিতারণ করার ব্রত গ্রহণ করে গত সাত বৎসর ধরে আমি কোজাগরী সন্ন্যাস পালন করছি। আমার একমাত্র পুত্র গ্রীকদের হস্তে নিহত হয়েছে, আমার স্ত্রী অপমানের ভয়ে আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে। রক্ত দিয়ে রক্তের দাগ আমি মুছে ফেলতে চাই। সেই প্রতিজ্ঞা কি আবার নতুন করে গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে রাণী-মা ?

মহারাণী কিছু বলার আগেই বজ্রাচার্য বললেন—আপনার পুত্র নিহত হয়নি আচার্য, ভরতপুরের দুর্গে আহত হয়ে সে সম্প্রতি গ্রীকদের হাতে বন্দী হয়েছে। তাকে উদ্ধার করতে হ'লে গ্রীকদের বিধ্বস্ত করতে হবে, পিতা হিসাবে সে দায়িত্ব আপনার উপরেই বর্তেছে।

—আমার পুত্র ?

হ্যাঁ, আপনার পুত্র অগ্নিমিত্র।

আনন্দ ও চাঞ্চল্য মুহূর্তেকের জন্য পুষ্যমিত্রকে বিহ্বল করে তুললো। যে পুত্রকে তিনি মৃত বলে ভেবেছিলেন, যে পুত্রের আশা তিনি চিরদিনের মত ত্যাগ করেছিলেন, সে জীবিত আছে শুনে তিনি নূতন সম্ভাবনায় উদ্বেল হয়ে উঠলেন।

রাণীমা এবার কথা বললেন—আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন, প্রত্যুষেই আপনাকে যাত্রা করতে হবে।

পুষ্যমিত্র নিজেকে তখন সংযত করে নিয়েছেন, বললেন—কিন্তু রাণীমা…

—কি বলুন ?

—আমি শুনেছি পাটলিপুত্রে মাত্র আশী হাজার সৈন্য আছে, আর প্রয়াগ দুর্গে আছে দশ হাজার। কিন্তু মিনান্দারের অধীনে গ্রীক্ সেনা আছে প্রায় চারলক্ষ। আমাদের আরো সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে, তার জন্য অর্থের প্রয়োজন।

রাণীর মুখে বারেক চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো, তারপর বললেন—উত্তম প্রয়োজনীয় অর্থ আপনি পাবেন।

রাণীমা কোষাধ্যক্ষকে ডেকে তখনই আদেশ দিলেন—রাজগৃহের সোনভাণ্ডার গুহায় আমাদের যে স্বর্ণ সঞ্চিত আছে তা অবিলম্বে পাটলিপুত্রে আনার ব্যবস্থা করুন।

পঁয়ত্রিশ

প্রভাতে রাজকীয় ভেরীঘোষা পাটলিপুত্রের রাজপথগুলি প্রতিধ্বনিত করে তুললো : গ্রীকেরা মগধ আক্রমণ করেছে, শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হবে—ধর্ম, দেশ ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে। সম্রাটের আদেশ—প্রত্যেকটি যুবককে অস্ত্রসজ্জা করতে হবে। তোমরা রাজার অস্ত্রাগারে সকলে সমবেত হও, অস্ত্র গ্রহণ কর।

ঘোষকের চারিপাশে নাগরিকের দল সমবেত হয়।

ঘোষক ঘোষণা করে—আমরা পরাধীনতা বরণ করে নিতে পারি না, হিন্দুস্থানের নরনারীরা গ্রীকদের ক্রীতদাসের পর্যায়ে নামতে পারে না। ধর্ম ও সমাজকে, শিশুকে ও নারীকে রক্ষা করার জন্য সাম্রাট্ তোমাদের

আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের তরুণ ও যুবকের দল, এসো, দলে দলে তোমরা সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দাও, শত্রুকে বিধ্বস্ত কর।

ভীড়ের মধ্যে থেকে এক যুবক প্রশ্ন করলো—স্বাধীন পরাধীন আমাদের কি আসে যায়? আমরা লড়াই করে মরবো আর মহারাজা বসে বসে দাবা খেলবেন! সম্পদ্ ও সাচ্ছন্দ্য যা কিছু সবই রাজার প্রাপ্য, আর প্রাণ খরচ করবে গরীব প্রজারা? চমৎকার যুক্তি!

আর একজন বললো—সম্রাট্ যদি নিজে লড়েন তবেই আমরা লড়তে পারি। তাঁকে থাকতে হবে আমাদের পুরোভাগে।

সবাই বললো—ঠিক কথা। ঠিক কথা।

ঘোষক বললো—সম্রাট্ নগর ছেড়ে যেতে পারেন না, যাবেন সেনাপতি।

—তা হ'লে তিনি একাই লড়বেন।

কিন্তু কলরব সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল যখন ঘোষক ঘোষণা করলো যে যারা সৈনিক হবে সম্রাট্ তাদেরকে যথারীতি বেতন দেবেন, তাদের আত্মীয়দের ভূমিদান করবেন; কারণ যদি রণক্ষেত্রে কেউ নিহত হয় তা হলে তার পোষ্যেরা যেন উপবাস না করে।

এবার দরিদ্র শ্রোতাদের মধ্যে কিছুটা ঔৎসুক্য প্রকাশ পেল। ঘোষককে ঘিরে এবার তারা প্রশ্ন সুরু করলো—কতখানি ভূমি দেব? বেতন কতমুদ্রা?

বেলা প্রথম প্রহর শেষ হ'তে-না-হতেই পাটলিপুত্রের প্রাসাদ-দ্বারে একে একে যুবকেরা আসতে লাগলো সেনা-বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর থেকে প্রাসাদ-দ্বারে যুবকদের জনতা দেখা দিল—দেশ ও ধর্মকে রক্ষা করার জন্য যারা সংগ্রাম করতে চায় তাদের জনতা।

মহাবলাধ্যক্ষ গৃহে এক দাবার ছক পেতে ঘুঁটি সাজিয়ে একটির পর একটি চাল ঠিক করছিলেন, পুত্র অজয়নাথ ঘরে এসে ঢুকলো, বললো—বাবা, আপনি এখনও দাবা খেলছেন? যুদ্ধে যাবেন না?

মহাবলাধ্যক্ষ বিরক্তির সঙ্গে একবার চোখে তুলে তাকালেন, তারপর বললেন;—আমি অসুস্থ।

—আপনি অসুস্থ!

—হুঁ।

অজয়নাথ আর কিছু বলতে সাহস পেল না, কক্ষ ত্যাগ করলো।

একটু পরেই গৃহিণী এসে উপস্থিত হলেন, ঝঙ্কার দিয়ে বললেন—কী, তুমি এখনও দাবার চাল কষছ, ওদিকে ছেলে যে যুদ্ধে চললো!

—গেল তো আমি কি করবো?

—আমি কি করবো? একমাত্র ছেলে, আমার সবে-ধন নীলমণি—বংশের প্রদীপ, সে-ই যদি গেল তাহলে আমাদের আর রইল কি, গ্রীকদের সঙ্গে লড়তে গেলে সে কি আর ফিরবে? নিজে তো ভয়ে ঘর থেকে বেরোও না, আর ছেলেটাকে যমের মুখে ঠেলে দিচ্ছ? এখনই যাও মহারাজকে বলে ওকে নিরস্ত কর গে—

অজয়নাথ মায়ের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, বললো—না মা, তা আর হয় না। আমি সেনাপতির পুত্র, আমি যুদ্ধে না গেলে জনসাধারণ কি বলবে? পিতা তা হলে সকলের চোখে অত্যন্ত হেয় হয়ে পরবেন।

মা বললেন—ওসব মান-অপমানের কথা তুই রাখ্, তোর কিছুতেই যাওয়া হবে না। তোকে ওই যমের মুখে ঠেলে দিতে আমি পারবো না। গ্রীকদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে আজ অবধি কেউ ফিরেছে? হয় মরেছে, না হয় বন্দী হয়েছে। বন্দীদের পায়ে শিকল বেঁধে ওরা দেশে নিয়ে গিয়ে বেচে, তা জানিস তো?

—এবার আর ওদের দেশে যেতে হবে না, মা! এবার এমন লড়াই হবে যা গ্রীকেরা কখনও ভাবে নি। দেশশুদ্ধ ছেলে এবার সৈন্য হচ্ছে!

—সে যে হচ্ছে হোক্ গে, তোর কিছুতেই যাওয়া হবে না।

শেষ অবধি গৃহিণীর কথায় মহাবলাধ্যক্ষকে গৃহ থেকে বাহির হ'তে হ'ল।

মহাবলাধ্যক্ষ বরাবর রাজ-সমীপে গেলেন না, এক অধিনায়কের বাড়ী হয়ে গেলেন। অনেক মুখরোচক তথ্য আহরণ করে তিনি রাজ-সমীপে উপস্থিত হলেন। রাজবৈদ্য তখন সম্রাট্‌কে বটিকা সেবন করাচ্ছেন। সম্রাট বৃহদ্রথ মহাবলাধ্যক্ষকে দেখে খুশি হলেন, বললেন—যথা সময় এসে পড়েছ; এসো, এক হাত খেলা যাক!

রাজবৈদ্য বললেন—কিন্তু মহারাজ, বেশীক্ষণ একভাবে উপবেশন করে মস্তিষ্ক চালনা করা আপনার পক্ষে এখন অনুচিত।

—কিছু না, কিছু না। খেললে আমি বরং বেশী সুস্থ বোধ করি।

—আপনার ধমনীর গতি বড় দুর্বল, আপনার একান্ত বিশ্রামের প্রয়োজন।

—তুমি আর বক' না রাজবৈদ্য, আমার নিজের শরীর কি আর আমার চেয়ে তুমি ভাল বুঝবে? নাও, সেনাপতি, দাবা সাজাও।

রাজবৈদ্য প্রস্থান করলেন। মহাবলাধ্যক্ষ ছকের উপর বোড়ে সাজাতে সাজাতে কথা পাড়লেন—মহারাজ, শুনেছেন? সোন-ভাণ্ডারের সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করে রাণীমা গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োগ করছেন?

রাণীমা সম্রাটের কাছে কথাটা গোপন রেখেছিলেন, সেনানায়কের মুখে কথাটা শুনে সম্রাট্ বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন—তা তুমি সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে যাচ্ছ তো।

—না মহারাজ, আমি রাণীমাকে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলাম। জানেন তো মহারাজ, এক এক সময়ে এক একটি জাতি জগতের শীর্ষে গিয়ে ওঠে, তাদের গ্রহ তখন তুঙ্গী। গ্রীকদের আজ সেই উত্থানের সময়। এখন তাদের বিপক্ষে যারাই দাঁড়াবে তারা যতই শক্তিমান হোক না কেন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আমি রাণীমাকে সেই কথাই বলেছিলাম, কিন্তু রাণীমা আমার কথা শুনলেন না। সেই যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীটী আছে—বজ্রাচার্য, তারই মন্ত্রণায় রাণীমা যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করে নতুন সেনাপতির অধীনে মিনান্দারের বিরুদ্ধে অভিযান করছেন।

—নতুন সেনাপতি? কই, আমি তো কিছুই জানি না!

—উত্তরাপথের ধর্মচক্র লোক নির্বাচন করে দিয়াছেন। সংগ্রামকে পরিহার করার জন্য, প্রজাদের আসন্ন অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আপনি যে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন যিনি সেগুলি লুঠ করেছেন, তিনি হয়েছেন এই অভিযানের অধিনায়ক। তাঁর নাম আচার্য পুষ্যমিত্র।

বৃহদ্রথ কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলেন সেনাপতির মুখের পানে, কথাটা বুঝতে তাঁর কিছুক্ষণ সময় লাগলো। তারপর প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, সোন-ভাণ্ডারের সব সঞ্চয়ই কি মহারাণী গ্রহণ করেছেন?

—তা তো বলতে পারি না, গিয়ে দেখতে হয়।

—বেশ, চল, আমি এখনই যাব।

সম্রাট্ করতালি দিলেন। দ্বারে প্রতিহারী অপেক্ষা করছিল, ভিতরে এসে দাঁড়ালো। বৃহদ্রথ বললেন,—আমার হস্তী প্রস্তুত করতে বল, আমি এখনি রাজগৃহে যাব।

—আপনি অসুস্থ, রাজবৈদ্য আপনাকে গৃহের বাহির হ'তে নিষেধ করেছেন, প্রভু!

—কী, তুমি ভুলে যাচ্ছ তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ।

—রাণীমারও অনুরূপ আদেশ আছে।

—মহারাণীকে গিয়ে বল গে, মগধ সম্রাট্ মহারাণীর অধীন ন'ন, তাঁর উপর কারো আদেশ চলবে না। আমার হাতী এখনই প্রস্তুত হওয়া চাই।

—এ আদেশ নয় প্রভু, আপনার জীবনরক্ষার জন্য এটুকু প্রয়োজন।

—আবার কথা? যাও, আদেশ পালন কর গে।

দৌবারিক নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

সম্রাট্ কাঁপতে কাঁপতে বললেন— কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

সেনাপতি এবার মৃদু হেসে বললেন—স্বাস্থ্যের কারণে আজ আপনি প্রাসাদ-মধ্যে নজরবন্দী!…প্রতিহারী, তুমি বাহিরে গিয়ে অপেক্ষা কর গে—

সম্রাট্ বললেন—কিন্তু আমি এ তো সইব না। আমি এখনই এর প্রতিকার করতে চাই।

অত ব্যস্ত হবেন না সম্রাট্—বিপদি ধৈর্য্যম্। আপনি চুপ করে থাকুন, আমি ইতিমধ্যে সোন-ভাণ্ডার গুহার সব তথ্য আহরণ করি।

—বেশ, তুমি যাবার ব্যবস্থা কর, আমি আজ মধ্যরাত্রে ছদ্মবেশে প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাজগৃহে যাত্রা করবো।

এর পর খেলা জমে না।

অল্পক্ষণ পরে সেনাপতি গৃহে ফিরলেন, গৃহিণীকে বললেন—দেখ, সেনা বাহিনী আজ থেকে যুদ্ধযাত্রা করবে। অজয়কে বুঝিয়ে ব'ল, এখন না যায়, এই ক'টা দিন বাদ দিয়ে যেন ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা করে।

—তা'তে আর কি সুবিধে হবে?

—ব্যাপার যা পাকিয়েছে তা'তে শেষ অবধি বোধ হয় আর যুদ্ধে যেতে হবে না, মগধ সম্রাট্ যুদ্ধের ব্যয়ে কোষাগার শূন্য হবার ভয়ে আগেই সন্ধি করবেন।

ছত্রিশ

মহাস্থবির নাগসেন যে কূপটার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন সেটা শুষ্ক হ'লেও তার নীচে কিছু পাঁক জমে ছিল, অতটা উঁচু থেকে পড়লেও সেই পাঁকের জন্যই তিনি রক্ষা পান। কোমর অবধি পাঁকে নিমজ্জিত হয়েও তিনি মোটেই বিচলিত হ'লেন না, শান্ত উদাত্ত কণ্ঠে তিনি তথাগতকে স্মরণ করলেন :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি !
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি !!
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি !!!
ওঁ শ্রীমণিপদ্মে হুঁ !
ওঁ শ্রীমণিপদ্মে হুঁ !!
ওঁ শ্রীমণিপদ্মে হুঁ !!!

মহাস্থবিরের উদাত্ত কণ্ঠ কূপের চারিপাশের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে।

ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। দূরে গ্রীক-শিবিরে এক এ.টি মশাল জ্বলে ওঠে। রাত্রির স্তব্ধতা থম্ থম্ করতে থাকে প্রান্তরের বুকে।

দু'জন গ্রীক সৈনিক এসে দাঁড়ালো কূপের পাশে, কূপের মুখে নত হ য়ে অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—মহাথের, শুনছেন ?

ন.গসেনের মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ হ'ল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কে ?

—আমি অগ্নিমিত্র। আপনি এই দড়িটা কোমরে বাঁধুন, আমরা আপনাকে তুলে নিচ্ছি।

অগ্নিমিত্র খানিকটা রজ্জু নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে দু'জনে নাগসেনকে কূপ থেকে টেনে উপরে তুললো। নাগসেনের সর্বাঙ্গ তখন কর্দমাক্ত। অগ্নিমিত্র বললেন—আসুন, কাছেই একটি নদী আছে, আপনার স্নানের ব্যবস্থা করে দিই।

নাগসেন বললেন—তোমাকে তো চিনলাম, ইনি কে ?

দ্বিতীয় সৈনিক মৃদু হেসে বললো—আমাকে চিনতে পারছেন না মহাথের, আমি মালবিকা !

নাগসেন বললেন—তোমাদের দুর্জয় সাহসের প্রশংসা করি।

অগ্নিমিত্র বললেন—অদম্য শত্রুকে জয় করতে হ'লে দুর্জয় সাহসের প্রয়োজন হয় মহাথের।

কথায় কথায় অগ্নিমিত্র নাগসেনকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে চাইলেন, কিন্তু নাগসেন সম্মত হলেন না, বললেন—আমার কর্তব্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, আমি গ্রীক শিবির ছেড়ে এখন যেতে পারি না, অগ্নিমিত্র!

রাত্রি দ্বিপ্রহরে শত শত মশালের আলো জ্বলে উঠলো, গ্রীকেরা প্রয়াগ দুর্গ আক্রমণ করলো। প্রয়াগের দুর্গাধিপ কিছুটা প্রস্তুত ছিলেন। দুর্গ-প্রাকারের উপর শস্ত্রপাণি রক্ষীদের প্রস্তুত রেখেছিলেন, তাদের বিষাক্ত তীর গ্রীকদের প্রতিহত করলো। গ্রীক হস্তীযূথ দুর্গদ্বার আক্রমণ করার চেষ্টা করলো, দুর্গরক্ষীরা তীরের মুখে অগ্নিগোলক বেঁধে নিক্ষেপ করতে লাগলো। অগ্নিভীতি রণহস্তীগুলিকে চঞ্চল করে তুললো, তারা আর এগুতে পারলো না। সারারাত ধরে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা চললো, কিন্তু দুর্গপ্রাকার অবধি গ্রীক বাহিনী পৌঁছতে পারলো না। উষালোকে মিনান্দার দেখলেন কিছু গ্রীক বাহিনী আহত হয়েছে। অকারণে সেনাক্ষয় করার মত মানুষ তিনি ছিলেন না, তিনি সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে আনলেন। অপর পক্ষের সেনাবাহিনী সাড়া তুললো—জয়, মগধ-সম্রাটের জয়!

কিন্তু গ্রীকদের সঙ্গে সংগ্রামে জয়-পরাজয় অত সহজ ছিল না। প্রয়োগ দুর্গের সামনে থেকে মিনান্দার সেনা অপসরণ করলেন বটে কিন্তু প্রয়াগ নগরী অবরোধ করে রাখলেন। সদম্ভে বললেন—ওরা কতদিন নগরীর মধ্যে বসে থাকতে পারে আমি দেখতে চাই! খাদ্যাভাবে একদিন ওদেরকে মাথা নত করতেই হবে।

সেনানায়ক আন্তিওকাস পাশেই ছিলেন, তিনি বললেন—সেদিন কিন্তু আমাদের প্রচণ্ড সংগ্রামের সম্মুখীন হ'তে হবে সম্রাট্! ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র অতীব ভয়ঙ্কর! হিন্দুরা প্রাণ দেবে কিন্তু বিধর্মীর কাছে মাথা নত করবে না! ওরা শুধু পুরুষেরাই মরে না, মেয়েরাও মরতে জানে। সেবার যখন আমরা মাধ্যমিকার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'লাম, যে ক'টা গৃহ আমরা অতিক্রম করেছিলাম সবই ভস্মীভূত। বাড়ীর মেয়েরা প্রতি গৃহে অগ্নিসংযোগ করে পুড়ে মরেছে, শিশুরা মায়ের কোলে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে, তবু নগরবাসীরা

আমাদের কাছে পরাভব মানে নি। এমন না হ'লে হিন্দুরা এত বড় হতে পারতো না। এইটা ওদের কাছ থেকে আমাদেকে শিখতে হবে। যারা নির্ভয়ে মরতে জানে তাদেরকে বাইরে থেকে মারা শক্ত!

মিনান্দার মৃদু হেসে বললেন—কিন্তু সব মানুষ তো সমান হবে না, আন্তিওকাস! একদল মানুষ চিরদিনই মরতে ভয় পায়। যাদের বিত্ত আছে, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসকে যারা বড় করে দেখে, তারা মরতে যাবে কোন্ দুঃখে? তারা শান্তিতে সম্পত্তি ভোগ করতে চায়। সাধারণের ভিতর থেকে তাদের ছেঁকে তুলতে হবে। তাদেরকে পদগৌরব দিলেই সমগ্র জাতিকে তারাই আয়ত্তে রেখে দেবে।

—তা তো জানি সম্রাট্, সেই জন্যই কোন নগরে প্রবেশ করার আগে সৈনিকদের আমি বার বার স্মরণ করিয়ে দিই, নগরের মধ্যে যত বড় বড় বাড়ী দেখবে তাদের গৃহস্বামীকে আঘাত করবে না, পাকড়াও করে আনবে আমার কাছে…

—ঠিক! বড়লোকেরা নিজের দেশের চেয়ে নিজের পয়সাটাকেই বড় ব'লে মনে করে, ওদেরকে শুধু এক-একটা উচ্চ পদ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে ওদের বিষয়-সম্পত্তি ওরা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারবে! তা হ'লেই বাকী প্রজাদেরকে নিয়ে আর আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। ওরাই সব মেরে-ধরে ঠিক করবে, বৎসরান্তে রাজস্ব আমাদের হাতে ঠিকই আসবে।

—হনুমানগড় থেকে মাধ্যমিকা অবধি তাই তো দেখলাম, এখানেও ওই নীতি সফল হবে।

—বিজিত দেশে শান্তি স্থাপন করতে হ'লে এই নীতিই হচ্ছে বিজেতার একমাত্র নীতি—সর্ব দেশে সর্ব কালেই প্রযোজ্য।

সহসা তাঁবুর পর্দা ঠেলে ভিতরে এসে ঢুকলেন নাগসেন, মিনান্দার চমকে উঠলেন। শান্ত কণ্ঠে নাগসেন বললেন—আপনারা যে ভাবে শান্তি কামনা করেন সে ভাবে কোনদিন শান্তি আসে না সম্রাট্! শত শত ভস্মস্তূপের উপর দিয়ে, শত শত মানুষের শবের উপর দিয়ে আপনার অশ্ব যখন অগ্রসর হবে, রক্তসিক্ত রাজপথে ঘোড়ার ক্ষুর যখন পিছলে পড়বে, আহত সৈনিকেরা যখন আর্তনাদ করতে করতে আপনার গমন-পথের পানে তাকিয়ে আপনাকে অভিশাপ দেবে, তখন কি সত্যই আপনি শান্তি পাবেন? এই যদি সত্যই

আপনার অভিপ্রেত শাস্তি হয়, তা হ'লে বুঝতে হবে আপনার প্রকৃতি মনুষ্যধর্ম-বিরোধী। কিন্তু আপনি তা তো নন!

মিনান্দারের চোখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো, বললেন—এই দুষ্ট সন্ন্যাসীকে আমি অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিয়েছিলাম, সান্ত্রীরা আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছে। অবিলম্বে তাদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান কর!

নাগসেন বললেন—তারা আপনার আদেশ যথারীতিই পালন করেছিল সম্রাট্, কিন্তু ভগবান তথাগতের কৃপায় আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে। আমার কর্ম এখনও অসমাপ্ত রয়েছে, তা শেষ না হ'লে তো এ পৃথিবী থেকে আমি বিদায় নিতে পারি না সম্রাট্!

—উত্তম, এবার দেখা যাবে, আমি বড় কি তোমার ভগবান বড়! প্রতিহারী, অবিলম্বে একে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ কর!

নাগসেন শান্ত উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—অপরের জন্য দুঃখ বরণ করাই আমার ধর্ম। আপনি আমাকে হত্যা করতে চান, করুন; কিন্তু আমাকে নিহত করার আগে আপনার যত অসৎ গুণ—আপনার অহঙ্কার, আপনার নিষ্ঠুরতা আমাকে ভিক্ষা দিন সম্রাট্! আমার মৃত্যুর পর, আমার কথাটা শুধু একবার ভেবে দেখবেন—কেন একে মারলাম, কেন মাধ্যমিকা থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত হত্যার অভিযান চালালাম? যাদের সঙ্গে কোন দিন কোন পরিচয় ছিল না, তাদের কেন খুন করলাম? অনন্ত কাল-সমুদ্রে এই জীবন কতটুকু, ক'দিনের জন্য এই সাম্রাজ্যের বিলাস? এই কথা ভাবতে ভাবতেই আপনার আত্মশুদ্ধি হবে, আপনি সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন, আপনি বুঝতে পাবেন—হিংসার চেয়ে অহিংসা বড়। সম্রাট্ অশোক বিনা অস্ত্রে যে দিগ্বিজয় করেছিলেন, সেকেন্দার লাখ লাখ নরহত্যা করে তা পারেন নি।

সম্রাট্ সান্ত্রীকে বললেন—নিয়ে যাও!

নাগসেন বললেন—আজ হয়ত আমার কথাগুলি আপনার মর্মস্পর্শ করছে না, কারণ আজ অবধি আপনি কোন পরাজয় মানেন নি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যখন পরাজয় ঘনিয়ে আসবে, তখন আমার কথাগুলি ভেবে দেখবেন সম্রাট্।

সম্রাট সান্ত্রীর উপর রুক্ষ হয়ে উঠলেন—নিয়ে যাও!

সান্ত্রী নাগসেনকে ধরার জন্য অগ্রসর হ'ল, কিন্তু তাঁর গায় হাত দেবায়

আগেই সহসা তাঁবুর প্রবেশ-পথে বজ্রাচার্যকে দেখা গেল, বজ্রকণ্ঠে তিনি আদেশ দিলেন—তিষ্ঠ!

উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হ'ল।

বজ্রাচার্য বললেন—উত্তরাপথের ধর্মচক্রের মহাস্থবিরের গায়ে হাত তুলতে পারে এমন মানুষ আজও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নি।...মহাথেব, আপনি আসুন!

সম্রাট্ এবার উত্তেজিত হ'য়ে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন, কোষ থেকে তলোয়ার বের করে এগিয়ে আসতে চাইলেন, কিন্তু তিনি এক পা অগ্রসর হ'তে পারলেন না, তাঁর মনে হ'ল পা দু'খানি যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেছে।

বজ্রাচার্য হা-হা করে হেসে উঠলেন, বললেন—সম্রাট, সামান্য ভূখণ্ড, বিত্ত ও জনবল আয়ত্ত ক'রে আপনি মনে করেছেন আপনি যা ইচ্ছা তাই করবেন, আপনার ইচ্ছাই শত সহস্রের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবেন! তা হয় না সম্রাট, নিজের উপর অতটা অহঙ্কার রাখবেন না! একজন সন্ন্যাসী অনায়াসে আপনাকে শক্তিহীন করতে পারে, আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে আপনার সমগ্র সাম্রাজ্যের শক্তি নগণ্য!...আসুন মহাথের—

নাগসেন বললেন—কিন্তু আমার কাজ যে এখনও সম্পূর্ণ হয় নি বজ্রাচার্য!

—কিন্তু তা ব'লে আপনার মত সম্মানিতকে এমন ভাবে অপমানিত হ'তে দিতে আমরা পারি না।

—মান-অপমান অহঙ্কারের কথা, বজ্রাচার্য! আমার অহঙ্কার-বোধকে আমি তথাগতের চরণে সমর্পণ করেছি; ভিক্ষুর মান-অপমান বলে তো কিছু নেই!

—আপনি যে কথাই বলুন মহাথের, আপনাকে এ ভাবে অপমানিত করা মানে সমস্ত ধর্মচক্রের অপমান! আমাদের দেহে প্রাণ থাকতে তা হবে না, আপনি আসুন—

চারিপাশে একবার রক্তচক্ষুর দৃষ্টি বিকিরণ করে বজ্রাচার্য মহাথের নাগসেনের হাত ধরে বাহির হয়ে গেলেন। বস্ত্রাবাসের মধ্যে কিছুক্ষণ কারুর বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না, কেউ নড়তে-চড়তে অবধি পারলো না।

সাঁইত্রিশ

রাত্রিতে সম্রাট্ বৃহদ্রথ সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে প্রাসাদ ত্যাগ করছিলেন; পুররক্ষক তাঁকে ধরে ফেললো।

বৃহদ্রথ সম্রাটের পাঞ্জা দেখালেন, পুররক্ষক বিশ্বাস করলো না, বললো—ওটা জাল কি আসল কি করে বুঝবো? আপনাকে আমি কখনও দেখি নি, আপনি গ্রীকদের গুপ্তচর কি না কি করে জানবো?

পুররক্ষক সম্রাট্‌কে বরাবর নিয়ে এলো রাণীর সামনে। রাণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছদ্মবেশ ভেদ করে আসল মানুষটিকে চিনে ফেললো। হেসে সম্রাজ্ঞী বললেন—সম্রাটের আবার এ বেশ কেন?

সম্রাট্ তখন রাগে গর গর করছেন, বললেন—আমি মগধের অধীশ্বর, না তুমি?

—সহসা এ অবান্তর প্রশ্ন কেন সম্রাট্?

—আমি জানতে চাই যে মগধ-সম্রাটের নিজ রাজ্যমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করার অধিকার আছে কি নেই?

—আপনি অসুস্থ সম্রাট্!

—আমি অসুস্থ! অর্থাৎ আমি আজ প্রাসাদের মধ্যে নজরবন্দী!

—আপনি সুস্থ হলেই যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারবেন সম্রাট্!

—অর্থাৎ অসুস্থতার কারণে আমাকে প্রাসাদে বন্দী রেখে তোমরা স্বর্ণভাণ্ডার লুঠ করে আমাকে পথের ভিখারী করতে চাও?

—দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ স্বর্ণভাণ্ডারের সমস্ত সুবর্ণের প্রয়োজন মহারাজ!

—দেখ মহারাণী, কখন্ কি প্রয়োজন তা তোমার কাছে শিক্ষা করতে আমি চাই না। আমার বিনা অনুমতিতে তোমার রাজগৃহের স্বর্ণভাণ্ডারের এক টুকরো সুবর্ণও গ্রহণ করতে পার না। অবিলম্বে সমস্ত সুবর্ণ আমাকে বুঝিয়ে দাও।

—স্বর্ণভাণ্ডারের সুবর্ণ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় সম্রাট, প্রজাসাধারণের অর্থ প্রজাদের কল্যাণের জন্য সঞ্চিত করা ছিল, প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই আজ তা ব্যয়িত হওয়া প্রয়োজন।

—কি হওয়া প্রয়োজন, তা আমি তোমার চেয়ে কম বুঝি না। আমার সমস্ত স্বর্ণ আমাকে ফিরিয়ে দাও।

—তা আর হয় না সম্রাট্!

—আমার আদেশ।

রাণী চুপ করে রইলেন।

বৃহদ্রথ কিছুক্ষণ রাণীর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন—অ.মার আদেশ তুমি শুনবে না?

সহসা সম্রাট্ কটিবন্ধ থেকে ছুরিকা টেনে নিয়ে আত্মহত্যা করার উপক্রম করলেন। রাণী তাড়াতাড়ি তাঁর হাতখানি চেপে ধরলেন। তারপর ছুরিখানি কেড়ে নিলেন তাঁর হাত থেকে। সম্রাট্ ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ হয়ে কক্ষ থেকে বাহির হয়ে গেলেন।

সেই রাত্রেই সম্রাট্ বৃহদ্রথ স্বর্ণের শোকে আত্মহত্যা করলেন। শেষ রাত্রে পুররক্ষক প্রাসাদ-অলিন্দে সম্রাটের রক্তাক্ত দেহ অবিষ্কার করলো। রাণী স্তম্ভিতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে পড়লেন। পাটলিপুত্র নগরীতে শোকের ছায়া পড়লো। উত্তরাপথের ধর্মচক্রের মহাস্থবিরেরা কুক্কুটারাম বিহারে পরামর্শ করতে বসলেন।

আটত্রিশ

গুপ্তচরের মুখে প্রয়াগের নগর-প্রাকারে এক দুর্বল স্থানের সন্ধান পেয়ে শেষ রাত্রে গ্রীক সেনারা সেইখানে আঘাত করলো। অন্ধকারে দু'দণ্ড সংগ্রাম চালাবার পর হাতীর সাহায্যে প্রাকারের সেই অংশ ভগ্ন করে তারা নগরে প্রবেশ করলো। প্রত্যুষে মিনান্দার অশ্বপৃষ্ঠে নগরমধ্যে প্রবেশ করলেন। গ্রীকেরা তখন লুণ্ঠনের উল্লাসে উগ্র হয়ে উঠেছে। নগরের গৃহে গৃহে আগুন জ্বলছে, নাগরিকেরা নগর ত্যাগের প্রাক্কালে গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগ করে যাচ্ছে। আগুন দেখা যাচ্ছে না, আকাশের গায় দেখা যায় ধূমের কুণ্ডলী। মিনান্দার ঘুরে-ফিরে দেখলেন, তারপর আপন মনেই বলে উঠলেন—আলেক্‌জান্দার যেখানে এসে পৌঁছাতে পারেন নি, মিনান্দার সেখানে এসে পৌঁছালো। পাটলিপুত্রের পথ আজ সরল হয়ে গেল, অর্ধেক হিন্দুস্থান অদূর ভবিষ্যতে আমার করায়ত্ত হবে।

সম্রাটকে দেখে চারিপাশের সৈন্যরা উৎসাহিত হয়ে উঠলো, সাড়া তুললো—জয়, সম্রাট্ মিনান্দারের জয় !

সম্রাটের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তলোয়ারখানি মাথার উপর তুলে ধরে দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—জয়, গ্রীকদের জয় !

নগরীর পথে পথে সারা দিন ধরে চললো সংগ্রাম—খুন কর অথবা খুন হও ! নির্বিচার নিরপেক্ষ হত্যালীলা।

হিন্দুরা পিছু হটছে, যে অঞ্চল তারা ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে সেই অঞ্চলে তারা আগুন লাগিয়ে যাচ্ছে। সেই আগুন ঠেলে গ্রীক সেনারা এগুতে পারছে না। বহ্নিমান বাড়ীগুলির পিছনে সরে গিয়ে হিন্দুরা নূতন করে আত্মরক্ষার ব্যূহ রচনা করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বিষাক্ত তীর এসে পড়ছে অগ্রগামী গ্রীক অশ্বারোহী ও পদাতিকদের উপর। গ্রীকদের অগ্রগতি প্রতিহত হচ্ছে। লড়াই চলছে।

সাত দিনেও গ্রীকেরা সমগ্র প্রয়াগ দখল করতে পারলো না ; দিনে যদিও তারা কিছুটা অগ্রসর হয়, রাত্রে তাদেরকে আবার পিছিয়ে আসতে হয়। রাত্রের অন্ধকারে হিন্দুদের অগ্নিমুখী তীর যুদ্ধাশ্বগুলিকে ভীত ও ত্রস্ত করে তোলে, সেনাকেন্দ্রগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। দিনে গ্রীকেরা অগ্রগামী হয়, রাত্রে করে আত্মরক্ষা।

সপ্তম দিনে সহসা একজন গুপ্তচর এসে সংবাদ দিল—প্রভু, দু'পাশের বনভূমি থেকে কিরাতদল আমাদের আক্রমণ করেছে।

মিনান্দার তখনই সেনানায়কদের যথাবিহিত আদেশ দিলেন।

কিন্তু গ্রীকেরা যত সহজ মনে করেছিল, কিরাতদের আক্রমণ তত সহজ হ'ল না। সত্যই তো কিরাতবাহিনী আসে নি, আসলে তারা ছিল মাগধী সৈন্য, তাদের পরিচালনা করছিলেন পুষ্যমিত্র, এবং মন্ত্রণা দিচ্ছিলেন বজ্রাচার্য।

সন্ধ্যার আবছায়ায় কিরাতকুল আক্রমণ চালিয়ে তিন-চার দণ্ডের মধ্যেই গ্রীক বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ বিপর্যস্ত করে তুললো। পিছনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ভালো ক'রে গুরুত্ব উপলব্ধি করার আগেই ঊষালোকে মিনান্দার দেখলেন প্রয়াগ অবরোধ করতে এসে তিনিই সসৈন্যে অবরুদ্ধ হয়েছেন, মাগধী সেনারা চারিদিক থেকে গ্রীকদের ঘিরে ধরেছে। মিনান্দার ইতিপূর্বে আর কখনও পিছন দিক থেকে এ ভাবে আক্রান্ত হ'ন নি, তিনি

বিপদ গণলেন; সেনানায়কদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বুঝলেন—জয়ের আশা কম। সমস্ত গ্রীক বাহিনী নিয়ে তিনি মাধ্যমিকায় পশ্চাদপসরণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু পিছনে মাগধী সেনার ভিতর দিয়ে পথ করে নেওয়াও সহজ হ'ল না। প্রচণ্ড সংগ্রাম সুরু হ'ল! এদিকে প্রয়াগী সেনারাও মাগধী সেনার সাহায্যে উদ্দাম হয়ে উঠলো। চারিদিক্ থেকে আক্রান্ত হয়ে গ্রীকেরা বিহ্বল হয়ে পড়লো। তথাপি আত্মরক্ষার জন্য তারা জীবনপণ করে লড়তে লাগলো।

মিনান্দার অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং সেনাবাহিনী পরিচালনা করছিলেন, সহসা কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে এক বল্লমাঘাতে গ্রীক সম্রাটের ঘোড়াটি ধরাশয্যা গ্রহণ করলো। গ্রীক সেনারা হৈ হৈ করে উঠলো, যারা দূরে ছিল তারা সম্রাট আহত হয়েছেন মনে করে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো। তারা ভাবলো—কার জন্য আর লড়বো। সেই দুর্বল মুহূর্তে পুষ্যমিত্রের বাহিনী গ্রীক বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে সম্রাটকে বন্দী করলো।

উনচল্লিশ

বন্দী গ্রীক সম্রাটকে পুষ্যমিত্রের সামনে উপস্থিত করা হ'ল।

নাগসেন সেখানে ছিলেন, পুষ্যমিত্র কিছু বলার আগেই নাগসেন কথা বললেন—সম্রাট্, আপনি নিজেকে বন্দী বলে মনে করবেন না, সম্রাট্ সেকেন্দার পুরুরাজের প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন আমরা আজ সেই ঋণ শুধতে চাই। আপনি আজ আমাদের বন্ধু হ'লেন। তবে আমি একদিন আপনার কাছে যে ভিক্ষা চেয়েছিলাম, আজ আবার তার পুনরাবৃত্তি করছি,—আপনার জিঘাংসা, আপনার হঠকারিতা, আপনার আত্মাভিমান আপনি আমাকে দান করুন, আমি ভিক্ষা চাইছি।

মিনান্দার নিজের অবস্থা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারলেন না, সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন,—এ কি আপনার আদেশ, না অনুরোধ?

নাগসেন বললেন—আপনাকে আদেশ করার মত অহঙ্কার আমার নেই সম্রাট্, ভগবান্ তথাগতের নামে আপনার চরিত্রের দোষগুলি আপনি আমাকে ভিক্ষা দিন!

—আপনি কি আমাকে আপনার সঙ্ঘভুক্ত করতে চান?

—আপনার যদি সেই ধারণাই হয় সম্রাট্, আপনি স্বচ্ছন্দে অস্বীকার করতে পারেন। উত্তরাপথের ধর্মচক্রের নামে আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম। তবে একটা কথা, চলে যাবার আগে আপনাকে শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে যে আপনি আর নররক্তে ধরণী কলুষিত করবেন না। রাজার কাজ প্রজা পালন করা, প্রজা নাশ করা নয়। এবং আজ থেকে আপনি আপনার রাজ্য মধ্যে প্রজাদের সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবেন।

—তা হ'লেই আপনি আমাকে মুক্তি দেবেন, রাজ্যও ফিরিয়ে দেবেন?

—নিশ্চয়ই।

—মগধ-সম্রাট আপনার এই নির্দেশ মান্য করবেন তো?

—উত্তরাপথের ধর্মচক্রের নির্দেশ অমান্য করবেন হিন্দুস্থানে এমন কেউ নেই সম্রাট।

—কিন্তু পরে আমি যদি আমার প্রতিজ্ঞা না রাখি?

—আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, সম্রাট্।

—বেশ, আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।

—উত্তম, উত্তরাপথের ধর্মচক্রের নামে আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম। পুষ্যমিত্র, তুমি সম্রাটের তলোয়ার ফিরিয়ে দাও।

পুষ্যমিত্র মিনান্দারকে তলোয়ার ফিরিয়ে দিলেন।

নাগসেন বললেন,—চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি সম্রাট্।

নাগসেন সম্রাটের হাত ধরে অগ্রসর হ'লেন। সামনেই শূন্য প্রান্তর। রণক্ষেত্র। অসংখ্য মৃত ও মুমূর্ষু পড়ে আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা আহতের সেবা করছে। নাগসেন বললেন—এদের পানে একবার দৃষ্টিপাত করুন সম্রাট্। এতগুলি মানুষের দুঃসহ দুঃখের কারণ হয়েছেন আপনি। আপনার সামান্য ইচ্ছা পূরণের জন্য এরা জীবন দিল। যারা কোন রকমে প্রাণে বাঁচবে তারা কেউ বা অঙ্গ হারাবে, কেউ বা হবে সারা জীবনের মত পঙ্গু। অথচ আপনি এদের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করলেন সম্রাট্?

—প্রজারা চিরদিন রাজার জন্য প্রাণ দেয়, এতে এমন বিচিত্র কি আছে?

—এই সব জনগণের দুঃখ যদি আপনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন সম্রাট্, তা হ'লে নিজেকে এদের চেয়ে মূল্যবান্ বলে মনে করতেন না, এদের জন্য আপনিও প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'তেন। রাজা যখন প্রজার জন্য প্রাণ

দেয় তখন তারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে, যেমন শাক্যমুনি, যেমন মহারাজ ধর্মাশোক। আপনিও সেই সব মহাপুরুষের মত নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেন সম্রাট! সে ইতিহাস নরহত্যার রক্তে রঙানো হবে না, তা হবে শ্রদ্ধা ও সম্মানে আপ্লুত। আপনি কি চান না প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মান পেতে?

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান্ আমি সন্ন্যাসী না হ'য়েও আপনার শিষ্য হ'তে পারি?

—আপনি যদি আমার কথার সেইরূপ অর্থ করেন তা হ'লে বলার আর কিছু নেই সম্রাট, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

সহসা সম্রাট এক আহতের সামনে এসে দাঁড়ালেন, লোকটি তাঁর একান্ত অনুগত পার্শ্বচর। এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাকে ধরে জল পান করাচ্ছিলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, —তুমি কোথায় আঘাত পেয়েছ, মিলো?

মিলোর মুখে ঘৃণা ফুটে উঠলো, সে ধীরে ধীরে বললো—তুমি হ'লে দিগ্বিজয়ী, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিচ্ছি! আর তুমি আমার জন্য কি করলে? তোমার জন্য প্রাণ দিয়ে আমরা কি পেলাম? স্বার্থপর! শয়তান! নর-ঘাতক!

গালাগালি শুনে মিনান্দার তলোয়ারে হাত দিলেন, নাগসেন হাত চেপে ধরলেন, বললেন,—মুমূর্ষুকে আঘাত করা রাজধর্ম নয়, সম্রাট!

মিনান্দার চিন্তিত মুখে অগ্রগামী হ'লেন। নগরীর উপকণ্ঠে প্রান্তর। দিগ্বলয়ে গাছের সারি আকাশের কোলে সবুজের কাজল-রেখা এঁকে দিয়েছে। ধূসর প্রান্তরে এলোমেলো জেগেছে সবুজ ঘাসের শ্যামলিমা। দূরে এক ঝাঁক বকের মত গ্রীক সেনাদের শিবির। সম্রাট সেই দিকেই অগ্রসর হ'লেন। পদব্রজে চলার অভ্যাস ছিল না, বন্ধুর প্রান্তর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিনান্দারের গতি শ্লথ হয়ে এলো।

একটি লতাকুঞ্জ পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সহসা কোথা একটি তীর এসে সম্রাটের বাহুতে লাগলো। বর্ম ছিল না, তীরটি বাহু ভেদ করলো। নাগসেন তখনই ক্ষিপ্রহস্তে তীরটি বের করে দিলেন, রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য নিজের উত্তরীয়ের প্রান্ত ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে পটি বাঁধতে বসলেন।

ইতিমধ্যে সামনের বৃক্ষকুঞ্জ থেকে একটি লোক বাহির হয়ে এলো। সশস্ত্র

গ্রীক সৈনিক। কাছে এসে বললো—মরে নি এখনও! পাপীর মৃত্যু সহজে হয় না, আরও আঘাত করতে হবে।

মিনান্দার চিনলেন, বললেন,—তুমি? থিওডোকাস? তুমি আমাকে আঘাত করলে? কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই?

—কৃতজ্ঞতা! কিসের কৃতজ্ঞতা? শত শত সেনা রাজার জন্য প্রাণ দেয়, শত সংসার অনাথ হয়। রাজা রাজ্য জয় করে ফেরেন কিন্তু সেই সব সৈনিকেরা কি পায়? আমার ভাই যখন মাধ্যমিকার যুদ্ধে নিহত হ'ল, মাধ্যমিকা জয় করার পরে আপনি তার ছেলেমেয়েদের জন্য কি করেছেন? তার প্রাণদানের জন্য কি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন? আর আমি আপনার কাছে মাইনে নিয়েছি বলেই আমাকে কৃতজ্ঞ হ'তে হবে? কেন? বেতনের বদলে আমি আপনার কাজ করি নি?

—কৃতজ্ঞ না হ'তে পার, কিন্তু গুপ্ত ঘাতক হবার কারণ কি?

—অর্থ। যে জন্য আপনার কাছে দাসত্ব করেছিলাম—সামান্য বেতনের বিনিময়ে এই দূর দেশে মানুষ খুন করতে এসেছিলাম, ঠিক সেই জন্য। তবে তখন খুন করতাম অজ্ঞাত অখ্যাত লোকদের, এখন খুন করতে চাই একজন সম্রাটকে। সেইজন্যই আপনি নরহত্যার জন্য যে দাম দিতেন, আপনার সেনাপতি তার চেয়ে অনেক বেশী দাম দিচ্ছে আপনাকে হত্যা করার জন্য। আপনি পাইকারী হত্যার জন্য দাম দিতেন মাসিক দশ স্বর্ণ আর এখন শুধু আপনাকে খুন করার জন্য আমি পাব সহস্র স্বর্ণ। আমার সারা জীবনের অন্ন-সমস্যা মিটে যাবে।

—আমার সেনাপতি তোমাকে নিযুক্ত করছেন? আমাকে খুন ক'রে তাঁর লাভ?

—লাভ? আপনার সাম্রাজ্য। আপনি নিহত হ'লে সেনাবাহিনী যার হাতে তিনিই রাজ্য ভোগ করবেন।

—আমি যদি তোমাকে দ্বি-সহস্র স্বর্ণ দিই তুমি সেই সেনাপতিকে হত্যা করতে পারবে?

—আমি বড়লোকের কথায় আর বিশ্বাস করি না সম্রাট, সুবিধা পেলে আপনিই হয়তো আমাকে গুপ্ত ঘাতকের হাতে সমর্পণ করবেন। আপনি

যদি এখনি আমাকে সহস্র মুদ্রা দেন, তা'হলে আমি আপনার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারি।

—এখনই চাই ?

—হ্যাঁ, এখনই।

—কিন্তু আমার কাছে তো এখন কিছুই নেই। তুমি আমার সঙ্গে শিবিরে চল।

—না, আপনার সঙ্গে আমি কোথাও যাব না।

নাগসেন এবার বললেন,—প্রয়োজন হ'লে আমি আপনাকে অর্থ দিতে পারি সম্রাট। কিন্তু অর্থ দিয়ে আপনি ক'জনের চিত্ত জয় করবেন? থিওডোকাস্‌কে হয়তো আপনি টাকা দিয়ে কিনলেন, কিন্তু আপনার সেনাপতি অর্থ দিয়ে আরও অনেক থিওডেকাস্‌ সংগ্রহ করতে পারবেন। আপনি এখন এই অসুস্থ দেহ নিয়ে শিবিরে যাবেন না, আমার সঙ্গে বিহারে চলুন। কয়েকদিন পরে সুস্থ হ'লে আমরা আপনাকে সকোলায় (শিয়ালকোট) পৌঁছে দেব।

থিওডোকাস্‌ বললো—কিন্তু আমার অর্থ না পেলে তো আমি যেতে দেব না।

—তুমি আমার সঙ্গে এস থিওডোকাস্‌।

থিওডোকাস্‌ সন্দিগ্ধভাবে নাগসেনের মুখের পানে তাকালো।

নাগসেন হেসে বললেন,—আমি সম্রাট নই, আমি সন্ন্যাসী। আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করিতে পার।

পটি বাঁধা শেষ করে নাগসেন মিনান্দারকে নিয়ে বনপথ ধরলেন। থিওডোকাস্‌ সঙ্গে চললো।

চল্লিশ

কিছু পথ গিয়ে একটা বাঁকের মুখে মোড় ফিরতেই মুক্ত কৃপাণ হাতে দু'জন গ্রীক সৈনিকের সঙ্গে তাঁরা মুখোমুখি হলেন। দু'জনে পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

একজন বললো—আজ আর তোমার নিষ্কৃতি নেই গ্রীক সম্রাট্‌। তুমি

আমাদের পিতামাতাকে হত্যা করেছ, আমাদের পথের ভিখারী করেছ। আজ আমাদের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ এসেছে, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও, সম্রাট্।

—তুমি গ্রীক হয়ে এই কথা বলছ!—মিনান্দার বললো—আমি গ্রীক জাতিকে মহত্তর করার জন্য সারা জীবন সাধনা করেছি, গ্রীক জাতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমি হিন্দুস্থানে দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছি। আর তোমরা আমাকে শত্রু বলে মনে করছ?

—আমরা গ্রীক নই সম্রাট্! আমি হিন্দু। আমি হনুমানগড়ের রাজকুমারী মালবিকা, আর ইনি কারুষের রাজকুমার অগ্নিমিত্র। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ছদ্মবেশে আমরা সুযোগ অন্বেষণ করেছি। আজ সেই সুযোগ এসেছে, আজ তোমার রক্তে আমরা পিতৃ-তর্পণ করবো।

মালবিকা শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললো, একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়লো তার পিঠের উপর।

নাগসেন বললেন—শত্রুকে ক্ষমা করাই মনুষ্যত্ব, রাজকুমারী!

—আপনার ধর্মতত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে সব সময়ে কার্যকরী হয় না মহাথের! আমার একার শত্রু হ'লে আমি না হয় তাকে ক্ষমা করতাম, কিন্তু যে দেশের শত্রু, সারা হিন্দুস্থানের শত্রু, তাকে ক্ষমা করলে দেশদ্রোহিতা হবে। বহু লোকের হত্যার হেতু যে মানুষটি, সে জীবিত থাকলে আরো বহু লোকের প্রাণহানির কারণ হবে।

—কিন্তু এঁর মনকে যদি আমরা জয় করতে পারি তা হ'লে ইনি বহু লোকের সুখের কারণও তো হতে পারেন?

—তা হয় না মহাথের! সাপ কখনও তার স্বভাব বদলায় না। ওই বিষ-বৃক্ষ আমরা আর রাখবো না।

—কিন্তু উনি আমার আশ্রিত, আমি ওঁকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

—হিন্দুরা দেশের শত্রুকে এইভাবে প্রশ্রয় দিয়ে বহুবার জাতির সর্বনাশ করেছে, আমরা আর তার পুনরাবৃত্তি হ'তে দেব না।

—কিন্তু সেজন্য হিন্দুদের মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নি, মহত্ত্ব বেড়েছে।

—আপনি বিস্মৃত হচ্ছেন, ইনিই আপনার মত মহাত্মাকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। আমরা আপনাকে রক্ষা না করলে আজ আপনি ওঁকে আশ্রয় দিতে পারতেন কি?

অগ্নিমিত্র একটু এগিয়ে এসে মিনান্দারকে আঘাত করার উদ্যোগ করলো। নাগসেন গ্রীক সম্রাটকে আবৃত করে দাঁড়ালেন, বললেন—আমাকে শেষ না করে সম্রাট্‌কে তুমি আঘাত করতে পারবে না।

মালবিকা এগিয়ে এলো, বললো—আপনি আমাদের এই পুণ্যকাজে বাধা দেবেন না মহাথের, এই পিতৃহন্তার রক্তে আমরা আজ পিতামাতার তর্পণ করবো।

নাগসেন তথাপি এতটুকু নড়লেন না।

অগ্নিমিত্র বললো—আপনি গায়ের জোরে আমাদের সঙ্গে পারবেন না, মহাথের!

—গায়ের জোরের চেয়ে মনের জোরই বড়, রাজকুমার!

অকস্মাৎ পিছনে কণ্ঠস্বর শুনে দু'জনেই চমকে উঠলো, দেখলো এক বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করে বজ্রাচার্য পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বজ্রাচার্য হেসে বললেন—অগ্নিমিত্র, তোমার পিতা তো নিহত হন নি, তুমি মিছামিছি কেন সম্রাট্‌কে দোষারোপ করছ? তোমার পিতা আচার্য পুষ্যমিত্র তো আজ মগধ-সম্রাটের মহাবলাধ্যক্ষ হিসাবে সৈন্য পরিচালনা করে গ্রীক সম্রাট্‌কে পরাজিত করেছেন। আর মালবিকা, তোমার দুই ভাই তো আচার্য পুষ্যমিত্রের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছেন, আর তুমি বলছ তোমার ভাইয়েরা নিহত হয়েছেন!

মালবিকা ও অগ্নিমিত্র কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলো না, তারা অভিভূত হয়ে পড়লো, তাদের বিদ্বেষ রূপান্তরিত হ'ল ব্যাকুলতায়। বজ্রাচার্য হেসে বললেন—এস, আমার সঙ্গে।

দু'জনে মন্ত্রমুগ্ধের মত বজ্রাচার্যের অনুসরণ করলো।

গ্রীক সম্রাট্ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার যেন তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি নাগসেনের পায়ের কাছে বসে পড়লেন। পায়ের উপর হাত রেখে বললেন—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মহাথের, আপনাকে চিনতে আমার ভুল হয়েছিল। আপনি আজ আমায় জীবন দান করলেন!

নাগসেন তাঁকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!

সেই বাণী ও স্পর্শের মধ্যে কি ছিল কে জানে, গ্রীক সম্রাট্‌ও ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,

ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি,

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!

এক বৃক্ষতলে বসে পুষ্যমিত্র, সুমতিসেন ও সৌভাগ্যসেনের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন গ্রীক বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করা তাদের পক্ষে যুক্তযুক্ত হবে কি না, এমন সময় সেখানে বজ্রাচার্য আবির্ভূত হলেন, বললেন—আপনার গ্রীক জয়ের পুরস্কার এনেছি মহাবলাধ্যক্ষ!

মালবিকা এগিয়ে এসে সুমতিসেন ও সৌভাগ্যসেনের পদধূলি গ্রহণ করলো। দু' ভাই সস্নেহে বোনকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁদের চোখ সজল হয়ে উঠলো।

বজ্রাচার্য হেসে বললেন—কি আচার্য, নিজের পুত্রকে এখনও চিনতে পারলেন না?

—আমার পুত্র! পুষ্যমিত্র বিস্ময়ে অগ্নিমিত্রের পানে তাকালেন।

বজ্রাচার্য অগ্নিমিত্রকে বললেন—কুমার, পিতাকে প্রণাম কর।

অগ্নিমিত্র দু'পা এগিয়ে আসতেই পুষ্যমিত্র দীর্ঘদিনের অ-দেখা ছেলেকে সহসা যেন চিনতে পারলেন, উঠে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। দীর্ঘ বারো বছর বাদে পিতা-পুত্রে মিলন ঘটলো।

পুষ্যমিত্রের আর অগ্রসর হওয়া হ'ল না। উত্তরাপথের ধর্মচক্র তাঁকে অবিলম্বে পাটলিপুত্রে আহ্বান করলেন। মগধ-সিংহাসনের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না, ধর্মচক্রের পরামর্শ অনুযায়ী রাণী পুষ্যমিত্রকেই মগধের সম্রাট্‌ বলে ঘোষণা করলেন। মহাসমারোহে পুষ্যমিত্র রাজপদে অভিষিক্ত হলেন,—মগধে শুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

মালবিকা অগ্নিমিত্রের জীবন রক্ষা করেছিলেন, পুষ্যমিত্র মালবিকার হস্তেই অগ্নিমিত্রকে সমর্পন করলেন। মহা ধূমধামে বিবাহ সুসম্পন্ন হ'ল।

অগ্নিমিত্র গ্রীকদের পর্যুদস্ত করার জন্য বিরাট বাহিনী নিয়ে উত্তর পশ্চিম ভারতের পথে যাত্রা করলেন। কিন্তু মিনান্দারের সঙ্গে সংগ্রামের আর

প্রয়োজন হ'ল না, নাগসেনের প্রভাবে তিনি তখন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন, নতুন নাম গ্রহন করেছেন—মিলনানন্দ। তাঁর দু'জন অন্তরঙ্গ মন্ত্রী দিমিত্রিয়াস ও আন্তিওকাসও নবধর্মে দীক্ষিত হয়ে হলেন দেবমন্ত্রীয় ও অনন্তকায়। এইভাবে নাগসেন গ্রীক ও ভারতীয়ের মধ্যে নতুন মিলন-সেতু রচনা করলেন। এই সম্রাট মিলনানন্দই পরবর্তী ভারতের ইতিহাসে মিলিন্দ নামে খ্যাত। এঁর ধর্মজিজ্ঞাসা 'মিলিন্দ-পঞহো' (মিলিন্দের প্রশ্ন) নামে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। বৌদ্ধধর্ম-জিজ্ঞাসুরা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই গ্রন্থ পাঠ করেন।

মিনান্দারের অভিযানই ভারতে শেষ গ্রীক অভিযান। এর পর ক্রমশঃ গ্রীকেরা ভারতবাসীর সঙ্গে মিশে ভারতীয় ব'নে যান। গ্রীকদের বৈশিষ্ট্য ভারত তার মহত্ত্ব দিয়ে আত্মসাৎ করে।

শেষ